কথা কণ্ড

শ্রীকানাইলাল ঘোষ

প্রাপ্তিস্থান :

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা

উৎসর্গ

জীবনে যারা শুধু ব্যথাই পেয়েছে,

স্নেহের পরশ পায়নি কোনদিন—

তাদের হাতেই তুলে দিলুম।

ভূমিকা

নোতুন কিছু দেওয়ার আশায় এ উপন্যাসের পটভূমিকা রচনা ক'র্‌তে বসিনি—শুধু নিত্য যা দেখেছি, যা শুনেছি—তাদেরই ছায়ায় এই কাহিনী রচনা ক'রেছি মাত্র। ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। তবুও যদি কেউ এই কাহিনীটি পড়ে এতটুকু বেদনা অনুভব করেন—তবেই জান্‌বো লেখনী আমার সার্থক হ'য়েছে, নইলে সমস্ত প্রচেষ্টাই আমার ব্যর্থ। ইতি—

খেপুত—পোঃ ও গ্রাম
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫৩
(মেদিনীপুর)

বিনীত—
শ্রীকানাইলাল ঘোষ

কথা কণ্ঠ

সুখ ও স্বচ্ছলতার মধ্যে পরম নিশ্চিন্তে জীবনের তৃতীয় চতুর্থাংশ কাটিয়ে, দীনদয়াল সহসা একেবারে গেলেন ঠেকে। বিত্তশালী জমিদার তিনি। আজীবন খেয়াল ও খুশী, শিকার ও গান-বাজনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে, কোন দিকেই ফিরে তাকানোর অবকাশ তিনি পাননি কোনদিন। তাই শেষ বয়সে, অস্বচ্ছলতার নাগপাশে অবরুদ্ধ হ'য়ে, একান্ত অসহায়ের মত মুষ্‌ড়ে প'ড়লেন কিছু দিনের মত। কিন্তু সে জাল ছিন্ন ক'র্‌তেও তাঁর লাগলো না বেশী সময়। জমিদারীর সমস্ত দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়ে, অতীতের ভুল ভ্রান্তি সমূলে উচ্ছেদ ক'র্‌তে সম্পূর্ণ মনোনিয়োগ ক'রলেন তিনি। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁকে ত্যাগ ক'র্‌তে হ'ল ইহজগতের মায়া।

পুত্র অশোকনাথ, উত্তরাধিকার সূত্রে সেই সম্পত্তির মালিক হ'লেন সত্য; কিন্তু পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে বিমুখ হ'লেন তিনি। প্রজাদের শুষ্ক মুখের দিকে তাকিয়ে শিল্পী মনটা তাঁর ব্যথাতুর হ'য়ে উঠলো। তাই অকারণ পীড়নের পথ বর্জ্জন ক'রে, তাদেরই ইচ্ছার 'পরে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর ক'রে পাড়ি দিলেন জীবন-পথে। ফলে, তাঁর সততা ও আত্মবিশ্বাস মাঝপথে হোঁচ্‌ট খেয়ে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে প'ড়লো একে একে। অথচ প্রতিবাদ ক'রলেন না এতটুকু। শুধু ক্ষুব্ধ হ'লেন মনে প্রাণে।

স্ত্রী যশোদাময়ী, স্বামীর চৈতন্য উদয়ের আপ্রাণ চেষ্টা ক'র্‌লেন ; কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আত্মভোলা প্রকৃতি ও সুরের নেশা, উৎকট ব্যাধির মত তাঁর চরিত্রকে এরূপ সম্মোহিত ক'রে রেখেছিল যে,—কোন সুপরামর্শই কর্ণকুহরে তাঁর প্রবেশ ক'র্‌লো না কোনমতে। ফলে জমিদারী উঠলো নীলামে।

জীবনের উপর নাম্‌লো রুদ্র দারিদ্রের অভিশাপ। আজন্মের বিলাস ব্যসন পিষ্ট হ'তে সুরু হ'ল প্রতিটি মুহূর্ত্তে। সেই ক্ষতের জ্বালায় মাঝে মাঝে তাঁর আত্মবিস্মৃতির নেশা টুটে গেলেও সাধক অশোকনাথের মন, নব সৃষ্টির প্রেরণায় উন্মুখ হ'য়ে রইলো পূর্ব্বেরই মত।

যশোদাময়ী নিজেও ছিলেন মাতাপিতার আদরের একমাত্র সন্তান। প্রাচুর্য্যের মধ্যে সুরু হ'য়েছিল তাঁর জীবন সাধনা। কিন্তু মাঝপথে আত্মভোলা স্বামীর সাহচর্য্যে যখন সেই মধুরতম জীবনের সুর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল,—তখন একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়্‌লেন না তিনি ; বরং অধিকতর দৃঢ়চিত্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন ধীরে ধীরে। দারিদ্রের অসহনীয় বেদনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, জীর্ণ সেই জীবন-তরীর কর্ণধাররূপে জীবন-পথে তিনি পাড়ি দিলেন নিশ্চিন্ত মনে। কিন্তু সকল সময়ে অন্তরের অন্তরতমের কাছে নিবেদন জানাতে লাগ্‌লেন—হে ঠাকুর, যদি কোন দিন সন্তান-বরদানে এ-জীবনকে তুমি অভিষিক্ত করো, তাকে যেন এমন বিবাগী ক'রে তুলো না। এর বেশী কোন কামনাই আমি পোষন করি না জীবনে।...

* * * *

পিতা অমরনাথ কন্যার এই অদৃষ্টলিপি দর্শনে ব্যথিত হ'লেন। অথচ তাঁর আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগার আশঙ্কায় সম্মুখবর্ত্তী হ'লেন না সহসা। অন্তরাল থেকে, কন্যাকে সাহায্য ক'র্‌তে লাগ্‌লেন নানা উপায়ে।

যশোদাময়ী বুদ্ধিমতী। বুঝ্লেন পিতার আন্তরিক ইচ্ছা। তাই শত দুঃখের মধ্যেও স্বামীর ভিটে আগ্লে পড়ে রইলেন তিনি।

কেটে গেল কয়েক বছর। দারিদ্রের নিষ্ঠুর পেষনেও অশোকনাথের সুরসাধনার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। তাঁর দুরাবস্থা দেখে কেউ সহানুভূতি জানালো, কেউ বা ক'র্লো উপহাস্।

অশোকনাথের কিন্তু কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। নির্বিকার চিত্তে তিনি ক'রে চ'ল্লেন সাধনা। যেন এরই জন্য তাঁর জন্ম। —এর শেষ সীমায় তাঁকে উপনীত হ'তেই হবে। এটাই যেন তাঁর জীবনের একমাত্র কামনা। তাই লোকে যখন তাঁকে পাগল ব'লে উপহাস ক'রে তখনও যেরূপ হাসেন, কেউ সহানুভূতি জানালেও তেমনি নির্ব্বিকার হাসি হাসেন অবহেলে।

যশোদাময়ী নীরবে বসে বসে দেখেন এ দৃশ্য। স্বামীর অপমানে ব্যথা বোধ করেন অন্তরে। কিন্তু এর প্রতিকারের উপায়ই বা কি? বলা মুখ আর চলা পথ, এর গতিরোধ ক'রে—এমন সাধ্য কার আছে এ-দুনিয়ায়? তাই মনে-প্রাণে তিনি একটা অসোয়াস্তি বোধ করেন। ভাবেন, আর কিছু না হো'ক্ নিজেকে ভুলে থাকার জন্যও যদি কোল জোড়া হ'য়ে থাক্তো একটা শিশু! পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু অন্তরাত্মা তাঁর কাতরে ওঠে—না, না—সেও ত' হবে এমনি বিবাগী! না—না—এমন কাজ তুমি ক'রো না ঠাকুর, তাহ'লে আমি বাঁচবো কেমন করে?....

* * * *

আশা-নিরাশার মাঝে ফলবতী হ'ল তাঁর মনস্কামনা। কয়েক মাসের ব্যবধানে কোলে পেলেন তিনি নবজাত একটি শিশু।

তার মুখের দিকে তাকিয়ে চম্কে ওঠেন্ যশোদাময়ী। একমাত্র হাতের আঙুল, পায়ের পাতা, আর দু'টো কান ছাড়া সব কিছুই

যে তাঁর নিজেরই প্রতিচ্ছবি! একটা বন্য পুলকের শিহরণে চিত্ত তাঁর উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে।

আত্মীয়, অনাত্মীয়, প্রতিবেশী, অনেকেই দেখ্‌তে এলো নবজাতককে। তাঁরা সকলেই একবাক্যে প্রশংসামুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন—মাতৃমুখী সন্তান, সুখী ও হ'বেই!

যশোদাময়ীর অন্তরের কথা যেন টেনে বলেন তাঁরা। খুশীতে মুখর হ'য়ে ওঠে মায়ের প্রাণ। বলেন—তোমাদের আশীর্ব্বাদই যেন ওর জীবনের পাথেয় হয় দিদি! এর বেশী কোন কামনাই যে হৃদয়ে পোষণ করি নে আমি!

তাঁরা এক বাক্যে আশ্বাস দেন, হবে বইকি লো—হবে! মাতৃমুখী ছেলে সুখী না হ'য়ে কি পারে? নিশ্চয় সুখী হ'বে!

মাতৃ-হৃদয় আশা ও আনন্দে মুখর হ'য়ে ওঠে। মনে মনে ভাবেন—তাই যেন হয় ভগবান!···

* * * *

অশোকনাথেরও খুশীর অন্ত নেই। সন্তান, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিবিম্ব! অসম্পূর্ণ জীবনের তন্ত্রধারক সে! সেই ত তাঁর আজন্ম সাধনার উত্তরাধিকারী হ'বে ভবিষ্যতে! তাই আদর ক'রে নাম রাখ্‌লেন "অনাথবন্ধু"।

মনের মত ঠিক না হ'লেও বেসুরো বাজলোনা যশোদাময়ীর কানে। তাই প্রতিবাদের পরিবর্তে মৌন-সম্মতি দান ক'র্‌লেন তিনি নীরবে। ভাব্‌লেন মনে মনে—অনাথবন্ধু···মানে অনাথের বন্ধু! তাই যেন সে হয় যুগে যুগে!···

অনাথবন্ধু পাঁচ বছরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—তার ভাবি-চরিত্রের ইঙ্গিত পেয়ে সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন অশোকনাথ। একি? এ যে তাঁর পিতা দীনদয়াল আর শ্বশুর অমরনাথের চরিত্রের সম্মিলিত

একটা রূপ! একাধারে সে যেরূপ হ'য়ে উঠেছে দুর্দ্ধর্ষ শিকারী—অভেদ্য তার লক্ষ্য, অন্য পাশে তেমনি শিশু মনটা তার পাকা ব্যবসায়ীর মত বৈষয়িক স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন। ভবিষ্যতে যদি সে সেই প্রকৃতি-সম্পন্ন হয়?—তা হ'লে তাঁর ভবিষ্যৎ? তাঁর সাধনা—? তবে কি সবই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে?

অকারণেই বুক ভেদ ক'রে নেমে আসে চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস। প্রতিবেশীরা কিন্তু আশ্বাস দেন—বুঝ্‌লে হে অশোকনাথ, ছেলে তোমার হবে পাকা ব্যবসায়ী। এই বয়সে কি ক্ষুরধারই না হয়েছে ওর বুদ্ধি! মাঝে মাঝে আমাদেরই হকচকিয়ে পথে বসিয়ে দেয়।···

কথাগুলো যশোদাময়ীর কানে গিয়ে ওঠে। মনে মনে খুশী হ'ন তিনি। ছেলে তাঁর—ধনে, যশে, সমাজের পাঁচজনের একজন হ'বে। সেই কামনাই ত নিয়ত ক'রেছেন মনে-প্রাণে। তার সফলতা নিজের চোখে দেখ্‌তে না পেলে—অন্তর কি কভু তৃপ্তি পেতে পারে কোন দিন? তাই স্বেচ্ছায় নিজেই স্বামীর কাছে কথাটা পাড়্‌লেন—তুমি ত নিজে বিবাগী মানুষ! ছেলে মানুষ ক'রার সাধ্য তোমার নেই। বরং অনাথকে বাবার হাতে তুলে দিই—তিনিই যদি ওকে কোনদিন মানুষ ক'রে তুল্‌তে পারেন!

বাধা দিলেন না অশোকনাথ। বাড়ন্ত গাছ পত্তনেই যায় চেনা। ও হবে না তাঁর নিজের পথের পথিক—তার যাত্রা পথ ভিন্ন—তাকে বাধা দিয়ে লাভ কি?···

* * * *

অনাথবন্ধুর বয়স যখন হ'ল বছর আট কি নয়, যশোদাময়ী পিতা অমরনাথের হাতে সঁপে দিলেন ছেলেকে। ব'ল্‌লেন—তোমার মনের মত ক'রে গড়ে তোল বাবা—এর বেশী বলার কিছু আমার নেই।

খুশী হ'লেন অমরনাথ। মেয়ের দুঃখের বোঝা, লাঘব করাই তাঁর

আন্তরিক কামনা। তিনি শিক্ষায় দীক্ষায়, অনাথবন্ধুকে নিজের সহযাত্রী ক'রে গ'ড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে চল্‌লেন।

চালাক চতুর ছেলে। মনের গতিপথের তালে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চল্‌লো সে ধীরে ধীরে। ফলে, মাত্র কয়েক বছরের সাধনায় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌লো ব্যবসায়ী মহলে। সেই সঙ্গে শ্রীহীন সেই আঙিনাটা শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে উঠ্‌লো কয়েক মাসের ব্যবধানে।

উৎসাহিত হ'লেন অমরনাথ। তিনি মনে-প্রাণে কামনা করেন, অনাথবন্ধু পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসুক, তার বংশের হৃত ঐতিহ্য। সেই কাজেই তিনি তাকে আপ্রাণ সাহায্য ক'র্‌তে লাগলেন নীরবে।

বাল্যবন্ধু রবীন্দ্রনাথ, বিত্তশালী সমব্যবসায়ী। তাঁর একমাত্র কন্যা মৃণালিনীই, ভবিষ্যতে হবে তাঁর এই বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। অমরনাথ, অনাথবন্ধুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আশায়, বাল্যের বন্ধুত্বটাকে আত্মীয়তার দৃঢ় বাঁধনে আবদ্ধ ক'র্‌তে সচেষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লেন। নিজেই উপযাচক হ'য়ে অনাথবন্ধুর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব ক'রে বস্‌লেন।

রবীন্দ্রনাথ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'র্‌লেন না। কারণ এমনি উদ্যোগী একটি পাত্রের সন্ধানই তিনি ক'র্‌ছিলেন গোপনে গোপনে। রাজি হ'লেন এক কথায়। ঘটা ক'রে বিয়ে দিলেন মৃণালিণীর।

অশোকনাথের সংসারে সুখ ও শান্তি ফিরে এলো পুনরায়। বংশের হৃত যশ ও ঐতিহ্য, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'তে সুরু হ'ল দিনের পর দিন। কিন্তু অশোকনাথের মুখের হাসি ঝরে গেল চিরদিনের মত।

অনাথবন্ধু বাস্তবপন্থী। কিন্তু পিতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না এতটুকু। নানা উপায়ে তিনি অশোকনাথকে খুশী ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌লেন কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই তাঁর ব্যর্থ হ'ল একের পর এক। যশোদাময়ী ছেলেকে অবশ্য আশ্বাস দিলেন, ওর জন্য মিথ্যা চিন্তা ক'রে লাভ নেই অনাথ! চিরদিনটাই ও নির্ব্বিকার এমনি।...

ইতিমধ্যে কেটে গেল আরও কয়েকটা বছর। জন্মালো অনাথবন্ধুর একটি শিশু পুত্র। মুখরিত হ'ল সংসার—মুখর হ'ল আত্মীয়স্বজন। অশোকনাথের অন্তরও খুশীতে ভরপুর হ'য়ে উঠ্‌লো। নিজেই উপযাচক হ'য়ে এগিয়ে এলেন। সকলের আগে নামকরণ ক'রে বস্‌লেন—"মরমীপ্রকাশ"!

বাধা দিয়ে উঠ্‌লেন যশোদাময়ী, নাম খুঁজে পেলে না বুঝি এ দুনিয়ায়? আহা কি নামের বাহার? তার চেয়ে আমার নন্দদুলাল শত গুণে শ্রেয়।

অশোকনাথ উত্তরে মৃদু হাস্‌লেন। ব'ললেন, তোমরা বুঝ্‌বেনা ওর মূল্য। কিন্তু ও নিজেই এ নামের সার্থকতা বজায় রাখ্‌বে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস!

উপেক্ষার হাসি, হেসে উঠ্‌লেন যশোদাময়ী। ব'ললেন, ভোলানাথের মত ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ কিনা তুমি! তাইতো ভাগ্যের রূপ আমার বিচ্ছুরিত হ'য়েছে দশদিক!

এর চেয়েও বেশী চাও তুমি?

বেশী কথা ক'য়ো না ব'ল্‌ছি! বিরক্তি প্রকাশ করেন যশোদাময়ী। বলেন, মেয়েদের মনের দিকে তাকিয়ে দেখেছো কি কোনদিন? না তাদের জীবনের আশা-আকাঙ্খার রূপ চিন্তা ক'রে দেখেছো কোনকালে? জানোত শুধু সুর—আর তান! সেই তোমার স্বর্গ। সেই নিয়েই ত তুমি থাকো। মানুষের মন-জগতের খবর তুমি রাখ্‌বে কেমন ক'রে?

অশোকনাথ ব্যথা বোধ করেন। যশোদাময়ী, স্ত্রী হ'য়েও স্বামীর মনের কথা ভেবে দেখ্‌লেন না কোনদিন! মুখের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টি ফিরিয়ে একটিবার বুঝ্‌তেও চেষ্টা ক'রলেন্ না, ব্যথা কোনখানে? এঁদের কাছে—আবেদন, নিবেদন—মিথ্যা প্রলাপ! এর মূল্য এরা দেবেও না

কোনকালে। একটা জ্বালাময়ী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে উঠে গেলেন অশোকনাথ। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে সুরবাহারখানা তুলে নিলেন পরম নিশ্চিন্তে।...

* * * * *

সমস্ত বাগ্‌বিতণ্ডা ব্যর্থ হ'য়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত মরমীপ্রকাশ নামটাই স্থায়ী রূপ নিল সকলের অজ্ঞাতে।

ধীরে ধীরে বাড়্‌তে লাগ্‌লো মরমীপ্রকাশ। যেমন একরোখা, এক-গুঁয়ে,—তেমনি বদ্‌মেজাজী। যা চায় তা চাইই চাই। নইলে ঘরের আসবাবপত্র ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দেয় একে একে।

ঘরের অধিবাসীরা তার দৌরাত্মে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। অনাথবন্ধু ভবিষ্যৎ চিন্তায় দিশেহারা হ'য়ে পড়্‌লেন, শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটা কি তাঁর দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতে হবে পরিণত?

মৃণালিনী মা। সন্তান তাঁর অন্তর-নিধি,—জীবন-তপস্যা। তাই আর পাঁচজনে যে শঙ্কা ও কল্পনাকে অন্তরে দিলেন স্থান, তিনিও সেই সুরে সুর মিলিয়ে শিশু মরমীপ্রকাশের কাছে মৃদু অভিযোগ প্রকাশ ক'রে ব'ল্‌লেন—শেষ পর্য্যন্ত আমার পেটে তুই একটা ডাকাত এলি?

মরমীপ্রকাশ সে কথার অর্থ বোঝে না—কিন্তু মার অন্তরবেদনার স্পর্শ অনুভব করে। তাই অর্থহীন দৃষ্টিতে মার মুখের দিকে চির-অপরাধীর মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে থাকে তাকিয়ে।

মৃণালিনীর অভিমান চকিতে যায় মুছে। আদরে কোলে তুলে নি'রে তার চিবুক চুম্বন করেন। বলেন—না রে না, আমার সোনামণি,—তুই কি কখনও ডাকাত হ'তে পারিস্? যা, দাদুর কাছে বসে খেলা কর্! ঘরের কাজগুলো আমি সেরে ফেলি ততক্ষণ...

অশোকনাথ, যে পথের যাত্রী, সে পথের সাথী তাঁর এ জগতে কেউ নেই। কেবলমাত্র সুরবাহার, বেহালা ও সেতারই তাঁর জীবনের একমাত্র

অবলম্বন। সুখ-দুঃখের সাথী হ'ল তারাই। বসে বসে বাজান নিজের খেয়াল খুশীমত।

যখন সুরে তিনি তন্ময়, তখন মৃণালিনী সে ঘরের ভেতর শিশু মরমীপ্রকাশকে বসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন ধীরে ধীরে।

কয়েক সেকেণ্ড নীরবে কেটে যাওয়ার পর পিছন ফিরে তাকালেন অশোকনাথ। শিশুকে একাকী দেখে কোলে তুলে নিলেন পরম আদরে। একহাতে সুরবাহারখানা নামিয়ে রেখে নিজের মনে কথা ব'লে চলেন মরমীপ্রকাশের সঙ্গে—কি দাদু? একটু সুর শুনবে, না গান তুমি একটা গাইবে?

শিশু মরমীপ্রকাশ বোঝে না কিছু, তবুও মাথা দোলায় বার বার।

অশোকনাথ বলেন, তাহ'লে বসো এইখানটায়—একটু চুপ ক'রে বসো! কি বলো?

মরমীপ্রকাশ বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে। অশোকনাথ সোহাগ ভরে এক গাল হাসি হেসে পুনরায় কোলে তুলে নেন সুরবাহারখানা। তারপর একমনে বাজিয়ে চলেন তিনি। আর শিশু আত্মভোলা হ'য়ে শোনে সেই সুর।

যখন থামেন অশোকনাথ, শিশু মরমীপ্রকাশ বাড়িয়ে দেয় তার ছোট দু'খানা হাত।

আদরে তাকে বুকে তুলে নিয়ে অশোকনাথ ফিস্ ফিস্ ক'রে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি একটু বাজাবে নাকি দাদু?

মরমীপ্রকাশ মাথা দোলায়।

অশোকনাথও তার সঙ্গে শিশু হ'য়ে পড়েন। তার হাতে তুলে দেন তাঁর সেই অতিপ্রিয় যন্ত্রখানা। কচি আঙ্গুলগুলো নিয়ে, তারের বুকে খেলা সুরু করেন। টুং টাং রিন্-টিন্ মৃদু সুর ভেসে ওঠে সেই সঙ্গে। শিশু আনন্দে মুখরিত হ'য়ে ওঠে।...

* * * *

আরও একটু বড় হ'ল মরমীপ্রকাশ। দাদু ছাড়া যেন আর তার কেউ নেই এ দুনিয়ায়। মার সঙ্গে সম্পর্ক তার শুধু দুধের।

যশোদাময়ী বিরক্তি প্রকাশ করেন—না, দেখছি ছেলেটার মাথা খাবে তুমি শেষ পর্য্যন্ত।

উত্তরে হাসেন অশোকনাথ। বলেন—ইচ্ছা ক'র্‌লেই কি খাওয়া যায় বড়বৌ? মনে আমার কত বাসনা ছিল, আজীবন যা সাধন ক'র্‌লাম, তা রক্ষার ভার দিয়ে যাবো তোমার অনাথবন্ধুর হাতে—কিন্তু সে ইচ্ছা কি আমার সফল হ'য়েছে, না সে বুকের তৃষা আমার মিটেছে কোনকালে? পাশাপাশি ত ঘর করো, কই মুখের দিকে ফিরে কি তাকিয়ে দেখেছো কোন সময়ে? সে সৌভাগ্য জীবনে এলো না ব'লে, মনে কতদিন কত ক্ষোভ জমা হ'য়েছে, রাগ ক'রে কথাও দু-চারদিন বন্ধ ক'রেছি কিন্তু তোমার সেই শুকনো ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির থাক্‌তে পারিনি কোনদিন! চকিতে মুছে গেছে অন্তরের আমার সমস্ত অভিমান। মনে হ'য়েছে, তোমার ব্যথাটাই বোধ হয় সকল কিছুর চেয়ে বড়। নীরবে তোমারই কাছে ক'রেছি আত্মসমর্পণ। তবুও কি ফিরে তাকালে কোনদিন?

একটু থেমে মৃদু একটু হাসি হেসে ব'ল্‌লেন অশোকনাথ, জীবনের সেদিন আজ অতীত বড়বৌ, কিন্তু তার আক্ষেপ আজও মুছতে পারিনি—হয়ত পারা যায় না কোনদিন! তাই সব কিছুর মধ্যে বসবাস ক'রেও তৃপ্তি নেই। ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে জীবনের তৃষা পরিপূর্ণ ক'রে নেওয়ার এমন সুযোগ ও অবকাশ পেয়েও হৃদয়টা আমার তেমনি অতৃপ্তই র'য়ে গেল! ব'ল্‌তে পারো কিসের দুঃখ ও বেদনায়?

বুঝি না বাবু! মুখখানা ভার ক'রে খাড়া হ'য়ে দাঁড়ালেন যশোদাময়ী। অশোকনাথ একটু জোর দিয়ে হেসে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন—অপরাধ তোমার

নয়, আমারও নয়, সবই মানুষের ভাগ্য। যার উপর কারও হাত নেই—যার বিরুদ্ধে শুধু অভিযোগই করা যায়—প্রতিকার করা চলে না।

বেদনাটা কি শুধু একার? তাঁর নিজেরও কি বলার কিছু নেই? রুদ্ধ অভিমানটা আত্মপ্রকাশের আশায় মাথা খুঁড়ে মরে। কিন্তু স্বামী পাছে ব্যথা পান. সেই ভয়ে ফিরে গেলেন তিনি নীরবে।

আদরে মরমীপ্রকাশের চিবুকে মৃদু দোলা দিয়ে ব'লে ওঠেন অশোকনাথ—একটি জীবন সাথীহারা হ'য়েই কেটে এলো প্রায়! বোধ করি তারই বেদনা বিদূরণের আশায় স্রষ্টা দূত পাঠিয়েছেন তোমাকে। আবেগে বুকের মধ্যে তাকে নিবিড়ভাবে চেপে নিজের মনে নিজেই ব'লে উঠলেন—দাদু আমার বড় ভালো—বড় ভালো ছেলে—

মৃণালিনী হাসিমুখে ভেতরে এসে দাঁড়ালেন। মৃদু প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন, এমন লক্ষ্মী ছেলে কেউ দেখেনি কোন দিন। সারা বাড়ীটা অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে এইটুকু বয়সে। বড় হ'লে কি যে হবে কে জানে? আপনার ছেলে বলে, ওটা ডাকু হবে নিশ্চয় ভবিষ্যতে।

মৃদু হাসেন অশোকনাথ। বলেন—না মা। দাদু কি আমার ডাকু হ'তে পারে? দেখবে, ও এমন একটি রত্ন হবে, যার জোড়া সারা দুনিয়ায় কেউ খুঁজে পাবে না কোন দিন! না দাদু? আদরে চিবুকটা দোলান্ অশোকনাথ।

মরমীপ্রকাশ সেই সুরে মাথা দোলায় মৃদু।···

* * * *

মরমীপ্রকাশের বয়স হ'ল বছর পাঁচ, ছয়। কোনমতেই পড়াশোনায় মন তার বসে না। নিত্য নোতুন বই হারায়। কখনও বা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে রাখে। লেখার শ্লেট নিত্য ভাঙে, না হয় পাড়ার ছেলে-মেয়েদের বিলিয়ে দিয়ে আসে।

ভবিষ্যৎ ভেবে সবাই আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠে।

অশোকনাথ কিন্তু দমেন না এতটুকু। বলেন, তোমরা ব্যস্ত হ'চ্ছো কেন? বয়স হ'লে সব শুধ্‌রে যাবে!

অনাথবন্ধু বলেন—যত উদ্ভট কথা আপনার। জানেন, দিনের পর দিন কিরূপ দুষ্টু হ'য়ে উঠ্‌ছে ছেলেটা?

ছোট বয়সে ছেলেরা একটু দুষ্টু হ'য়েই থাকে। মৃদু হাসেন অশোকনাথ। ব'ল্‌লেন—আমাদের চোখটা চামড়ার কিনা—তাই বুঝ্‌তে একটু ভুল হ'য়ে থাকে। ওটা কিছু নয়—প্রকৃতির আত্মবিকাশ। মানে ওর প্রাণটা হবে তাজা, পৃথিবীকে দান ক'র্‌বে ও নিত্য নোতুন কোন কিছু। ব্যস্ত হ'লে কি চলে? একটু ধৈর্য্য ধরো—সময় এলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

বাধা দেন অনাথবন্ধু। বলেন, আপনাদের ওই সব অন্ধ সংস্কারগুলো ছাড়ুন্ ত একে একে! ওতে ছেলের পরকাল ঝর্‌-ঝরে হয়—গঠন হয় না কিছু।

অশোকনাথ মনে ব্যথা পান, কিন্তু মুখ ফুটে বলেন না কোন কিছু। নিজেই নিজেকে আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করেন—ছেলে তার। ভবিষ্যতের জন্য চিন্তিত হওয়াটা যুক্তিসঙ্গতও বটে···তবুও কিন্তু মনে স্বস্তি ফিরে পান না তিনি। চঞ্চল চিত্তে ফিরে আসেন নিজের ঘরে। পুনরায় তুলে নেন্ সুরবাহারখানা। কিন্তু সেও যেন তার ছন্দ হারিয়ে ফেলে বারে বার! সেও যেন ভুল ক'রে বেসুরে বাজে ঘুরে ফিরে। বিরক্তিভরে কোল থেকে যন্ত্রখানা নামিয়ে রাখ্‌লেন একপাশে। একমনে চিন্তার আবর্ত্তে ডুব দিয়ে ভেসে গেলেন কোন সে এক সুদূর সুরম্য দেশে। সব কিছুই সুন্দর সেখানে। কিন্তু আপনার বলে দাবী করার অধিকার নেই কোন কিছুতে। সঙ্গে সঙ্গে বুক ভেদ ক'রে নেমে এলো একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস। সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন অশোকনাথ। ভাবলেন সবই, অকারণ। তবুও হৃদয় তাঁর একটা অতৃপ্ত বেদনার রসে হ'ল ভরপুর। নিজের মনে নিজেই ব'লে উঠ লেন, হ্যাঁ, এমনিই হয় বটে! মরমীপ্রকাশ তাঁর জীবনের দ্বারে সুদ মাত্র

আজ। আসল হ'ল অনাথবন্ধু! কিন্তু আসলের চেয়ে সুদটাই যে মিষ্টি সকলের চেয়ে বেশী। তাই, হ্যাঁ—আজ প্রাণে তাঁর এত ব্যথা! এত আলোড়ন!...

* * * *

বহু চেষ্টা হ'ল। কোন মতেই মরমীপ্রকাশের মনকে বাঁধ্‌তে পারা গেল না। শিক্ষকের পর শিক্ষক পরিবর্ত্তন করা হ'ল। তাঁরা সকলেই ফিরে গেলেন একে একে।

হতাশ হ'লেন অনাথবন্ধু। শেষ পর্য্যন্ত ছেলেটা হ'বে একটা গণ্ডমূর্খ, চোর, না হয় ডাকাত। তার বেশী—না—না সে আশা পোষণ করার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত নেই আজ তাঁর। সমস্ত আত্মবিশ্বাসটুকু হারাতে বাধ্য হ'লেন তিনি।

সকল কিছুর পর সাধনা-বেদী থেকে নেমে এলেন অশোকনাথ। ব'ল্‌লেন, তোমাদের পরীক্ষা ত শেষ হ'য়ে গেছে, এবার ওকে তুলে দাও আমার হাতে। সত্যিকার মানুষ গড়ে তুল্‌বো আমি!

অনাথবন্ধুর মনে জাগ লো নোতুনের ক্ষীণ একটু আশা। কিন্তু দীর্ঘ-শ্বাস ত্যাগ ক'র্‌লেন—যশোদাময়ী। ছেলেটার ইহকাল, পরকাল ব'লে যেটুকু ছিল বাকী, সেটুকুও এবার হবে নিঃশেষ! কিন্তু মুখ ফুটে প্রতিবাদ ক'র্‌তে পার্‌লেন না তিনি। হাজার হোক—স্বামী ত তিনি! শত মতবিরোধ থাক্‌লেও তিনিই ত অতীতের গৃহস্বামী!...

* * * *

মরমীপ্রকাশের বয়স যত বাড়ে ততই সে চঞ্চল ও অধীর হ'য়ে ওঠে। একটি মুহূর্ত্তও স্থির থাক্‌তে পারে না। সে যে কি চায়, কেন যে সে ছুটে বেড়ায়—সেটুকু উপলব্ধির বয়স তখনও তার হয়নি। কিন্তু যাঁরা দূরদর্শী তাঁরা বুঝ্‌তে পারেন প্রাণের এই যে চঞ্চলতা—ওটা সৃষ্টির প্রেরণা। তার রুদ্ধ আবেগে হৃদয় হ'য়েছে উন্মনা! সেই উন্মাদনা ও উত্তেজনায় আজ সে এত অধীর—এত চঞ্চল!

অশোকনাথ সে কথাটা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেন। তাই অকারণ তিরস্কারের পরিবর্তে স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বলেন, একটু স্থির হ'য়ে বোসতো এবার দাদু!

পর মুহূর্তে তিনি সেতারখানা কোলে তুলে নিয়ে সুর দেন ধীরে ধীরে।

চঞ্চল-মনা মরমীপ্রকাশ চঞ্চল আবেগে চুপি চুপি দ্বার পর্য্যন্ত যায় এগিয়ে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া আর তার হয় না। সুরের সেই অজানা আকর্ষণে ধীরে ধীরে পিছন ফিরে সে একেবারে দাদুর কোলের কাছে এসে ব'সে পড়ে নিঃশব্দে। মোহিত হ'য়ে শোনে সে একমনে। এমনি ক'রে কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অকারণ চঞ্চলতা তার স্তিমিত হ'য়ে আসে। অশোকনাথ বুঝ্তে পারেন—অন্তর তার কি চায়!

বহুক্ষণ পরে সুরের আবর্ত্ত থেকে নিজেকে ছিন্ন ক'রে স্থির হ'য়ে ব'স্লেন অশোকনাথ। পাশে নামিয়ে রাখ্লেন সেতারখানা।

তন্ময় শিশু সেই মুহূর্ত্তেই চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—ওটা কি দাদু?

—সেতার! তুই শিখ্বি?

উৎসাহিত হয় মরমীপ্রকাশ। মাথা দু'লিয়ে ব'লে, হ্যাঁ!

মৃদু হাসেন অশোকনাথ। বলেন, আরও একটু বড় হও দাদু!

আপত্তি ওঠে মরমীপ্রকাশের কাছ থেকে। বলে—না! এখুনি।

অশোকনাথ সাদরে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে চিবুক পরশে বলেন, শিখবে বইকি ভাই। তোমাকে শেখাবার জন্যেই ত বসে আছি এতদিন। কিন্তু তার পূর্ব্বে তোমায় যে দাদু বসে বসে শুনতে হ'বে কিছুদিন!

শিশুর জিদ্ বাড়ে বই কমেনা। বলে—না! এখুনি।

—বেশ তবে তাই হো'ক। ব'লেই সেতারখানা তার কোলে তুলে ধ'রে ব'ল্লেন—দেখ্ছো ত দাদু এটার ওজন কত বেশী! এর ভার বইবার মত অন্ততঃ আরও একটু বড় হও আগে!......

* * * *

সুরের নেশা পেয়ে বস্লো মরমীপ্রকাশের। তার সেই চঞ্চলতার স্রোতে ভাটা প'ড়্লো কিছুদিন। সে দাদুর সঙ্গে ঘোরে, ফিরে, খায়, ঘুমায় একই শয্যায়।

আঁৎকে ওঠেন যশোদাময়ী। সর্ব্বনাশ! ওটাকেও কি—নিজের মতই ক'র্বেন,—ছন্নছাড়া, উদাসী—বিবাগী?

অনাথবন্ধু আশ্বাস দেন—ভয় কি মা! বাবা কি এতখানি ভুল জীবনে ক'র্তে পারেন—না সম্ভব কোন দিন?

যশোদাময়ী বলেন—ওরে তোরা চিনিস্নে ওকে! ও এমনি সর্ব্বনাশা লোক, নিজের স্বার্থের জন্যে, ঘর পর বাছে না—বুক ভেঙে দেয় নির্ম্মম পাষাণের মত!—ওদের হৃদয় ব'লে কোন বস্তু নেই। পৃথিবীর জীব হ'য়েও এ জগতের প্রতি ওদের কোন আকর্ষণ নেই, ওরা নিষ্ঠুর—পাষাণ!

অবজ্ঞার হাসি হাসেন অনাথবন্ধু! বলেন, ছিঃ—কি ব'ল্ছো মা? ওঁরা শিল্পী। নোতুনের সৃষ্টিই ওঁদের পেশা। ওঁদের মত দরদী হৃদয় আছে কি এ জগতে?

কি জানি বাবু! দীর্ঘশ্বাস ত্যাগে নীরব হ'য়ে পড়েন যশোদাময়ী। ওঁর বিরুদ্ধে যে তাঁর কত অভিযোগ, সে কি সব খুলে বলা যায় সন্তানের কাছে? যে স্বামী নারী-জীবনের অমূল্য সম্পদ—শত সাধনার ধন, আত্মপ্রতিষ্ঠার যিনি একমাত্র অবলম্বন—তাঁর বিরুদ্ধেও যে অভিযোগ ওঠে, সেটা যে কত দুঃখের—হৃদয়ের সে ক্ষতের বেদনা যে কত গভীর ও সুতীব্র—তা ব্যক্ত করার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই এ-জগতে।

তাই নীরবে দগ্ধে মরা ছাড়া মুক্তির দ্বিতীয় পথ আজ আর তাঁর খোলা নেই! তবুও একটা অকারণ দীর্ঘশ্বাস বুক ভেদ ক'রে নেমে এলো ধীরে ধীরে।...

*   *   *   *

অশোকনাথ নিঃসঙ্গ জীবনের একনিষ্ঠ সাথী পেয়েছেন একজন। তার কাছে জীবনের সুখ-দুঃখের কথা ব্যক্ত ক'রে চলেন, দিনের পর দিন। যদিও তিনি ভাল ক'রেই বোঝেন, এগুলো ওর এই শিশু-জীবনে, প্রলাপ ছাড়া অন্য কিছুর মূল্য পাবে না কোনদিন—তবুও বলেন, হৃদয়টা ত হাল্কা হয় খানিকটা।

শেষে তুলে নেন বেহালাখানা। বলেন—এই যে বেদনা, এর সুরে, সুর মেলালে—কি জালে বুনে জানো দাদু?

বালক মরমীপ্রকাশ কি উত্তর দেবে জানে না, তবুও সে মাথা দোলায়।

উত্তরটা খুবই অস্পষ্ট। কিন্তু সাধক অশোকনাথের কাছে সেই ইঙ্গিতটুকু স্পষ্টতর হ'য়ে ওঠে। মৃদু একটু হাসি হেসে অশোকনাথ বলেন—তবে শোন দাদু—সে সুরের নমুনা।—

অপূর্ব্ব সে করুণ মূর্ছনার বেদনায় ভরে যায় সারা ঘরখানা। মরমীপ্রকাশ নিতান্ত নাবালক। সে ও অভিভূত হ'য়ে পড়ে।

সুর থামে। অশোকনাথ মৃদু হাসেন। বলেন, এমনি হৃদয়ের রস নিঙ্ড়ে, বাজাতে যেদিন তুমি পার্বে দাদু, সেদিন তুমিও হ'বে সার্থক শিল্পী। সেদিনই চিন্তে পার্বে এ পৃথিবীর রূপ—চিন্তে শিখ্বে নিজেকে।

মরমীপ্রকাশের চোখে, মুখে একটা সুতীব্র বিস্ময় পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে।

অশোকনাথ কিন্তু আত্মবিভোর। বলে চলেন, এ-জগতটা শুধু বেদনার সুরে ভরপুর—এর আকাশে, বাতাসে শুধু সেই বেদনার

ছন্দগাঁথা। জাগাতে পার্‌বে না, দাদু? পার্‌বে না জাগাতে সে সুর?

মাথা দোলায় মরমীপ্রকাশ। বলে, হ্যাঁ পার্‌বো!

আবেগে বুকের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরেন অশোকনাথ। বলেন—জানি, আমার এ সাধনা ব্যর্থ হবে না কোনদিন! তাইত তোমার আশা-পথ চেয়ে বসে আছি এতকাল! একটু থেমে বলেন—রূপ, হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেই রূপ নিশ্চয় দেবে—আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—নিশ্চয় দেবে তুমি!···

* * * *

অশোকনাথ মরমীপ্রকাশকে কিনে দিলেন নোতুন একটা সেতার। কিন্তু ভাঙা-গড়ার কাজে প্রথম হাত পাকালো মরমীপ্রকাশ।

অশোকনাথ মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—কি হ'ল ভাই?

তারটা কেটে গেল, দাদু।

একটু জোরে কান মুলে ছিলে বুঝি?

মাথানত ক'রে একটু সলজ্জ হাসি হাসে মরমীপ্রকাশ।

আশ্বাস দেন অশোকনাথ—ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে। যন্ত্রী হ'তে হ'লে—যন্ত্রের সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা একটু গভীরতর হওয়া উচিত নয় কি! একটু টেনে মৃদু হেসে ব'ল্‌লেন—একটা কেন, দশটা ভাঙ্‌লেও আমি দুঃখিত হবো না। পূরোদমে তুমি কাজ চালিয়ে যাও, ভাই।

মরমীপ্রকাশের তবুও লজ্জা কাটে না। সলজ্জ দৃষ্টিতে পিট্ পিট্ ক'রে তাকায় দাদুর মুখের দিকে। আদরে অশোকনাথ মরমীপ্রকাশের চিবুক দোলা দিয়ে বলেন—লজ্জা কিসের, দাদু? এটাই যে এজগতের নিয়ম! কাজে লেগে যাও, ভাই—কাজে লেগে যাও!···

দু'টো সেতার ভেঙে, তার ছিঁড়ে, সত্যই পাকা মিস্ত্রী হ'য়ে উঠ্‌লো মরমীপ্রকাশ। সুরের মাধুর্য্য কোথায় আত্মপ্রকাশ ক'রে, কোথায়

বেসুরো বাজে,—সেই শিক্ষা লাভ ক'র্‌লো প্রথমে। তারপর ধ'র্‌লো সে সুরের সাধনা।···

দিন নেই, রাত নেই—আত্মবিভোর হ'য়ে শিখে চল্‌লো মরমীপ্রকাশ —ঘণ্টার পর ঘণ্টা, রাতের পর রাত, দিনের পর দিন।

খুশী হ'লেন অশোকনাথ। ব'ল্‌লেন, হ্যাঁ, সাধনায় তোমার মন এবার বস্‌লো তাহ'লে দাদু! মৃদু একটু হেসে বলেন—আর ভয় কি? এবার শোন—সময়ের যেমন স্তর ভেদ আছে · সুরেরও ঠিক তেমনি। সেও চ'লে ধাপের পর ধাপ । সময়ের তালে, সেও পা ফেলে চলে। তাই সকল সময়ে একই সুর প্রাধান্য বিস্তার ক'র্‌তে পারে না—সেও রূপ বদ্‌লায়। কিন্তু—একটু টেনে ব'লে উঠ্‌লেন—সে সব শেখার পূর্বে তোমায় যে একটু লেখাপড়াও শিখে নিতে হ'বে, ভাই!

খুশী মনে উত্তর দেয় মরমীপ্রকাশ, শিখ্‌বো। কিন্তু—

কি ভাই? আগ্রহ ভরে প্রশ্ন করেন অশোকনাথ।

অন্য কারও কাছে নয়—তোমার কাছে শুধু!

ভয়ে মুখখানা তাঁর ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠ্‌লো। সেকালের মানুষ, একালের শিক্ষার সঙ্গে তাঁর কতটুকু পরিচয়। তবুও মুখে হাসি ফুটিয়ে আশ্বাস দেন—তাই হবে ভাই, তাই হবে!···

* * * * *

গোপনে অনাথবন্ধুকে ডেকে পাঠালেন অশোকনাথ।

খুশী মনে অনাথবন্ধু দেখা ক'র্‌তে এলেন বাবার সঙ্গে। মা তাঁর যত আশঙ্কাই পোষণ করুন না কেন, বাবার সাহচর্য্য ও পরিশ্রমে ত ডাকাত ছেলেটার মনটা স্থির হ'য়ে উঠেছে! আশার একটা ক্ষীন আলোর রেখা উঁকি দেয় মনের কোণে—বলা ত যায় না, প্রতিভা কখন কার কোন পথে বিকাশ লাভ ক'র্‌বে? কিন্তু···তবুও মনটা স্থির হ'তে পারে না। এই যে পরিবর্ত্তন, এটা সাময়িকও ত হ'তে পারে!···

অশোকনাথ সুরবাহারখানা কোলে নিয়ে আপন মনে সঙ্গত ক'রে চলেছিলেন। কয়েক মিনিট অপেক্ষার পরও যখন তাঁর চমক্ ভাঙ্‌লো না, তখন অনাথবন্ধু মৃদু-কণ্ঠে ডেকে উঠ্‌লেন—বাবা!

সচকিত হ'য়ে সুরবাহারখানা নামিয়ে ধীর-কণ্ঠে ব'ল্‌লেন অশোকনাথ, বসো অনাথ,—অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।

কথা? তবে কি কোন নোতুন কথা? মনটা বিচলিত হ'য়ে ওঠে অনাথবন্ধুর। উৎকণ্ঠিত চিত্তে সুধান্—কি কথা বাবা?

স্থির হ'য়ে বসো। সবই বল্‌ছি ধীরে ধীরে।

কয়েক মিনিট কেটে গেল নীরবে। তারপর ব'ল্‌লেন অশোকনাথ —তোমায় একটা কাজের ভার নিতে হ'বে। হাতে সময় আছে ত?

কি কাজ বাবা? আবেগ মিশ্রিত কম্পিত কণ্ঠস্বর ভেসে উঠ্‌লো পর মুহূর্ত্তে।

উত্তরে অশোকনাথ মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, ব্যস্ত হ'চ্ছো কেন? তবে—কাজটা গুরুদায়িত্বপূর্ণও বটে! মানে, বয়স হ'য়েছে কিনা— নইলে, তেমন কিছু আশঙ্কা আমার ছিল না। হয়ত, একটু কষ্টও তোমার হবে। তা হো'ক—তবুও গভীর রাতে এসে, চুপি চুপি আমায় কিছু ইংরেজী শিখিয়ে দিয়ে যেও কয়েকটা দিন। বাংলা আর অঙ্কে, যে জ্ঞান আমার আছে, সেটা একটু ঝালিয়ে নিলেই চলে যাবে! কিন্তু ভাব্‌ছি—হাতে সময় তোমার কোথায়? কেবল টাকা আর টাকা ক'রে ঘুরে বেড়াও ত সারাদিন! দেহ, মন ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে—যখন তুমি ফিরে আসো ঘরে। তারপর কি এ বুড়োকে শেখানোর ধৈর্য্য তোমার থাক্‌বে?

এ বয়সে তোমার আবার ওসবের কি প্রয়োজন দেখা দিল, বাবা? বিস্ময় বোধ করেন অনাথবন্ধু।

আছে। মৃদু হাসলেন অশোকনাথ। ব'ল্‌লেন, এতদিন ছিল না

কিন্তু আজ বুঝ্‌ছি ওটুকুও অবহেলা করা উচিত হয়নি! তা যাক্, 'ওটা অতীতের কথা। এখন বলো—তোমার সময় হবে কি?

অনাথবন্ধু নীরব। সত্যই সে ধৈর্য্য তাঁর নেই।

মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের কথা বুঝে নিলেন অশোকনাথ। ব'ল্‌লেন, আচ্ছা একটা বই তুমি আমায় কিনে এনে ত দিও, তারপর দেখা যাবে! যদি দরকার বোধ করি, তখন তোমাকে বরং ডাকিয়ে জেনে নেবো কিছু কিছু।

মাথা দুলিয়ে উঠে গেলেন অনাথবন্ধু। অশোকনাথ পুনরায় কোলে তুলে নিলেন তাঁর সেই প্রিয় সুরবাহারখানা।...

* * * *

রাতের পর রাত জেগে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রাথমিক জ্ঞানটা, তিনি পরিপূর্ণ ক'রে নিলেন। তারপর সুরু হ'ল মরমীপ্রকাশের শিক্ষা।

কয়েক মাসের মধ্যে তার সে শিক্ষা যখন সমাপ্ত হ'ল, তখন তিনি পুনরায় ফিরে এলেন তাঁর সুরের রাজত্বে। নবীন উৎসাহে তাকে শিক্ষা দিতে লাগ্‌লেন—সুরের মাত্রা ভেদ। নিজে বাজিয়ে শোনান প্রথমে। তারপর সুরু করে বালক মরমীপ্রকাশ। তার কচি হাতের সুর যেন অধিকতর মিষ্টি ব'লে মনে হয়। খুশী হন অশোকনাথ। ভাবেন—সাধনাটা তাহ'লে তাঁর সার্থক হ'ল এত দিনে।...

শিক্ষার গতি পরিবর্ত্তন করেন অশোকনাথ। এখন শুধু চোখ বুজিয়ে তাকিয়াটা হেলান দিয়ে শোনেন—আর বাজিয়ে সুরের পর সুর শোনায় মরমীপ্রকাশ। ভুল-চুক হ'লে শুধ্‌রে দেন তিনি। মুখে, সঙ্গত করেন অশোকনাথ—আর মরমীপ্রকাশ তারের বুকে ভাঁজে সেই সুর।...

মরমীপ্রকাশের বয়স বাড়ে। বাল্যের চপলতায় কৈশোরের চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করে। ভাবে, তার শিক্ষার হ'ল বুঝি শেষ! আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতায় অধীর হ'য়ে ওঠে সে দিনের পর দিন।

বাধা দেন অশোকনাথ। বলেন, শিক্ষার কি শেষ আছে রে ভাই?

কিন্তু—কি যেন ব'ল্‌তে চায় মরমীপ্রকাশ।

সহাস্যে সেই সুরে সুর মিলিয়ে, অশোকনাথ ব'লে ওঠেন,—ভাব্‌ছো বুঝি, দাদুর ঝুলি শেষ হ'য়ে গেছে—বাকী কিছু নেই? একটু থেমে মৃদু হাস্‌লেন পুনরায়। ব'ল্‌লেন, শিক্ষার কি শেষ আছে, দাদু? সারা জীবন ধরে মানুষ শুধু শেখে, আর সেই শেখাটাই হ'ল জীবন। এর রূপ, রস ও গন্ধ নিয়েই গ'ড়ে ওঠে জীবনের বিরাট ইতিহাস। একটু থেমে ব'লেন, এই যে এত বুড়ো হ'য়েছি, তবুও কি শিক্ষার আমার শেষ হ'য়েছে আজও? দেখ্‌ছো না—নিত্য-নোতুন সঙ্গত ক'রে চলেছি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস! তবুও এর সব কিছু জানার অবকাশ আস্‌বে না একটা জীবনে। কারণ এ বস্তুটা অনাদি, অনন্তের মতই সীমাহীন! পুনরায় একটু থেমে ব'ল্‌লেন, যেটুকু পেয়েছি, সেইটুকুই তোমার সাম্‌নে তুলে ধরেছি। এর পরেও অনেক কিছু বাকী র'য়ে গিয়েছে, যার সন্ধান আজও আমি পাইনি। তাই ত বার বার বলি, যত্ন করো—চেষ্টা করো, পথের দিশা নিশ্চয় খুঁজে পাবে তুমি!...

* * * *

বৃদ্ধের মনের তৃষা, কিশোর মরমীপ্রকাশের অন্তর স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌লো না। তার নবজীবনের আশা ও আকাঙ্খার উচ্ছ্বাস তাকে দিশেহারা ক'রে তুল্‌লো বারে বারে। সে চায় নাম, চায় শ্রোতা—চায় আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

বোঝেন অশোকনাথ। একদিন তাঁরও জীবনে এসেছিল এমনিতর কিশোররূপী স্রোতের পরশ।—তারপর এলো, যৌবনের—ভরা জোয়ার।

ভাসিয়ে দিল, দেহ-মন কানায় কানায়। পৃথিবীর রূপ, রস ও গন্ধ—তার নগ্ন মাধুর্য্যের ডালি নিয়ে, নিজস্ব স্বত্ত্বাকে ভুলিয়ে রাখ্‌লো'ও কিছু দিন। সেই আত্ম-বিস্মৃতির পথে, চির-হরিৎ দেখেছিলেন—এ দুনিয়াটাকে। তারপর—এলো ভাটার খেয়া। ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব। চেয়ে দেখ্‌লেন, কিছু নেই—পড়ে আছে শুধু পলিমাটি। তারই বুকে জন্মেছে দু'একটা গুল্ম—সেইটুকুই হ'ল তাঁর জীবনের শেষ সঞ্চয়—শেষের অবলম্বন। তাকে কেন্দ্র ক'রেই, অবশিষ্ট জীবনের জীর্ণ ও দীর্ণ অংশটা—চকিতের সেই ভুল সংশোধনে থাক্‌লো ব্যস্ত। সেখানেও তার শেষ নেই—মুক্তি নেই। দুর্নিবার সেই আকর্ষণে—সেগুলো'ও গেল ভেসে। তখন কুহকিনী সেই মিথ্যা আশা—রোমাঞ্চকর মোহের তৃষা আর এই ভুলের মাসুল—সবই ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। পড়ে থাক্‌লো শুধু তার হাহাকার - আর জ্বালাময়া গুটিকয়ের বক্ষভেদী দীর্ঘশ্বাস—ঠিক যেমনটি পড়ে থাকে অতীতের স্মৃতিচিহ্ন-ধারী ঢেলাগুলো। এই যে তিক্ত অভিজ্ঞতার মূল্য—এগুলো'ও বর্তমান ও ভবিষ্যতের চোখে অর্থহীন উন্মত্ত প্রলাপ। নিজের মনে নিজেই মৃদু একটু হেসে উঠ্‌লেন অশোকনাথ। জীবনের ভাঙা-গড়ার ইতিহাসই ত এই! অপরাধী ত মরমীপ্রকাশ নয়!

তবুও অকারণে বুক ভেদ ক'রে নেমে এলো একটা জ্বালাময়ী দীর্ঘশ্বাস। ব্যথার এই যে বহিঃপ্রকাশ—এঁকে ত রোধ করা সম্ভব নয় কোনকালে! তাই স্থির ক'র্‌লেন, একটা বিরাট গানের জল্‌সা বসিয়ে, ভেঙে দেবেন তার এই চকিতের ভুল। বুঝিয়ে দেবেন, যতটুকু সে শিক্ষা পেয়েছে এই জীবনে—সেটা নগণ্য, কয়েকটা কণা মাত্র। সত্যকার জ্ঞানী হ'তে হ'লে, চাই গভীর সাধনা—চাই অন্তরের গভীরতর আকুলতা!...

* * * *

যথা সময়ে ব'স্‌লো গানের জল্‌সা। দেশ-বিদেশ থেকে এলেন বড় বড় পণ্ডিত। তাঁরা বাজিয়ে শোনালেন বিভিন্ন সুরের তাল ও লয়ের মাত্রা। মরমীপ্রকাশও সঙ্কুচিত চিত্তে সভয়ে শোনালো তার শিশু-শিল্পীমনের কোমল একটি সুর। যার মূর্চ্ছনায় ভরে গেল সারা আঙিনাটা। সবাই খুশী হ'লেন। আশ্বাস দিলেন, ভবিষ্যতে সে যে সত্যই একজন গুণী-শিল্পী হ'য়ে উঠ্‌বে সে বিষয়ে তাঁদের সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

নামটা ছড়িয়ে প'ড়্‌লো মরমীপ্রকাশের। তার সেই প্রলুব্ধ শিশু-অঙ্কুর-মন, এই পৃথিবীর পরিপূর্ণ আলো বাতাসের সুখ-পরশের আশায় ব্যাকুলতর হ'য়ে ওঠে।

অশোকনাথ বার্দ্ধক্যের দৌর্বল্য কাটিয়ে একটু, সবল হ'য়ে উঠেছেন। ভাবেন, যাক্‌না ও বহির্বিশ্বে। একটু ঘুরে ফিরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে আসুক না কিছুদিন! তারপর নিজের ভুল যেদিন তার নিজের কাছে ধরা প'ড়্‌বে—সেদিন তাকে ফিরে আস্‌তেই হ'বে এই ঘরে।...

নানা জল্‌সার মজ্‌লিশে ডাক্ প'ড়্‌তে সুরু হ'লো মরমী-প্রকাশের। গুণ-মুগ্ধ শ্রোতাদের স্বল্প প্রচেষ্টায় মোহিত ক'রে, বিজয়মাল্য গলদেশে বরণ ক'রে, হাসিমুখে ঘরে ফিরে সে আস্‌তে লাগ্‌লো দিনের পর দিন।

উৎসাহিত হ'লেন অনাথবন্ধু ও যশোদাময়ী। মৃণালিণী সকলের চেয়ে বেশী গর্ব্ব অনুভব ক'র্‌লেন মনে মনে। আজ তাঁর মাতৃত্বের সাধনা সত্যই সার্থক মণ্ডিত হ'য়েছে। ছেলে তাঁর অন্তরের আশা ও আকাঙ্খাকে রূপ দিতে পেরেছে যথাযথরূপে। এর বেশী সৌভাগ্যের আশা তিনি পোষণ ক'রে নি কোনদিন। কিন্তু মুষ্‌ড়ে প'ড়্‌লেন অশোকনাথ। তাঁর এত দিনের সাধনা, তবে কি সবই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে?...

পুনরায় তুলে নিলেন তাঁর প্রিয় সেই সুরবাহারখানা। গভীর

নিশিথিনীর বুকে ছড়িয়ে দিলেন তাঁর উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ের সমস্ত বেদনা। আকাশ-বাতাস মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌লো সেই সুরের মূর্চ্ছনায়।

গভীর নিদ্রামগ্ন মরমীপ্রকাশ। সহসা সুরের ঝঙ্কারে টুটে গেল তার সুখ-নিদ্রা। বিস্ময়াভিভূত হ'য়ে উঠে ব'স্‌লো শয্যার ওপরে।

কয়েক মিনিট স্থির হ'য়ে শুন্‌লো সেই সুর। অন্তরটা তার বেদনায় ভরে উঠ্‌লো, সেই তাল ও লয়ের ফাঁকে ফাঁকে। অধীর আবেগে উন্মত্তের মত দরজা খুলে ছুটে এলো সে অশোকনাথের ঘরের ভেতরে।

সুরে তন্ময় অশোকনাথ। ভুলে গেছেন তাঁর নিজেরই অস্তিত্ব। বুঝ্‌তে পার্‌লেন না—কখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মরমীপ্রকাশ।

বহুক্ষণ পরে অশোকনাথ নামিয়ে রাখলেন সুরবাহারখানা। অশ্রু-ভারে চোখের পাতাগুলো তাঁর ক'র্‌ছে টল্‌মল্‌!

মন্ত্র-মুগ্ধ মরমীপ্রকাশ। তবুও সেই দৃশ্য দেখে স্থির থাক্‌তে পার্‌লো না একটি মুহূর্ত্ত। মৌনতা ভেঙে, অভিভূত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো, তুমি কাঁদ্‌ছো দাদু?

কণ্ঠস্বরে নিজের চেতনা ফিরে পেলেন অশোকনাথ। উচ্ছ্বাস-ভরা কণ্ঠে দু'হাতে চোখের পাতাগুলো মুছে নিয়ে ব'ল্‌লেন—কান্না? না দাদু—ওটা সৃষ্টির সার্থকতা!

কথাটার ঠিকমত অর্থ উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌লো না মরমীপ্রকাশ। ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে শুধু তাকিয়ে রইলো দাদুর মুখের দিকে।

মৃদু হাস্‌লেন অশোকনাথ। আদরে তার চিবুকটা মৃদু দোলা দিয়ে ব'ল্‌লেন—সৃষ্টির বেদনায় প্রাণটা চঞ্চল হয়, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশে—যখন সে পায় তার পথের সন্ধান,—তখনই সে আনন্দে এমনিতর ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে! একটু থেমে ব'ল্‌লেন, সেই মুহূর্ত্তে নামে চোখের কোণে জল। এটা ব্যথার প্রতীক নয় ভাই—আনন্দের প্রতিচ্ছবি!

কিন্তু—থেমে যায় মরমীপ্রকাশ। কণ্ঠে তার অভিমান-ভরা সুর।

থাম্‌লে কেন ভাই? বলো—

এ সুর ত তুমি আমায় কোনদিন শেখাও নি দাদু!

শেখাইনি? বল কি? মৃদু হাসেন অশোকনাথ।

হ্যাঁ সত্যই শেখাওনি তুমি!

পুনরায় হাস্‌লেন অশোকনাথ। ব'ল্‌লেন—নিজে না শিখ্‌লে, কেউ কি কাউকে, শেখাতে পারে মরমীপ্রকাশ?

তার মানে? কণ্ঠস্বর তার অভিমান ও উত্তেজনায় ভরা।

সহাস্যে অশোকনাথ ব'ল্‌লেন—মনে পড়ে কি দাদু,—একদিন ব'লেছিলাম—এর শেষ নেই, এ অনন্ত, অপার! কিন্তু সেদিন সেকথা ত তুমি বিশ্বাস করোনি ভাই! চেয়ে ছিলে নাম—পেয়েছো। চেয়ে ছিলে—পাণ্ডিত্যের অভিমান, সেটুকুও মিলেছে—কিন্তু সাধনা তোমার খেই হারিয়েছে, সুনিবিড় আত্মতৃপ্তির সুপ্ত ওই আনন্দের আতিশয্যে। তাই তুমি ত্যাগ ক'রেছো, জীর্ণ এই দাদুর শিক্ষা-মন্দিরকে।—নয় কি?

মরমীপ্রকাশের চোখের পাতাগুলো অশ্রুসিক্ত হ'য়ে ওঠে। অশোকনাথের হাতদুটো ব্যাকুলভাবে বুকের উপর চেপে ধরে ব'লে, আমায় কি তুমি সত্যই ত্যাগ ক'রেছ দাদু? তা' হ'লে আমার কি হ'বে?

সস্নেহে অশোকনাথ তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে ব'ল্‌লেন—ভুল যদি সত্যই তোমার ভেঙে থাকে, ভাই পুনরায় তুলে নাও ওই সেতারখানা! সে পুনরায় মুখর হ'য়ে উঠ্‌বে নোতুন সৃষ্টির প্রেরণায়! পার্‌বে না—তুলে নিতে?

পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লো, ভুল আমার ভেঙে গেছে, দাদু। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ করো—যেন সেই সাধনাই হয় আমার জীবনের চরম লক্ষ্যবস্তু!…

মরমীপ্রকাশের সাময়িক চঞ্চলতা, কিছুদিনের মত পুনঃ স্থবিরতা প্রাপ্ত হ'ল। ডুবে থাক্‌লো সে নিজস্ব সাধনার সীমা-রেখায়। কিন্তু বয়স তার বাড়ে। যৌবন ভরা—ভাদরের মত কানায় কানায় উপ্‌ছে ওঠে তারই তালে তালে। কিসের একটা গোপন ব্যাকুলতায় সে পুনরায় চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। তার সাধনায় পড়ে ভাটা।

বুঝ্‌তে পারেন অশোকনাথ, কোথায় এর গতি, কিসের এই আকর্ষণ। ডেকে পাঠান অনাথবন্ধুকে।

অনাথবন্ধু রীতিমত বিস্ময়-বোধ করেন। যে লোকের জীবনে আয়োজন বা প্রয়োজন ব'লে কোন বস্তু নেই, সেই লোক সহসা এত মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো কেন?

সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন অনাথবন্ধু। অশোকনাথ বেহালাখানা পাশে নামিয়ে রেখে ব'ল্‌লেন, ওই মোড়াটায় একটু চেপে বসো অনাথ. অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।

অনাথবন্ধুর কুতূহল বাড়ে। ভাবেন, হয়ত অজ্ঞাতে কোন গুরুতর অপরাধ ক'রে বসে আছেন তিনি।

মুখর হ'য়ে উঠলেন অশোকনাথ—বয়স অনেক হ'ল—কবে আছি, কবে যে নেই, তার কোন স্থিরতা নেই। তাই ব'ল্‌ছিলাম– ভাল ঘর দেখে, একটি রাঙা টুক্‌টুকে নাত বৌ, এনে দাও দেখি!

অনাথবন্ধু উত্তরে মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, আরও একটু বয়স বাড়ুক! কতই বা বয়স হয়েছে ওর?

কথাটা, গায়ে না মেখে, হাল্‌কা হাসি হেসে উড়িয়ে দিলেন অশোকনাথ। ব'ল্‌লেন,—বয়সের মাপকাঠি নিয়ে পথ চ'লে, মানুষ কতটুকু লাভ করে জানি না, তবে আমার শেষ ইচ্ছাটা তোমায় জানালাম মাত্র। পালন করা বা না করা, সেটা তোমার খুশীর 'পরে নির্ভর করে, অনাথ! অবশ্য এর পরও যদি আমার কাছে যুক্তি নিতে চাও—ব'ল্‌বো

জন্মদাতা পিতা তুমি হ'তে পারো, কিন্তু বয়সে সে আজ তোমার বন্ধুত্বের দাবী রাখে। আমার বিবেচনায় সেটা অনেকখানি যুক্তি-যুক্তও বটে !···

*   *   *   *

অনাথবন্ধু বুঝ্‌লেন, এই নিশ্চিন্ত নীরব মানুষটি যখন একবার সজাগ হ'য়ে উঠেছেন তখন যা হোক একটা কিছু তাঁ'কে ক'র্‌তেই হবে।

কথাটা যশোদাময়ীর কানে গিয়ে উঠ্‌লো। তিনিও খুশী হ'লেন। ব'ল্‌লেন, হ্যাঁ—এতদিনে সত্যিকার বিষয়ী লোক হ'তে পেরেছে বটে ও ! ভেবেছিলাম, সুর, সুর ক'রে নিজের মাথাটা তো নষ্ট ক'রেইছেন, হয়ত নাতির ইহকাল পরকালও ঝর্‌ ঝরে্‌ ক'র্‌বেন তেমনি, কিন্তু একথা যখন মুখ ফুটে তিনি ব'লেছেন, তখন তোমারও উচিত অনাথ, ছোট্ট রাঙা টুক্‌ টুকে একটি বৌ ঘরে আনা। সত্য ব'ল্‌তে কি, একটা বৌ না হ'লে কি ঘর তোমার মানায় ?

মৃণালিনী ব'লেন—মার এক কথা ! ছেলের আমার বয়স কত ? আরও একটু বয়স বাড়ুক ! জগতটাকে অন্ততঃ একটু ভাল ক'রে চিন্‌তে শিখুক !

অনাথবন্ধু সে সুরে সুর মিলিয়ে ব'লেন, আমিও বলি তাই। কিন্তু বাবা যখন ধরেছেন—তখন দ্বিমত করা উচিত হবে না। কারণ বাবার শরীরটা ত সত্যই একটু ভেঙেছে !···

অনেক অনুসন্ধানের পর অনাথবন্ধু একটি মেয়ে খুঁজে বের ক'র্‌লেন, যাকে প্রথম দৃষ্টে শিল্পীর তুলি আঁকা ছবি ব'লে ভ্রম হয়। ব'ল্‌লেন, চলুন একটিবার দেখে আস্‌বেন নিজের চোখে !

অশোকনাথ ব'লেন—তোমাদের যখন পছন্দ হ'য়েছে, তখন আর ঝুট্‌ ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি ? বরং তোমার মাকে একটিবার দেখিয়ে নিয়ে এসো, খুশী হ'বেন তিনি !

কথাটা শুনে সত্যই খুশী হ'লেন যশোদাময়ী। তবুও কিন্তু মনটা তাঁর খুঁত্ খুঁত্ ক'র্‌তে থাকে। ভাবেন—ওঁর পচ্ছন্দের একটা দাম আছে, হাজার হোক একটা গুণী মানুষ ত উনি! নিজেই উপযাচক হ'য়ে ব'ল্‌লেন, চলো না, দুজনেই বরং দেখে আসি একটিবার।

অশোকনাথ তেমনি মৃদু হাসি হেসে ব'ল্‌লেন, জানোত বড়-বৌ, আমার কাছে রূপের চেয়ে গুণের মূল্য অনেকগুণ বেশী।—তা ছাড়া অনাথের বিয়ের ব্যাপারটা আজও আমি ঠিক ভুলতে পারিনি। সংসার তোমাদের। ভালমন্দ তোমরাই ত বোঝ একটু বেশী! মিছিমিছি, আর এ বুড়োকে টেনে লাভ হ'বে কি? তার চেয়ে, নিজের চোখে বরং দেখে শুনে এসো। বৌমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেও! কারণ তিনিই ত গর্ভধারিণী। তাঁর দাবীটাই আমাদের সকলের চেয়ে বেশী।...

* * * *

মৃণালিনী ও যশোদাময়ী ফিরে এলেন। মেয়েটি সত্যই পরমা-সুন্দরী। লেখাপড়া জানে—গান বাজনাও শিখিয়েছেন তার বাবা। তবে—বয়স একটু বেশী!

অশোকনাথ জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, তবু আন্দাজ কত হবে?

যশোদাময়ী ব'ল্‌লেন—তাঁরা ত ব'ল্‌লেন, বারো! আমাদের কিন্তু মনে হয়, পোনেরোর নীচে ত নয়ই—বরং আরও একটু বেশী হতে পারে!

অশোকনাথ সহাস্যে উত্তর দেন, আমাদের ছেলের বয়সও ত আঠারোর নীচে নয়! মানিয়ে যাবে বড়-বৌ—মানিয়ে যাবে। দ্বিমত আর ক'রো না। বরং বলি—লাগিয়ে দাও তাড়াতাড়ি।

এত ব্যস্ত কিসের বলতো?

সঠিক উত্তর দেওয়া সত্যই কঠিন বড়-বৌ! একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ

করে ব'ল্‌লেন, একটা তাগিদ্ আস্‌ছে, স্পষ্টই যেন অনুভব ক'র্‌ছি আমি। —ম্লান একটু হেসে ব'ল্‌লেন, তাই একটু তাড়া দিই আর কি! যা করবার সব সেরে নাও—মিছে বিলম্বের প্রয়োজন কি?…

তাগিদটা সত্যকার ভেতরের নয়, ছিল সম্পূর্ণ বহিঃজগতের—নব-জাগ্রত যৌবনের। একদিন তিনি নিজেই, এর আকর্ষণকে উপেক্ষা ক'র্‌তে পারেন নি! যার বিষময় ফল সারাজীবনটাকে অহরহ দগ্ধে মেরেছে প্রতিটি পলে, অথচ সে পীড়নের হাত থেকে মুক্তি পেলেন না কোনদিন। অসহায়া বাল্য-বিধবা মুকুন্দরাণী, মরে গেছে সত্য, কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনের সেই উৎসাহী শ্রোতা ও অন্তরের প্রেরণা-দাত্রীর স্মৃতি, একটি দিনের জন্যও ভুল্‌তে পারেন নি তিনি।—আহা! অকারণে অশোকনাথের বুক ভেদ ক'রে নেমে আসে দীর্ঘশ্বাস। মনে পড়ে যায় অতীতের সেই স্মৃতি-বিজড়িত দিনগুলোর কথা। বাল্যেরসহচরী, খেলা-ঘরের সাথী,—হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেই টুক্‌টুকে ছোট্ট একটি মেয়ে, লাল চেলী পরে শ্বশুরবাড়ী গেল চলে। কিন্তু যাওয়ার সময় ব'লে গেল, অশোকদা,—আমাকে ভুলে যেয়ো না যেন! তোমার কাছে আবার ফিরে আস্‌বো আমি!

ফিরে এলো কয়েক দিন পরে; কিন্তু মাথার সিঁদুর তার মুছে গেল চিরদিনের তরে। সে বুঝলো না কিছুই। তবুও হ'ল সে বিধবা। তার আজন্মের সংস্কার—জীবনে আন্‌লো স্থবিরতা। সংযমের দৃঢ় আবেষ্টনে দেহটা দীর্ণ হ'তে লাগ্‌লো প্রতিটি পলে—কিন্তু তার মন?—সে পার্‌লো না প্রকৃতির সহজাত সেই ধারাকে উপেক্ষায় উড়িয়ে দিতে। তাই, যৌবন, দেখা দিল তার দেহ-মনে। সেই শুক্‌নো চেহারাটায় লাগ্‌লো বসন্তের ছোঁয়াচ। ফুলে, ফেঁপে, এমন শ্রীমণ্ডিত হ'য়ে উঠ্‌লো যে, তার দিকে তাকিয়ে সহসা চোখ ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রইলো না কারও সে গ্রামে।…

বয়স—বিগত দিনের তালে চলে এগিয়ে। তার জীবনেও লাগ্‌লো বন্যার দোলা। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মাঝে, পরিপূর্ণ মনটা তার আবেগ ও উত্তেজনায় ভরপূর হ'য়ে উঠ্‌লো। পৃথিবীর রূঢ় বাস্তব এই রূপ, মধুময় হ'য়ে ধরা দিল চোখের তারায়। জীবনটাকে মনে হ'ল একটা ছন্দ। আগত ভবিষ্যতকে, কল্পনার রঙিন তুলিতে আঁক্‌তে বস্‌লো সে সুরের পর্দ্দায়। শিহরিত হ'ল দেহ, পুলকিত হ'ল মন। চিন্তার আবর্ত্তে, অজ্ঞাত জীবনের রূপসাধনাটা স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্‌লো ধীরে ধীরে। কিন্তু চলার পথের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ তখনও সে পায়নি, শুধু হাত্‌ড়ে চ'লেছে দিনের পর দিন! ··

সহসা চোখের তারা দু'টো ফিরে এলো সুরবাহারখানার ওপর। রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌লো তাঁর সারা দেহ-মন। কিন্তু পরক্ষণেই বুক ভেদ ক'রে নেমে এলো একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস। ভাবেন অশোকনাথ—হ্যাঁ, এই সেই যন্ত্র—যা আজও তাঁর জীবনের দ্বারে একান্ত প্রিয়তমবস্তু।—এই বস্তুটিকে হয়ত জীবনে তিনি বিস্মৃত হ'তে পার্‌বেন না কোনদিন। এরই সুর, সে শুন্‌তে আস্‌তো দিনের পর দিন। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আজও হৃদয়পটে সেই অতীত দিনের কথাগুলো তেমনি স্পষ্টতর হ'য়ে ভেসে আছে বটে! সেদিন, মুকুন্দরাণীর একনিষ্ঠ উৎসাহ ও উদ্দীপ্ত প্রেরণায় সূক্ষ্ম ওই তারের বুকে সুরের জাল বুন্‌তে সক্ষম হ'য়েছিলেন তিনি।

···সেদিনের সেই রিক্ত জীবনের একমাত্র শ্রোতা ও উৎসাহ-দাত্রী ছিল সে একাই! সকলের বিরক্তিপূর্ণ অপ্রীতিকর পরিবেশের মাঝে, বার বার মধুর কণ্ঠে দরদী-হৃদয়ের সুকোমল স্নেহ পরশে উৎসাহিত ক'রেছিল,—চমৎকার! আরও একটু বাজিয়ে শোনাও না লক্ষ্মীটি!

সেই মধুর কণ্ঠস্বর—হৃদয়ের সেই দরদী ভাষা, আজও যেন মনে হয় সজীব হ'য়ে পরিচালিত ক'রে চলেছে তাঁকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। নিঃসঙ্গে জীবনের একমাত্র পাথেয়, আঁধার

রাত্রির একমাত্র দীপ-শিখা—আজও সে র'য়েছে ঠিক তেমনি। তারই একনিষ্ঠ আগ্রহে, তাঁর জীবনের ছ'দিনের সেই সথ,—প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'র্লো এই সাধনার রূপমঞ্চে। মনে হ'য়েছিল—সে যেন মানবী নয়,—ঈশ্বর প্রেরিত দূত, শাপ-ভ্রষ্টা কোন ছলনাময়ী দেবী। নইলে, এমনি আত্মভোলা এক খেয়ালীর মনে, এমন নিবিড় ক'রে, প্রদীপ-শিখা, জ্বাল্‌তে সক্ষম হ'ল সে কেমন ক'রে ?

অথচ জাগ্রত যৌবনের জ্বলন্ত প্রভায়—সেই দেবীও হ'ল মানবী। রক্ত-মাংসের ক্ষুধায়—দেহ মন হ'ল শিহরিত। একান্ত আপন ক'রে পাওয়ার একটা গোপন তৃষায় উদ্বেলিত হ'ল হৃদয়। চোখ মেলে তাকালেন, তার মুখের দিকে ফিরে। কিন্তু একি, এ যে বিষাদ-প্রতিমা ! ম্লান, পাণ্ডুর সেই মুখের দিকে তাকিয়ে হৃদয়-তন্ত্রীখানা তাঁর ব্যথাতুর হ'য়ে উঠ্‌লো। গভীর একটা সহানুভূতিতে দেহ-মন আপ্লুত হ'য়ে গেল। বুক ভেদ ক'রে পুনরায় নেমে এলো জ্বালাময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ! কণ্ঠে ফুট্‌লো—অস্পষ্ট আধো ভাঙা একটু স্বর—আহা !...

এমন মধুর যার রূপ, এত উদার যার হৃদয়, যে সত্যকার দরদী, সে কি জীবনের মর্য্যাদা পাবে না কোনকালে ? ঝরা ফুলের মতই কি নীরবে যাবে শুকিয়ে ? হৃদয়তন্ত্রী টন্ টন্ ক'রে উঠ্‌লো। এক মনে বসে বসে ভাবেন অশোকনাথ, কত ব্যথাই না পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে ওর জীবনে। ওকে কি সুখী করা যায় না ? ওর মুখে কি হাসি ফোটানো যাবে না কোনদিন ?

সহানুভূতির কোমল পরশে হৃদয়টা দ্রবীভূত হ'য়ে ওঠে নিজেরই অজ্ঞাতে। বুঝ্‌তে পারেন না, যার ব্যথায় তিনি অহরহ ব্যথা অনুভব করেন—যার হৃদয়ের বেদনা বিদূরণের আশায় তিনি হারিয়ে ফেলেন নিজেরই অস্তিত্ব, তার পিছনেও লুকিয়ে আছে অবচেতন মনের সেই রুদ্ধ কামনা।

তিনি ভালবাস্‌লেন—মুকুন্দরাণীকে, একান্ত আপনার করে। তার হৃদয়-ব্যথা, মর্ম্ম দিয়ে উপলব্ধি ক'রে—তারের বুকে, ফুটিয়ে তুল্‌লেন বেদনার গভীর সেই সুর।...

* * * *

সহসা ছন্দপতন হ'লো। সাড়ম্বরে ঘরে তুলে আনা হ'লো যশোদাময়ীকে। হৃদয় মুষ্‌ড়ে পড়্‌লো—সাহারার অহরহ দগ্ধ বেদনাক্ষতে; অথচ মুখ ফুটে প্রতিবাদ করার সুযোগ খুঁজে পেলেন না কোনমতে।

মুকুন্দরাণীর কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। সে তেমনি পাশে এসে বসে। তেমনি উৎসাহ দেয়। বলে, বাজাও—বাজাও অশোকদা, আরও একটু বাজাও!

অশোকনাথ-যন্ত্র চালিতের মত যন্ত্র খানা তুলে নেন কোলে। তারে ভাসে সুর; কিন্তু সে হারিয়ে ফেলে অতীতের সেই রূপ, সেই মাধুর্য্যের মূর্চ্ছনা। তার পরিবর্ত্তে ভেসে চলে বক্ষভেদী হাহাকারের একটানা করুন আর্ত্তনাদ।

মুকুন্দরাণীর চোখের কোলে ভাসে জল। চকিতে মুছে নিয়ে বলে—তোমার কি হ'য়েছে বলতো? কিসের বেদনায় আজ জর্জ্জরিত তুমি?

সুরবাহারখানা নামিয়ে অশোকনাথ বলেন—ও কিছু নয়, মুকুন্দ—ব্যর্থতা—শুধু ব্যর্থতা! ম্লান একটু হেসে নিজেকে সংযত ক'রে নেওয়ার চেষ্টা করেন অশোকনাথ।

মুকুন্দরাণী সচকিত হ'য়ে ওঠে। নিজের অন্তরের হাহাকার, সহজ আচরণের অন্তরালে গোপন ক'র্‌তে চাইলেও, অশোকনাথের শুষ্ক ও ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির থাক্‌তে পারে না সে। তাই আত্মগোপনের চেষ্টায় ফিরে গেল তার শ্বশুরের আশ্রয়ে। আর

কিছু না হোক,—নোতুন-বৌকে নিয়ে অশোকনাথ সুখীও ত হ'তে পারবে ?

যাওয়ার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যায়, সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো মুকুন্দরাণী। চোখে তার জল। তবুও মুখে হাসি ফুটিয়ে ব'ল্‌লো—চলে যাচ্ছি, তাই একবার শেষ দেখা ক'র্‌তে এলাম অশোকদা' ! একবার শোনাবে তোমার সেই হৃদয় ভোলানো একটা সুর ?

বিস্মিত হ'লেন অশোকনাথ। জড়তা ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন ক'র্‌লেন, তার মানে ?

ম্লান একটু হাস্‌লো মুকুন্দরাণী। ব'ল্‌লো, ভুলে গেলে দাদা, মেয়েদের জীবনের সাধন-মন্দিরটার কথা ?

সাধন-মন্দির ? বিস্ময়ে ফেটে পড়্‌লেন অশোকনাথ।

তেমনি মৃদু অথচ মধুর হাসি হাস্‌লো মুকুন্দরাণী। ব'ল্‌লো—হ্যাঁ দাদা ! মেয়েদের ইহকাল, পরকাল—সবই যে তাদের শ্বশুরবাড়ী। সেখান ছাড়া ঠাঁই কি তাদের আর আছে এ জগতে ?

—কেন মুকুন্দ ? সেখানের সমস্ত আকর্ষণ ত তোমার শেষ হ'য়ে গেছে চিরদিনের মত !

একটু থেমে কি যেন গভীর ভাবে ভেবে নিয়ে ব'ল্‌লো মুকুন্দ, জানি, তবুও যেতে হবে ! বাঁধন ত তার ছিন্ন হয়নি।

কিন্তু আমি—শেষ ক'র্‌তে পার্‌লেন না অশোকনাথ।

—নোতুন-বৌ নিয়ে সুখী হও, এইটুকুই যে আমার শেষ কামনা অশোকদা' !

সুখ ! বুক ভেদ ক'রে নেমে এলো দীর্ঘশ্বাস। বিক্ষুব্ধ আশা-শূন্য জীবনের হয়ত এইটুকুই নীরব প্রতিবাদ। তবুও অশোকনাথ চেষ্টা করেন বক্তব্যটুকু শেষ ক'রে নেওয়ার। কিন্তু জিহ্বার অকারণ জড়তা তা অপূর্ণ রেখে গেল চিরদিনের মত। শুধু ব'ল্‌লেন—আমার

এ সুর কি আর কেউ তোমার মত দরদ দিয়ে শুন্‌বে কোনকালে ?

পুনরায় ম্লান একটু হাস্‌লো মুকুন্দরাণী। ব'ল্‌লো—সে এখনও নাবালিকা অশোকদা'! যখন আরও একটু বড় হ'বে, সেদিন স্বামীর সুখ দুঃখের কথা ভাব্‌তে শিখ্‌বে বই কি সে!

ছাই! কথাটা ব'লে গম্ভীর হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন অশোকনাথ।

ছিঃ, মন খারাপ ক'র্‌তে নেই, আমায় বিশ্বাস করো তুমি! মৃদু কণ্ঠে অনুযোগ ক'র্‌লো মুকুন্দরাণী। সেই সঙ্গে চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়্‌লো তার মুক্তোর মত কয়েক বিন্দু জল।

বিচলিত অশোকনাথ সহসা উন্মত্তের মত সবলে তা'কে আকর্ষণ ক'রে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এলেন। কয়েক সেকেণ্ড স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, সহসা মুখর হ'য়ে উঠ্‌লেন—একটা কথা আমায় তুমি আজ ব'লে যাও মুকুন্দ—

মুকুন্দরাণী নীরব।

অশোকনাথ আবেগভরা কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন, একটিবার তুমি বলো মুকুন্দ, সত্যই কি তুমি আমায় ভালবাসো না ?

ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠ্‌লো মুকুন্দরাণীব। কিন্তু কণ্ঠে তার ফুটলোনা কোন স্বর। শুধু গড়িয়ে পড়লো উষ্ণ কয়েক ফোটা অশ্রু।

আবেগ ও উত্তেজনা ভরা কণ্ঠে অশোকনাথ পুনরায় ব'ল্‌লেন, তাহ'লে তুমি এমন ক'রে নিষ্ঠুরের মত আমায় ছেড়ে কেন চলে যেতে চাও মুকুন্দ ?

মুকুন্দ উত্তর দিল না। তেমনি কাঁদতে লাগলো নীরবে। অন্তরটা মমতায় পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো অশোকনাথে। তিনি নীরবে তাকে বাঁধন মুক্ত ক'রে অনুনয় ভরা কণ্ঠে ব'ল্‌লেন, একটা কথারও কি উত্তর দেবে না মুকুন্দ? বলো মুকুন্দ বলো—নইলে আমি বাঁচবো কেমন ক'রে ?

অঁাচলে চোখের পাতাগুলো মুছে ধীর ও স্থির কণ্ঠে ব'ল্লো মুকুন্দরাণী, আমি যে বিধবা অশোকদা' !

আর একটি সেকেণ্ডও অপেক্ষা ক'র্লো না মুকুন্দরাণী। চ'লে গেল—নীরবে—নিঃশব্দে।

বেদনাহত অশোকনাথ অসহায়ের মত নিঃশব্দ রইলেন তার গমন-পথের দিকে তাকিয়ে।…

*　　　*　　　*　　　*

গ্রাম ছেড়ে চিরদিনের মত চলে গেল মুকুন্দরাণী। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকুও সে ত্যাগ ক'র্লো—সেই সুদূর পল্লীর একপ্রান্তে : নীরবে—একান্ত অবহেলিতের মত।…অথচ জীবনের চিরন্তনী কামনা তার ছিল—তাঁর জীবনের শান্তিময় অভিযান !

একটু থেমে নিজের মনে নিজেই হেসে উঠ্‌লেন অশোকনাথ। হঁ্যা—শান্তিময় অভিযানই বটে! বৈচিত্রহীন নিঃস্পন্দ জীবন—যার মাঝে প্রাণ পেলনা বিকাশের পথ—স্ফুরিত সৌরভ যার ঝরে গেল, একান্ত অবহেলায়। ঠিক যেমনটি ঝরে যায় শত বনফুলের সুমিষ্ট সৌরভ—জীবন্ত বাস্তবের আনাচে কানাচে। মানুষ তা' নিশ্চিন্ত মনেই দেখে, কিন্তু ভুলেও তার যথাযোগ্য মর্য্যাদা দেয়নি কোন দিন। সে অবসর তার ঠিক নেই তা নয়,—সে মর্য্যাদা দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ তারা করেনি। তাই অবহেলা ও উপহাসই হয় তাদের চলার পাথেয়।

মুকুন্দরাণীর অভিযোগ ছিল না, অভিমানও ছিল না, তবুও সে সেই নির্জ্জন পল্লীর পথ-প্রান্তে দুরারোগ্য ম্যালেরিয়ার কবলে—পলে পলে মৃত্যু বরণ ক'র্লো হাসি মুখেই! তার সেই নীরব সাধনার উপলক্ষ্য বস্তু যে কি—তা, আর কেউ না জানুক,—জান্‌তেন একা অশোকনাথ। শুধু জানা নয়—মর্ম্ম দিয়ে উপলব্ধি ক'রেছেন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্তে সেই নিষ্কাম প্রেমের প্রীতি ও ঔদার্য্য। তাই শত

অবহেলার মধ্যে বসবাস ক'রেও পথের দিশা তিনি হারাণ নি, শত দৈন্যের মধ্যেও সেই সাধনা তাঁর কেন্দ্রচ্যুত হয়নি। যে সুর সে একদিন উপযাচক হ'য়ে শুন্‌তে এসেছিল নীরবে, প্রাণের ব্যথার আবেগ ও মূর্চ্ছনায়, তার মর্য্যাদা হয়ত সেদিন দেওয়া সম্ভবপর হ'য়ে ওঠেনি, কিন্তু আজীবন সেই সাধনাই, তিনি ক'রে এলেন বাস্তব জীবনের চরম দৈন্য ও দারিদ্রের মধ্য দিয়ে। তাই, লোক-চোখে তিনি হেয় প্রতিপন্ন হ'লেও মৃত্যুঞ্জয়ী সেই সুর, চিরজয়ীর সম্মান লাভে নিশ্চিন্তে—বিরাজ ক'রেছে তাঁর হৃদয়-কন্দরে। তাই সে আলোর রূপ তিনি একাই দেখ্‌লেন, তার মাধুর্য্যও একাই উপভোগ ক'র্‌লেন, বাইরের কোন লোকই চিন্‌তে পার্‌লো না তার স্বরূপ। সে শক্তিও তাদের নেই, তবুও—মিথ্যা ঈর্ষার অন্তরালে, প্রতিটি পলে তারা জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে রটনা ও রচনা ক'রেছে তাদের অন্তরের রিক্ত বেদনার কাল্পনিক ছায়া-পুষ্ট কুহকিনীর শত শত কুৎসা ও রোমাঞ্চকর কাহিনী! তাই শুনে, সমব্যথী যারা, তারা পিষ্ট হৃদয়ের বেদন-রসে, সেগুলো সিক্ত ক'রে—নিজের চিন্তাধারার স্রোতে মিলিয়ে দেখেছে বারবার। আর যারা সে গণ্ডীর বহির্ভূত, তারা পরম তৃপ্তির সঙ্গে সেই আদিম বন্য স্পৃহাটা পূরণ ক'রে নিয়ে উপহাস্যের অট্টহাসির ফাঁকে, ব্যঙ্গ রসোপলব্ধির ক্ষণিক সুযোগ ও সুবিধা ক'রে নিয়েছে দিনের পর দিন।···হ্যাঁ, তাই হয় বটে! —মানুষ, ব্যথী হ'য়েও কখনও অপরের দুঃখে হাসে,—আবার কখনও সমবেদনা প্রকাশে বিগত জীবনের দুঃখ ও বেদনাটাকে নোতুন ক'রে উপলব্ধির পায় অবকাশ।—তাই জীবনটার রূপ, কখনও করুণার প্রতিমূর্ত্তি, কখনও বা বিকৃত রুচির প্রতিচ্ছায়া—নিতান্ত কঠোর ও নির্ম্মম।··

* * * *

অশোকনাথ সাধক। জীবনকে নীরবে ক'রেছেন উপভোগ। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি ক'রেছেন তাঁর মর্ম্ম বেদনা। তাই জাগে এত ভয়—এত

শঙ্কা !·· যদি সেই ছায়াটা প্রতিভাত হয় তার জীবনে ! তাঁর এত দিনের সাধনা যদি ব্যর্থ হ'য়ে যায় সেই দুর্ব্বলতার আবর্ত্তে—

না—না - না ! খাড়া হ'য়ে উঠে বসেন অশোকনাথ ! তাঁর হাতে গড়া মরমীপ্রকাশ, এতখানি কি দুর্ব্বলচিত্ত হ'তে পারে কোন দিন ?

না—না—না—প্রতিবাদের সুস্পষ্ট ধ্বনি ভেসে আসে তাঁর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে ! না - তা হ'তে পারে না। যে প্রেমের আলো তিনি দেখেছেন নিজের চোখে, যে আলোর স্বচ্ছ ধারায় অহর্নিশি স্নাত হ'লেন তিনি,—তার বিষের জ্বালায় পিষ্ট হ'তে পারে যৌবন, তার অনাস্বাদিত কামনা,—কিন্তু অন্তর - ? সে ত পেয়েছে তৃপ্তি !—যে অনাবিল আনন্দ তিনি উপভোগ ক'রে এলেন দিনের পর দিন—তার মূল্য দিতে পেরেছে কি বিরহ-মিলনে গাঁথা ওই দাম্পত্য জীবনের রূঢ় ইতিহাস ? না—না—না—চিন্তা স্রোত থম্‌কে দাঁড়ালো কয়েক মিনিট। নিজের মনকেই নিজে প্রশ্ন ক'র্‌লেন অশোকনাথ, তবে ভয় কি ? তবে এত ভাবনা কিসের ? কিসের আশঙ্কায় তিনি এত চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন বারবার ?

যদি কোন কুহকিণী নারীর মোহ-ডোরে সহসা আকৃষ্ট হয় মরমী-প্রকাশ ?···যদি সে হারিয়ে বসে তার নিজের অস্তিত্ব ? তাতে—ক্ষতি তাঁর হবে বইকি একটু ! কিন্তু—সে ত পুরুষ ! তাকে যে নিজের চোখে দেখ্‌তে হবে, উপলব্ধি ক'র্‌তে হবে—এ পৃথিবীর রূপ। রূঢ় এই বাস্তবের রস সিঞ্চণে—পরিপুষ্ট ক'রে তুল্‌তে হবে জীবনের সেই ধর্ম্ম। —সে পথে তাকে যে আজ অগ্রসর হ'তেই হবে !

চিন্তার ব্যাঘাত ঘট্‌লো পুনরায়। কয়েক মিনিট গভীর উত্তেজনায় ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত পদচারণা ক'র্‌লেন তিনি। ভাব্‌লেন, সবই ভাল। সবই সত্য। কিন্তু সে বোঝার ভার বহনের ক্ষমতা যদি তার না থাকে ? যদি তার সাধনা এই মাঝ পথেই যায় শেষ হ'য়ে ?

না—না—না—অকারণ আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠায় তাঁর শ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে আসে। নিজের মনে নিজেই চীৎকার ক'রে ওঠেন—না—না—সে দৃশ্য তিনি নীরবে নির্ব্বিকার চিত্তে বসে বসে দেখ্‌তে পার্‌বেন না কোনদিন। তার পূর্ব্বেই রুদ্ধ করে দিতে হ'বে সে পথ। পুনরায় খাড়া হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন অশোকনাথ। গুরু গম্ভীর স্বরে ডাক দিলেন, বৌমা!

কি বাবা? সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেন মৃণালিণী।

তোমরা মরমীপ্রকাশের বিয়ের কতদূর কি স্থির ক'র্‌লে মা? কণ্ঠে তাঁর চঞ্চল আবেগ।

আপনার নির্দ্দেশ মতই ত কাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চ'লেছে, বাবা!

একটু অধৈর্য্যের সুরে তিনি ব'লে উঠ্‌লেন—বড় দেরী ক'রে ফেল্‌ছো মা! তাড়াতাড়ি করো—আমি যে স্পষ্টই অনুভব ক'র্‌ছি, এ জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে—বাকী আর বেশী নেই—

—কেন? কি হ'য়েছে বাবা? শরীরটা কি আপনার খুবই খারাপ বোধ হ'চ্ছে?

বুকে হাতখানা রেখে ব'ল্‌লেন,—বাইরে থেকে, সহসা সে বিশ্বাস কারও জন্মাবে না—তা আমি ভাল ক'রেই বুঝি বৌ-মা, কিন্তু ভেতরটা যে আমার বহুদিনই অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে গেছে।—তাই, ভয় হয়, শেষ পর্য্যন্ত এ সব দেখে যাওয়ার অবসর, সত্যই এ জীবনে আসবে কিনা কে জানে?

ছিঃ বাবা! বাধা দিয়ে ওঠেন মৃণালিণী। বলেন, আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, একটু বিশ্রাম নেবেন চলুন তো!…

*　　*　　*　　*

দেখাশুনা শেষ হ'ল। সারা গ্রাম উজাড় ক'রে, শেষে, বংশীধর-বাবুর মেয়েকেই উপযুক্ত ব'লে স্থির ক'র্‌লেন অনাথবন্ধু। যশোদাময়ী

ও মৃণালিনী দেখে এসে ব'ল্‌লেন, সত্যিই মেয়েটি যেন লক্ষ্মীর প্রতিমা! এমন ঘর আলো করা বৌ নইলে কি সংসার মানায় কোনদিন?

কথাটা অশোকনাথের কাণেও গেল ভেসে। তিনি বসে বসে ভাবেন, তা বটে!

যশোদাময়ী বলেন, তোমার মুখটা অমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন? আমাদের কথা বুঝি তোমার বিশ্বাস হ'ল না?

মৃদু হাস্‌লেন অশোকনাথ। ব'ল্‌লেন—অবিশ্বাস নয় বড়-বৌ শুধু, ভাব্‌ছি—ঘর জোড়া আলো ত ঘরে তুলে নিয়ে আস্‌ছো কিন্তু আমার দাদুর অন্তর-রূপী বিশ্বকে, আলোকিত ক'র্‌তে পার্‌'বে ত?

বিরক্তি প্রকাশ করেন যশোদাময়ী, কি যে বলো? হিন্দুর ঘরের মেয়ে,—তাকে শেখাবে কে আপন, কে তার পর? বড় সন্দিগ্ধ মন তোমার। তাই বারবার ব'লেছিলাম, নিজেই এসো দেখে একটিবার।

পুনরায় মৃদু হাস্‌লেন অশোকনাথ। ব'ল্‌লেন—সে অবসর থাক্‌লেও সে ধৈর্য্য মানুষের থাকে না এ বয়সে। তোমাদের যদি পছন্দ হ'য়ে থাকে, আমার বলার ত কিছুই থাকে না—আর থাকা উচিত ও নয়। কারণ সংসার ত ক'র্‌বে তোমরা!

শুধু আমরা! ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন যশোদাময়ী।

মিছে কেন রাগ কর বড়-বৌ! সংসার বাঁধি বটে আমরা—কিন্তু সংসার করো তোমরা—একটু হেসে উঠ্‌লেন অশোকনাথ—বুঝ্‌লে, তোমরাই ত ঘরের আলো! আমরা শুধু যাত্রী, তোমরা কর্ণধার। তারে নিয়ে গিয়ে পৌছে দাও তোমরাই।···

* * * *

ঘটা ক'রে বিয়ে হ'ল মরমীপ্রকাশের। নোতুন-বৌ এলো ঘরে। অশোকনাথ স্থির দৃষ্টে তার চিবুকটা তুলে ধরে তাকালেন একটিবার।

তারপর ব'ল্‌লেন—দাদু, সত্যই ভাগ্যবান তুমি ভাই! তোমার দিদির কথাই ঠিক। ঘর আলো করার মতই দিদির আমার রূপ। কিন্তু—

সহসা হৃদয়ের আবেগ সংযত ক'রে নিলেন অশোকনাথ। ব'ল্‌লেন, কোথায় গো বড়-বৌ, আমার দিদিকে, তোমরা ঘরে তুলে নিয়ে যাও!

পাশে দাঁড়িয়ে, পড়্‌শী এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে খুশী মনে আলাপ ক'র্‌ছিলেন যশোদাময়ী। ব'ল্‌লেন—এবার কথাটা আমার বিশ্বাস হ'ল তো?

মৃদু হাস্‌লেন অশোকনাথ। ব'ল্‌লেন—তোমার কথা কি কোন দিন অবিশ্বাস ক'রেছি বড়বৌ? ওসব কথা এখন থাক্‌, দিদির আমার কচি মুখখানা লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠেছে, যাও—এখন বাকী কাজগুলো সেরে ফেলো তাড়াতাড়ি। একটু হেসে ব'ল্‌লেন অশোকনাথ, এ বুড়োর কথায় যেন অহেতুক রাগ ক'রো না অন্তর-পিসি! আরে—দাঁড়িয়ে রইলে যে? তোমরাও, যাও সকলে—

বৃদ্ধার নাম সুনয়না। যেমন আব্‌লুশ কাঠের মত কুচ্‌কুচে উজ্জ্বল তাঁর রং, তেমনি মেদ-বহুল স্থূল তাঁর দেহ। অশোকনাথের সমবয়সী না হ'লেও, খেলা-ঘরের সাথী ছিলেন একদিন। সেদিনও ওঁর প্রতাপ কারও চেয়ে কম কিছু ছিল না। সেই পাঁচ বছর বয়সে পাড়ার দশ বারো বছরের ছেলেদের ঘোল খাইয়ে ছেড়েছেন বারে বারে। শুধু কি তাই, পাকা গৃহিণী সেজে, ধুলো-বালির ভাত-চচ্চোড়িও খাইয়েছেন প্রচুর। বিনা বাক্য-ব্যয়ে ধমক্‌ দিয়েছেন—বেলা দুপুর হ'লো—বলি হ্যাঁগো, গিয়েছিলে কোন রাজ-দরবারে? কাজ আর কাজ—শুধুই কাজ, সে কি ফুরোবে না কোনদিন? ওপাশে শরীরটার হাল যে দিনের পর দিন কেমনতর হ'য়ে যাচ্ছে! দোষ আর দোবো কাকে বলো—শরীরের উপর যে অত্যাচার তোমরা করো—পর মুহূর্ত্তেই কিন্তু সহানুভূতি-মাখা স্বরে ব'ল্‌তেন—যাও—যাও—তাড়াতাড়ি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে এসো!

মুখর মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে পাড়ার বহু লোক হেসেছিলেন সেদিন। নিজেদের মধ্যে বলাবলিও ক'রেছিলেন—বয়সে, পাকা গৃহিণী যে ও হ'বে, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে এখন থেকে!

হায়রে বরাত! সে সুখ ওঁর জীবনে সহ্য হয়নি।—দশ বছর বয়সে বিধবা হ'য়ে সেই যে ভাইয়ের সংসারে ঢুকেছেন—তারই বোঝা ব'য়ে চলেছেন নির্ব্বিকার চিত্তে। তবে বয়োবৃদ্ধ পড়শীদের আশাটা একেবারে ব্যর্থ হয়নি; তাঁর দুরন্ত প্রতাপে ভায়ের সংসারটি শ্রীমণ্ডিতই হ'য়ে উঠেছে দিনের পর দিন!...

তিনি অশোকনাথের কথায় কান না দিয়েই ব'লে উঠ্লেন—তোমার কথায় কে যে রাগ ক'র্বে আর কে যে রাগ ক'র্বে না দাদা, তার লোক পাওয়াই ভার এ দুনিয়ায়। তবে যা বলেছো! আজকালকার মেয়ে—বয়স চোদ্দ-পনোরো হলেও, অজানা জায়গায় এসেছে সর্ব্বপ্রথম। তার উপর বিয়ের পরে মেয়েদের জীবনে একটা অকারণ আশা, আকাঙ্খা—শঙ্কাও একটু জাগে! তারই চঞ্চলতায় বিচলিত হওয়াটা—খুবই স্বাভাবিক! আহা, বেচারার মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে! দাদা আমার ঠিকই ব'লেছে। চলো বৌদি, চলো—ও ঘরে নাত্বৌকে সঙ্গে নিয়ে চলো!—ও ভাই মরমীপ্রকাশ, একটু পা চালিয়ে চলো, নইলে নাত্-বৌ আমাদের হাঁট্বে কেমন ক'রে?...

* * * *

আহারে বসেছেন অশোকনাথ। পাশে এসে বস্লেন যশোদাময়ী। ব'ল্লেন—এ আনন্দের দিনে এমন মুখ ভার ক'রে কি ভাব্ছো বলতো? তোমাকে কি ভগবান এতটুকু হাসির অবকাশও দেন নি? নাত-বৌ, মনের মত হ'য়েছে ত?

উত্তরে মৃদু হাস্লেন অশোকনাথ। ব'ল্লেন—অমন ঘর আলো করা বৌ আন্লে—পছন্দ হ'বে না? বলো কি বড়-বৌ?

তবে গম্ভীর হ'য়ে এত কি ভাবছো বলতো ?

—ভাবছি মেয়েটি বড় ভাল !

—তার মানে ?

—হাস্‌লেন অশোকনাথ। ব'ল্‌লেন, সব জিনিষেরই একটা মাত্রা থাকা উচিত বড়-বৌ। নইলে, রূপ তার খোলে না !

এমন অস্পষ্ট ধোঁয়াটে কথা সব বলো, যার মানে সারা জীবনেও খুঁজে পাবে না কেউ কোনদিন ! বিরক্তি প্রকাশ করেন যশোদাময়ী।

আরও একটু গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লেন অশোকনাথ। ব'ল্‌লেন—সেই দুঃখই র'য়ে গেল আজীবন বড়-বৌ ! শুধু তোমার নয় ঃ আমার জীবনেও !

— এত বাজে কথা ব'ক্‌তেও পারো তুমি ! নাও দুধটুকু খেয়ে নাও ! কৃত্রিম ক্রোধে উঠে দাঁড়ালেন যশোদাময়ী !

মুখে দুধের বাটিটা তুলে, এক চুমুক দিয়ে আন্‌মনে ব'লে উঠ্‌লেন—সেই কথাটাই ভাবছি ! ভাল—ভালই ; কিন্তু বেশী ভাল নয় ! দিদি আমার যদি একটু চঞ্চল হ'তো—ঘর আমার সত্যই আলো হ'য়ে থাক্‌তো বড়-বৌ···আলো হয়ে থাক্‌তো ! কিন্তু—

কি যে বাজে বকো—দু' চোক্ষে দেখ্‌তে পারিনে ! ঝাঁঝালো সুরে মাঝ পথে ঝাঁপিয়ে প'ড়লেন যশোদাময়ী।

—তা যা ব'লেছো ! যা হ'বার তো হ'য়েই গেল—এখন ওকেই মানিয়ে নিতে হ'বে ! কিন্তু বৌমা বা অনাথের বৌ পছন্দ হ'য়েছে ত ?

পছন্দ আবার কার হয়নি ! বৌমা ত সকলের চেয়ে বেশী খুশী হ'য়েছেন। বড় লোকের ঘরের মেয়ে হ'লেও সংসারের প্রতি তার একটা গভীর টান্ আছে। গুছিয়ে তোলার নেশাও আছে। সত্য কথা ব'ল্‌তে কি—যে, যে সব গুণ থাক্‌লে পাকা ঘরণী হওয়া যায়—সব গুণই আছে আমার নাত্-বৌ-এর। আমার বিশ্বাস কি জানো ?— নিশ্চয় ওরা সুখীই হ'বে দু'জনে !

সেইটাই ত সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি বড়-বৌ! ওরা দু'টিতে যেন সুখীই হয়! ওদের মুখে সব সময়ে যেন হাসি ফুটে থাকে!...

অকারণ—তবুও একটা দীর্ঘশ্বাস নেমে এলো। অশোকনাথ সে আবেগ চাপার বৃথাই চেষ্টা ক'র্‌লেন, কিন্তু পা'র্‌লেন না শেষ পর্য্যন্ত!...

* * * *

ফুলশয্যার রাত্রি। মীরা পালঙ্কের উপর বসে প্রতীক্ষা করে স্বামীর। পড়্‌শী দু'চারজন সমবয়সী, ফুলহারে সাজিয়ে দিয়েছে তার সর্ব্বাঙ্গ। তার সৌরভ্ ছড়িয়ে পড়েছে, সারা ঘরখানায়। মনটা তার কত আশা ও শঙ্কায় দুল্‌ছে বারবার! স্বামী তাকে কি ব'লে সম্ভাষণ ক'র্‌বেন? প্রত্যুত্তরে সে-ই বা কি উত্তর দেবে তার?

কয়েক মিনিটের ব্যবধান। মরমীপ্রকাশ ঘরে এসে ঢুক্‌লো। উৎসব ও লোকাচারের অত্যাচারে জর্জ্জরিত তার দেহ ও মন। এখন একটু নীরবে বিশ্রাম নিতে পার্‌লেই যেন সে জীবনে শান্তি ফিরে পায়!

ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়ালো মরমীপ্রকাশ। পিছন ফিরে দরজাটা বন্ধ ক'রে—একেবারে মীরার পাশে এসে বস্‌লো। উভয়েই তাকালো উভয়ের দিকে। কয়েক সেকেণ্ড নীরবে কেটে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে আকর্ষণ ক'র্‌লো মীরার কোমল হাত দু'খানা।

মীরা সরে এলো স্বামীর পাশে। মৃদু আকর্ষণে মরমীপ্রকাশ মীরাকে আরও একটু কাছে টেনে নিয়ে নেমে দাঁড়ালো মেঝের ওপরে। তারপর জানালার ধারে এগিয়ে চ'ল্‌লো ধীরে ধীরে। বাঁ হাতে পাল্লা দুটো খুলে দিয়ে অস্ফুটকণ্ঠে ব'ল্‌লো—জীবনের এই শুভক্ষণে, দাঁড়িয়ে আছি আমরা দু'টি প্রাণী। আশে-পাশে আর কেউ কোথাও নেই—কোন লাজ-লজ্জা নেই, এবার খুলে ফেলো তোমার মাথার ওই ঘোমটাটা।

মীরা সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকালো নীচের দিকে।

সেই অবকাশে মরমীপ্রকাশ খুলে দিল তার মাথার আবরণখানা। চিবুক তুলে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে দেখ্‌লো তার মুখের মাধুর্য্য। তারপর ব'ল্‌লো—দেয়ালে টাঙানো ওই যে বস্তুটিকে দেখ্‌ছো—ওর নাম জানো তুমি?

মীরা মাথা দোলায়—হ্যাঁ, সেতার।

মৃদু হাস্যে দোলা দিল তার চিবুকখানা। ব'ল্‌লো—হ্যা—ওই সেতারখানিই আমার জীবনের একান্ত প্রিয় বস্তু। একটু টেনে ব'ল্‌লো, জীবনের প্রধান অবলম্বন। তাই তোমায় জানিয়ে রাখ্‌ছি—ও বস্তুটার সম্মান রেখে চ'ল্‌বে সকল সময়।

মীরার অন্তরে প্রশ্ন জাগে, তার মানে? কিন্তু মুখে তার ভাষা ফোটে না। সে নিৰ্ব্বাক! তবু ক্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে স্বামীর মুখের দিকে থাকে তাকিয়ে।

কথাটা শেষ করে মরমীপ্রকাশ—আগে ওই যন্ত্র, তারপর তুমি। মানে—একটু হাস্‌লো মরমীপ্রকাশ—তোমার সতীন্‌। ও আমার অন্তরজগতের আলো—আর তুমি আমার বহির্বিশ্বের জ্বলন্ত প্রদীপ-শিখা! যখন পথ হারাবো—দেখাবে সেই পথ—পার্‌'বে না?

আগে ওই যন্ত্রটা—তারপর আমি! গুমরে উঠ্‌লো মীরার অন্তর। রক্ত মাংসে গড়া মানুষের চেয়েও ওই বস্তুটার মূল্য হ'ল বেশী! কান্নায় ভেঙে পড়্‌তে চাইলো মীরার অন্তর-জগৎ—তবে কি আমি ওর জীবনে, কেউ নই? শুধু প্রদীপের আলো—শুধু চলার পাথেয়—তার বেশী মূল্য সেকি জীবনে পাবে না এতটুকু?

স্বামীর হাসি-ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে সংযত ক'রে তোলার চেষ্টা করে মীরা।

আত্মবিভোর মরমীপ্রকাশ পুনরায় প্রশ্ন তোলে—কই, উত্তর ত দিলে না! পার্‌'বে না—দেখাতে সে পথ?

মীরার অন্তর সায় দেয় না—তবুও সে যন্ত্র চালিতের মত মাথাখানা হেলিয়ে উত্তর দেয়, হ্যাঁ!

মরমীপ্রকাশ আবেগে তাকে বুকের কাছে টেনে এনে বলে,—এইটুকুই ত আমি চাই, মীরা! তার বেশী—

ঠোঁটের পাতা দুটো মরমীপ্রকাশের সহসা রুদ্ধ হ'য়ে আসে। জীবনের দ্বার-প্রান্তে, শত শত প্রয়োজনীয় বস্তু ছড়িয়ে র'য়েছে চারিধারে, কিন্তু নাম তার কিছুতেই আসে না মনে—সবই যেন ঘুলিয়ে যায় বার বার। শুধু চোখের পাতায় ভেসে ওঠে বৃদ্ধ দাদু অশোকনাথের মুখখানা। ব'লে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে—হ্যাঁ, আর একটা কথা! আমার দাদুকে যত্ন ক'রবে মীরা। তিনি আমার গুরু, তোমারও নমস্য!

মীরা জিজ্ঞাসা করে, শুধু এইটুকু—আর কিছু নয়?

মরমীপ্রকাশ হাসে। বলে—এর বেশী হয়ত প্রয়োজন আছে এ জীবনে, কিন্তু সে সব ত আমি জানি না! তুমিই সেগুলো পূরণ ক'রে দেবে ও নেবে। কি বলো?…

* * * *

ক্লান্ত মরমীপ্রকাশ শয্যায় দেহটা এলিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুগভীর সুপ্তির কোলে হারিয়ে ফেলে নিজেকে। কিন্তু মীরার চোখের পাতায় নামে না ঘুমের পরশ। পরিবর্ত্তে, জাগে একটা গভীর কাল-ছায়া—যা তার নব-জাগ্রত যৌবনের চঞ্চলময়ী আশা ও আবেগকে রাহুগ্রস্থ চন্দ্রের মত ক্ষয়িষ্ণু ক'রে তোলে পলে পলে। বেদনায় হৃদয়টা তার বারবার টন্ টন্ ক'রে ওঠে—তা হ'লে সে, কেউ নয়—কেউ নয়? তবে কি তার জীবন-সাধনা এমনি নীরবে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে?

চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো ফোটা কয়েক অশ্রু। আবার সে শুকিয়েও গেল নীরবে। তার যাওয়া ও আসার এই যে নীরব ব্যথা, এর মূল্য হয়ত সে জীবনে পাবে না কোনকালে।

দূরে একটু দূরে…বাতি দানিটা তখনও জ্বল্‌ছিল তেমনি মিট্‌ মিট্‌ ক'রে, নিশ্চিন্ত…নীরবে! পাছে তার দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে যায় তাই তা'র বেদনার এই নীরব সাক্ষ্যটুকুও মুছে দিতে সে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। উঠে বস্‌লো নীরবে। সাম্‌নের আয়নায় তার সালঙ্কার মূর্ত্তিটা উঠ্‌লো ভেসে। নীরবে সে তাকালো একটিবার। নিজের এ রূপ বার বার নিজের কাছেই অপূর্ব্ব ব'লে মনে হ'ল তার। এই সাজ-সজ্জা, বেশ-বিন্যাস—কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই—নেই বিচ্যুতি, তবুও এই রূপের মোহ—অলঙ্কারের গাম্ভীর্য্য—সবই ব্যর্থ হ'য়ে গেল—সামান্য একটা তারের যন্ত্রের কাছে! তার চেয়েও মূল্যবান—নিঃস্পন্দ নীরব ওই সূক্ষ্ম তার, ওই একটুক্‌রো রং করা কাঠ আর শুক্‌নো—লাউয়ের খোলা! মূল্য তার এতই বেশী—

ইচ্ছা হ'লো—ভেঙে সেটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দেয় সে। এগিয়েও গেল কয়েক পা—কিন্তু একটা অদৃশ্য শক্তি যেন, সহসা তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো। তার সমস্ত শক্তি অপহরণ ক'রে একেবারে নিঃস্ব ও রিক্ত ক'রে দিয়ে গেল। কানে যেন ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো, "আমার জীবনের যত কিছু সঞ্চয়, যত কিছু আশা ও ভরসা, সবই সমাহিত হ'য়েছে ওই একটি বস্তুর মধ্যে। তাই জীবনে, ওর মত প্রিয় বস্তু আমার নেই। ওর মত তৃপ্তিও জীবনে আমায় দিতে পার্‌'বো না কেউ কোনদিন।"…

সচকিত হ'য়ে থম্‌কে দাঁড়ালো মীরা। অস্ফুট কণ্ঠে সে নিজের ছায়াকেই প্রশ্ন ক'রে বস্‌লো—আর আমি? আমি?…

উত্তর দিল না কেউ। শুধু চোখের তারায় ভেসে উঠ্‌লো—সুপ্ত স্বামীর মুখখানা। একটা অদম্য তৃপ্তির সুখ-পরশে—মুখখানা তার উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। হাতখানা তার—কি যেন অন্বেষণ ক'রে চলেছে নীরবে। চকিতে হৃদয় তার আলোড়িত হ'য়ে উঠ্‌লো। মনের কোণে

সহসা প্রশ্ন দেখা দিল, কিসের সন্ধানে ব্যাকুল হ'য়েছেন তার স্বামী?—সুতৃপ্ত হাসিভরা মুখে, কিসের একটা যেন গম্ভীর বেদনার ছায়া পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌লো নিমেষে। অভিমান-ভরা মনটা তার সেই মুহূর্ত্তেই দ্রবীভূত হ'য়ে ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। ভাব্‌লো, কি বোকা হ'য়েই না সে জন্ম নিয়েছে এ সংসারে! অভিমানের এই অন্ধ মাদকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের হাতেই নিজের চিতা রচনার অবকাশ কেন দিল আজ? এ কি তার দুর্ব্বলতা? না—না—না—উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ। পা দু'টো ছুটে চলে নিজেরই অজ্ঞাতে। পাশ বালিশটা বুকে চেপে বিমোহিত নয়নে চেয়ে দেখে, স্বামীর সুকোমল সুতৃপ্ত মুখচ্ছবিখানা। কেটে যায় বহুক্ষণ। তবুও সে ফিরিয়ে নিতে পারে না চোখের পাতাগুলো। একটা অজানা সহানুভূতির সুখ-পরশে হৃদয় তার ভরে যায় কানায় কানায়। ভুলে যায় নিজের অস্তিত্ব। আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে মুছে দেয় তার ঘর্ম-শিক্ত প্রশস্ত ললাট। হাত-পাখাখানা তুলে নিয়ে মৃদু বাতাস সুরু ক'র্‌লো সে নীরবে।...

* * * *

পাখীর গানে ভেঙে যায় মরমীপ্রকাশের সুখ-নিদ্রা। দূরে শোনা যায় "প্রভাতী" সুরের মৃদু-মধুর মূর্চ্ছনা! শয্যার উপরে উঠে বসলো মরমীপ্রকাশ।

পাশে নিদ্রাভিভূতা মীরা। মুখে তার গভীর তৃপ্তির ছায়া। বারেক ফিরে তাকালো মরমীপ্রকাশ। অন্তরটা তার দুলে উঠ্‌লো চকিতে। মনে হ'লো যেন সদ্য ফোটা প্রভাতের ফুল। আবেগে চিবুক-খানা তুলে অতৃপ্ত নয়নে তাকিয়ে দেখ্‌লো সেইরূপ। সাদরে সরিয়ে দিল, কপালে উড়ে আসা বিক্ষিপ্ত ভ্রমর-কালো চুল। সহানুভূতির গভীর স্নেহ-পরশে মুছে দিল তারই পাশে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম। মৃদু কণ্ঠে ডাক্‌লো—মীরা!

সচকিত হ'য়ে উঠে বস্‌লো মীরা। অনাবৃত দেহের প্রতিটি অংশ চকিতে আবৃত ক'রে, সলজ্জ নয়নে তাকিয়ে দেখ্‌লো একটিবার স্বামীর মুখখানা। পরমুহূর্ত্তে নামিয়ে নিল চোখের তারা দু'টো।

মরমীপ্রকাশ মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—ভয় পেলে, মীরা?

মীরা উত্তর দিল না। চোখ মেলে পুনরায় তাকালো স্বামীর মুখের দিকে ফিরে। সেই সঙ্গে মাথাও দোলালো সে মৃদু।

চিবুক তুলে ধরে সহাস্যে ব'ল্‌লো, মরমীপ্রকাশ। বাজাই—একটুখানি শোন!

সেতারটা তুলে নিয়ে মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—ওই যে সুর ভেসে আস্‌ছে—কে বাজাচ্ছে জানো?

সপ্রতিভ হয়ে উত্তর দিল মীরা; দাদু!

বড় সুন্দর বাজান উনি! ওঁর সুরে, অন্তর, কথা কয় বুঝ্‌লে!

মীরা উত্তর দেয় না। মরমীপ্রকাশ ডুবে যায় সুর, তাল ও লয়ের মাঝে। শেষ যখন হল, তখন আলোতে ভরে গেছে সারা ঘর. কিন্তু নেই মীরা। কখন সে চলে গেছে কে জানে?…

জীবনে প্রথম ব্যথা পেল মরমীপ্রকাশ। এমন হৃদয় নিঙ্‌ড়ানো সুর—তবুও হৃদয় তার জয় করা গেল না! বসে এতটুকু শোনার ধৈর্য্য তার হ'ল না? বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে সেতারখানা নামিয়ে রাখ্‌লো মরমীপ্রকাশ।

চা! কোমল মৃদু কণ্ঠের সুর ভেসে উঠ্‌লো পর মুহূর্ত্তে।

মুখে হাসি টেনে হৃদয়ের বিরক্তিটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা ক'র্‌লো মরমীপ্রকাশ। কাপটা হাত থেকে তুলে নিয়ে তাকালো মীরার মুখের দিকে ফিরে। ব'ল্‌লো—ভাল লাগ্‌লো না বুঝি!

মীরা সহসা উত্তর খুঁজে পেল না। সত্যই তার এ ঘর থেকে চলে যাওয়ার এতটুকুও বাসনা ছিল না, বরং আকর্ষণটাকে কাটিয়ে তোলার জন্য নিজের সঙ্গে তাকে লড়াই ক'র্‌তে হ'য়েছে বহুক্ষণ। উষার আলো;

ক্রমশঃই স্পষ্টতর হ'য়ে কর্ত্তব্য-জ্ঞানটাকে পীড়ন ক'র্‌লো প্রতিটি মুহূর্ত্তে! অথচ তখনও স্বামী সমাহিত সুর ও লয়ের আবর্ত্তে। এসময়ে তাঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে কিনা স্থির ক'র্‌তে না পেরে—ধীরে ধীরে বেরিয়ে সে গিয়েছিল নিঃশব্দে—কিন্তু তখন এই জবাবদিহির প্রশ্নটা স্মরণ হয়নি। তাই লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে অপরাধিনীর মত মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে র'লো তেমনি নীরবে।...

মরমীপ্রকাশ উত্তর পেল না তার প্রশ্নের। কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌লো, অপরাধ শুধু মীরার নয়—অপরাধ তার নিজেরও অনেকখানি। সংসার যে জগতের রূঢ় বাস্তবক্ষেত্র! সেখানে হয়ত ক্ষমা নেই কারও। তাই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে মুখে মৃদু হাসি ফোটানোর চেষ্টা ক'রে ব'ল্‌লো—বাঃ—চা-টা ত চমৎকার হ'য়েছে!

চকিতে মীরার মুখখানা লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। ফিরে পেল তার নিজস্ব সত্তা। সলজ্জ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে বারেক তাকিয়ে ফিরে গেল তার নিজের কাজে।...

* * * *

মীরা চলে গেল। কিন্তু আহারে রুচি যেন মিলিয়ে গেল সেই মুহূর্ত্তে। মরমীপ্রকাশ সেতারখানা নামিয়ে রেখে ফিরে এলো দাদুর ঘরে।

অশোকনাথ খুশী মনে ব'লে উঠ্‌লেন, বসো, ভাই বসো। একটু যোগিয়ার তান শোনাও তো ভাই! বহুদিন শোনা হয়নি তোমার হাতের সুর। শোনাও—

মরমীপ্রকাশের ব্যথাহত মনটা তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে ওঠেনি। অবহেলা ও উপেক্ষার বেদনা, জীবনে এই প্রথম অনুভব ক'র্‌লো সে। হৃদয়টা তখনও টন্ টন্ ক'র্‌ছে যাতনায়। তবুও দাদুর ডাকে নিজেকে সচেতন ক'রে তোলার চেষ্টা ক'র্‌লো একটিবার। সযত্নে সেতারটা তুলে নিয়ে দিল সুরের ঝঙ্কার।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। সহসা ব'লে উঠ্‌লেন অশোকনাথ, সুরে তোমার ঠিক মেজাজ্ আস্‌ছে না মরমীপ্রকাশ! বোধ হয় মনটা তোমার ভাল নেই। একটু থেমে সহাস্তে ব'ল্‌লেন, না—সত্যই নাত-বৌ তোমার মন হরণ ক'রে নিয়েছে ভাই!

সচেতন হ'য়ে উঠ্‌লো মরমীপ্রকাশ। সুরটা ঠিক মত বেঁধে নিয়ে সলজ্জ একটু হাসি হেসে সুরু ক'র্‌লো পুনরায়।

অশোকনাথ নীরব হয়ে প'ড়্‌লেন কিন্তু অনুভব ক'র্‌লেন, এটা ভুল নয়, মোহও নয়, শিল্পীর আশা-ভঙ্গের নির্ম্মম বেদনা। তাই—নিজের অজ্ঞাতে সে হারিয়ে ফেলে সুর ও লয়ের সাধনা।

সহসা চুড়ির ঠুং ঠুং মৃদু গুঞ্জন এলো ভেসে। ফিরে তাকালেন অশোকনাথ। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মীরা। হাসিমুখে ব'লে উঠ্‌লেন অশোকনাথ, এসো, দিদি এসো—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

খাবার এনেছি দাদু!

বেশ ক'রেছো, সহাস্তে ব'ল্‌লেন—আমার ঘরে যে আরও একজন অতিথি বসে র'য়েছে দিদি—তার জন্যেও যে কিছু চাই!

না, না—বাধা দিয়ে উঠ্‌লো মরমীপ্রকাশ। এইমাত্র খেয়ে আস্‌ছি দাদু!

তা হোক, তুমি নিয়ে এসো ত দিদি! কথার ফাঁকে চকিতে উভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝ্‌তে পারেন অশোকনাথ, সুর-ভঙ্গ হ'য়েছে কোথায়! নিঃশব্দে বসে বসে ভাবেন, যেখানে উৎপত্তি জীবনের আদি রস, যার প্রেরণায় মানুষ হ'ল মানুষ, হ'ল সচল ও সজীব—সেই উৎস-পথ রুদ্ধ হ'য়ে গেছে অকারণে। তাই, ফোটা ফুল শুকিয়ে গেছে অসময়ে। ভাদরের ভরা গাঙেও নেমেছে নোতুন চর। আজ সেই ভারের বোঝাই মুক্ত ক'র্‌তে হবে তাঁকে।...

ফিরে এলো মীরা।

অশোকনাথ ব'ল্লেন—বুড়ো হ'য়েছি কিনা—তোমার দিদির আর আমাকে পছন্দ হয়না—এমন কি কাছেও আসে না সহসা! তাই ব'ল্‌ছি, তুমি একটু পাশে এসে বসো ত দিদি—অতীতের স্মৃতিটা একবার ঝালিয়ে নিই! মরমীপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে ব'ল্লেন—ওগুলো মুখে চট্‌পট্ দিয়ে নাও তো ভাই! তুমি কিন্তু—বড় বোকা মেয়ে দিদি। মীরার দিকে ফিরে ব'ল্লেন—গরম চা এক কাপ নিয়ে এলে না আমার দাদুর জন্যে? যাও চট্‌পট্। আর আমার জন্যে গরম জল ও পাতিলেবু একটা নিয়ে আসবে।

বিস্ময় বোধ করে মীরা। অশোকনাথ সহাস্যে বলেন—ও সব বিলিতি খানা ধাতে এখনও আমার সহ্য হয় না দিদি!

মীরা চলে গেলে পর অশোকনাথ হেসে উঠ্‌লেন। ব'ল্লেন—মুখ ভার ক'রে বসে রইলে যে—মেজাজটা বুঝি এখনও ঠাণ্ডা হয়নি? মুখে দিয়ে—চট্ পট্ স্থরটা ধরো একবার।

মরমীপ্রকাশ নীরবে আদেশ পালন করে। মীরা চা নিয়ে ফিরে আসে। বলে—চুমুক দিয়ে নাও, নইলে আবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। দাদু, জল আর নেবু এখুনি কি নিয়ে আস্‌বো?

মৃদু হাসেন অশোকনাথ। বলেন, আন্‌বে বইকি দিদি। কিন্তু একটা কথা—এখানে ব'সে আমায় তৈরী ক'রে দিতে হবে—বুঝ্‌লে? মরমীপ্রকাশকে ব'ল্লেন—নাও, বেলা হ'ল। ওগুলো মুখে দিয়ে স্থরু করো এবার।

মীরা ফিরে আসে। ইচ্ছে ক'রেই ধীরে সুস্থে বসে বসে, লেবুর জল তৈরী করে। নারীর সহজাত ধর্ম্ম ও সংস্কারের তাগিদে প্রভাতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে অপরাধ সে ক'রেছিল—এখন সেই অন্যায়ের মাশুল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই এসেছিল সে। তাই মরমীপ্রকাশের সুর শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নানা কাজের অছিলায় ঘরের মধ্যে বসে রইলো সে নীরবে।

খুশী হ'লেন অশোকনাথ। মরমীপ্রকাশও প্রাণ ঢেলে বাজালো সেতারখানা। কিন্তু যার সাহচর্য্যে প্রাণের তন্ত্রীখানা স্পন্দিত ও মুখরিত হ'য়ে উঠেছিল নিজের অজ্ঞাতেই, সেই কক্ষ ত্যাগ ক'রে চলে গেল চোখা-চোখি হওয়ার পূর্ব্বে। প্রাণটা একটা অজানা ব্যথায় টন্ টন্ ক'রে উঠ্‌লো মরমীপ্রকাশের। যাকে এতটুকু দেখার নেশায় মনটা উদ্বেলিত হয়, যার সঙ্গে নীরবে দুটো কথা কওয়ার আশায় প্রাণটা মুখরিত হ'য়ে ওঠে, সেই বা সহসা ধরা দেয় না কেন? আবার যখন ধরা যায় তখনই বা ভাষা নিঃস্ব হ'য়ে পড়ে কেন? এই যে আকুলতা—এই যে ব্যাকুলতা—এর মধ্যে কি সত্যই কোনদিন ধরা দেবে না মায়া? তবে কি তার এই হৃদয়-জোড়া ভালবাসা, এমনি মরুতৃষ্ণার মত শুধুই মরীচিকার সৃষ্টি ক'র্‌বে, কূল পাবে না কোনদিন?

· মরমীপ্রকাশ! অশোকনাথের স্নেহমাখা মৃদু কণ্ঠস্বর উঠ্‌লো ভেসে! সহসা এমন আন্‌মনা হ'য়ে প'ড়্‌লে কেন ভাই?

সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লে, না, এমনি!

মৃদু হাসেন অশোকনাথ। বলেন- জীবনের রূপই এই ভাই! কিন্তু দেখো—অভিমানের বোঝায় যেন চলার পথটা পিচ্ছিল হ'য়ে না পড়ে!

তার মানে?

হাসলেন অশোকনাথ। ব'ল্‌লেন—বুড়ো হ'য়েছি, দেখেওছি অনেক—তাই ছায়া দেখেই টের পাই। কথাটা ব'লেই বুঝ্‌তে পার্‌লেন অশোকনাথ, এতখানি মুখর হওয়া তাঁর উচিত হয়নি আজ। তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ব'ল্‌লেন—ও কিছু নয় ভাই ও কিছু না! একটু টেনে হেসে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন—সম্পর্কটা আমাদের তামাসার—তাই একটু ঠাট্টা ক'র্‌লাম মাত্র!...

* * * *

মীরার বয়স সবে চোদ্দ পার হ'লেও, তার এই নারী-জীবনটুকুর অভিজ্ঞতা কারও চেয়ে কিছু কম নয়। এই বয়সেই সে পাকা গৃহিনা। যদিও এ বয়সটা তার স্বপ্ন দেখার বয়স, তবুও বাস্তবমুখী তার প্রতিভা বাস্তবকেই আপন ক'র্‌তে ব্যস্ত সকল সময়। তাই নেশায় বিভোর হ'য়ে থাকার চেয়ে, কেমন ক'রে এই জীবনটাকে রাঙিয়ে তোলা যায়, চির সজীবতার স্পন্দনে কিরূপে স্পন্দিত করা যায়—সেই চিন্তায় থাকে সে মগ্ন।

স্বামীকে পছন্দ তার হয়নি তা নয়—বরং ভালই লেগেছে সকল কিছুর চেয়েও একটু বেশী। কারণ তিনি শুধু রূপবান নন, গুণীও রীতি মত। এই স্বল্প বয়সে যার এত নাম-যশ, ভবিষ্যতে তিনি যে একজন প্রথিতযশা ব্যক্তি হবেন, সে বিষয়ে কি সন্দেহের অবকাশ থাক্‌তে পারে কোনদিন?

এ সংসারে সে নবাগতা। আদর আপ্যায়ণ ও আতিশয্যের ফাঁকে, বাইরের রূপটা মাঝে মাঝে ভেসে আস্‌ছে তার চোখে—ঠিক একটা উজ্জ্বল আলোকের মত। হয়ত অস্পষ্ট, তবুও ত বোঝা যায়—এ আদর শুধু সুখের নয়—এর সঙ্গে আন্তরিকতার পরশও আছে, বিশেষ ক'রে—অশোকনাথের।

স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট। তার ভালবাসায় মলিনতা নেই, কৃত্রিমতাও নেই। সে স্ফটিক জলের মতই স্বচ্ছ। তার ওপর তিনি হৃদয়-খোলা মানুষ। যার কাছে লুকোচুরির কোন বালাই নেই,—প্রাণের প্রতিটি কথা যিনি প্রকাশ করেন অকপটে, সেই প্রকৃতির মানুষ তিনি। তাঁকে ভাল না বেসে কি থাকা যায় কোনদিন?

* * * * *

মীরা মরেছে। নিজেকে হারিয়েছে—ছাদ্‌নাতলার প্রথম আঁখি বিনিময়ের সেই শুভ মুহূর্ত্তে। মনে মনে নিজেকে সৌভাগ্যবতী ব'লে

গর্ব্বও সে ক'রেছে সকলের অলক্ষ্যে। সে আশা তার ব্যর্থ হয়নি,-কিন্তু ফুল-শয্যার রাতে যখন সে সত্যকার পেল স্বামীর হৃদয়ের পরিচয়, সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তেই আচম্বিতে তার মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলো যে আঘাত পেল, তার জের সে কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লো না সহজে। হয়ত পার্‌বেও না কোনদিন! যদিও মনকে সে বুঝিয়েছে,—একটা যন্ত্রের প্রতি ভালবাসা কি রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের চেয়েও বেশী আকর্ষণীয় হ'তে পারে কোনদিন? ওটা ত মুখের কথা! তার জীবন সাধনার পাথেয়···তবুও অন্তর পায়নি—তৃপ্তি! বার বার ঘুরে ফিরে, সেই একই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়—"জীবনের সব কিছুর প্রথমে এই সেতারখানা—তারপর তুমি,—এই ঘর·· এই সংসার···"

তার চেয়েও বড়! ওই শুক্‌নো লাউয়ের খোলা, আর তারে গড়া ওই নিষ্প্রাণ যন্ত্রটা! বড়—হ্যাঁ বড়। তার চেয়েও বড়—তার চেয়েও প্রিয়—

মনটা প্রতিটি মুহূর্ত্তে একটা সুতীব্র অভিমানের রূঢ় কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয় মীরার। বড়, তার চেয়েও বড়—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ সব চেয়ে বড় ও প্রিয়, নিস্পন্দ-নিথর ওই যন্ত্রখানা—

তাই মীরা নিজেকে ধরা দিয়েও একেবারে নিঃস্ব ক'রে বিলিয়ে দিতে পার্‌লো না সহজে। "জীবনের বাকী যেটুকু পাথেয়, সেটুকুই সে রাঙিয়ে তু'ল্‌বে, এর বেশী অধিকার তার নেই।"·· তাই একান্ত নিজস্ব আপনার বস্তুকেও সে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে—আর নিভৃতে গোপন করে তার হৃদয়-বেদনা!···

ভয়, হ্যাঁ ভয়—তার আছে বৈকি! সে বস্তুটি তার নিজের চিত্তেরই দুর্ব্বলতা। তাই, সকল সময়ে থাকে সে সজাগ। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ক'রে চলে সে অভিনয়। যদিও সে বোঝে এবং মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধিও ক'রে, সরল ও আত্মভোলা স্বামীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন সে নিজেই, তবুও তাঁর ডাকে ঠিক প্রাণ খুলে নিজের সমস্ত স্বত্বাকে বিলিয়ে সে দিতে

পারে না—কোথায় যেন বাধে। মীরা নিজেই উপলব্ধি করে, সেই শূন্যতার ব্যবধান একটা পাষাণ প্রাচীরের মত স্থায়ী অন্তরায়ের সৃষ্টি ক'র্ছে তাদের নিবিড় এই মিলনের পথে। বুক ভেঙে নেমে এলো চাপা দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু উপায় কি? তাই নিজের সঙ্গেই চলে তার অহরহ অন্তর-দ্বন্দ্ব। তবুও—জড় সেই বোঝাটার ভার সে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না কোনমতে। হায়রে দুর্ব্বল মন। এমনই সূক্ষ্ম তার গ্রন্থী, একবার সে বাধন ছিন্ন হ'লে জোড়া আর তাকে দেওয়া যায় না কোনমতে।···

নিজেকে ভোলার আশায় সে সারাদিন তাই সংসারের কাজে থাকে মেতে। যেন এই নেশাটাই তার ব্যক্তিগত জীবনের সর্ব্বস্ব সাধনা। এর বেশী সে চেনে না, জানেও না। তার বেশী কামনা হয়ত হৃদয়ে ছিল, কিন্তু তা' নিঃশেষ হ'য়ে গেছে তার নিজেরই অজ্ঞাতে···

* * * * *

মীরার আচরণে সকলেই বিস্ময়াভিভূত হ'ল। যার বাবার অগাধ ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্য, যে আবাল্য বিলাস-ব্যসনের মধ্যে হ'য়েছে মানুষ, তার জীবনে এমন কাজের নেশা, কেমন ক'রে যে দানা বাঁধ্‌লো—কে জানে?

যশোদাময়ী বলেন, অমন মেয়ে আর দেখা যায় না! যেমন রূপ, তেমনি গুণ। যেন রূপে-গুণে দিদি আমার লক্ষ্মী-সরস্বতী!

প্রতিবেশীরা সায় দেন। বলেন সত্যই অমন ভাল মেয়ে বড় একটা চোখে পড়ে না আজকাল। বড় লোকের মেয়ে—তার ওপর এমন রূপ, তবুও নেই এতটুকু অহঙ্কার—এতটুকু অভিমান। সত্য কথা ব'ল্‌তে কি দিদি, যেমন তোমার নাতি, ঠিক তেমনি হ'য়েছে তোমার নাত-বৌ। যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণ।

কথাগুলো শুনে খুশী হ'লেন যশোদাময়ী। তাঁর উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই মৃণালিনী খুশীভরা কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন—এ সবই ত আপনাদের আশীর্ব্বাদ দিদি!···

অনাথবন্ধুর মত অর্থ-ধ্যানমগ্ন উদাসী সংসারীও মুগ্ধ হ'লেন মীরার আচার-ব্যবহারে। ব'ল্‌লেন—সত্যই মা যেন সংসারে আমার জীবন্ত লক্ষ্মী প্রতিমা। দেখ্‌ছো না—এই কটা দিনের মধ্যে সুনিপুণ হাতে মা আমার সংসারের শ্রী কেমন ফুটিয়ে তুলেছে !...

সত্যই মীরার একনিষ্ঠ সেবায় সংসারের সকলেই আত্মতৃপ্তি বোধ ক'রেছেন, এমন কি অশোকনাথও। কিন্তু মরমীপ্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিপূর্ণভাবে খুশী হ'তে পার্‌লেন না তিনি। বুঝ্‌লেন বিরাট ফাঁক র'য়ে গেছে কোথাও। তাই, ব'সে ব'সে ভাবেন—তবে কি শুধু উপচার ও আড়ম্বরই হ'ল সার—প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না কোনদিন ! তবে কি তাঁর মনের অহেতুক শঙ্কাটাই পরিপূর্ণতা লাভে এই অমূল্য জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে যাবে চিরদিনের মত ! বার বার ঘুরে ফিরে মরমীপ্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য ক'রে চলেন এক মনে। খতিয়ে দেখেন, কই নব জীবনের আকর্ষণ ও মাদকতার ছায়াটা ত পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠেনি পূর্ণতিররূপে। তবে কি তাঁর আশঙ্কাটাই সত্য ! তবে কি এটা কেবল নিমন্ত্রণবাড়ীর মর্য্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা ! নিমন্ত্রিতেরা শুধু এলো আর গেলো। ভুরিভোজে তৃপ্তি লাভ ক'রে গৃহস্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'ল—বাহ্যিক আড়ম্বরের স্তুতিগান ক'রলো, ... এটাও কি ঠিক তবে তাই ! সংসারের এই যে উচ্ছ্বাস...প্রতিবেশীর এই যে প্রশংসা মুখরতা—এর কি কোন মূল্য নেই ! সবই কি অকারণ বাহ্যিক চঞ্চলতার জৌলস !...

নিজের ঘরে ফিরে এসে বসে বসে ভাবেন অশোকনাথ—যে রিক্ততার তিক্ত স্বাদ তিনি সারা জীবন ধ'রে পান ক'রে এসেছেন—যার বিষ-ক্রিয়ায় হৃদয়টা হাহাকার ক'রেছে অনিবার—যার অসহনীয় বেদনায় অতিষ্ঠ হ'য়ে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত মিথ্যাই ক'রেছেন ছোটা-ছুটি—কুহকিনী শান্তির প্রলোভনে অলীক কল্পনার জাল বিস্তারে

হৃদয়টাকে রাঙিয়ে তুলতে চেষ্টা ক'রেছেন বার বার। সেই ব্যর্থতার ক্ষতে এই শিশু জীবনটাও কি তবে পিষ্ট হবে চিরদিনের মত! যে আশা ও আকাঙ্খায় তিনি নোতুন মন্দির গ'ড়ে তুল্‌তে চেয়েছিলেন—যে জ্বলন্ত হাহাকারের বেদনার ছায়াটা মুছ্‌তে চেষ্টা ক'রেছিলেন, একটি ফুটন্ত জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে-সে চেষ্টাটুকুও কি তবে তাঁর ব্যর্থ হ'য়ে গেল!...

* * * *

অশোকনাথ আজ সত্যই অসহায়, সত্যই নিরুপায়—নীরব দর্শকমাত্র। তবুও নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত না ক'রে নিশ্চেষ্ট থাক্‌তে পারেন না তিনি। তাই দিন যত যায়—স্পষ্টই উপলব্ধি করেন—দু'টী জীবন, আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল পরস্পরের কাছে—সৃষ্টি ক'র্‌তে চেয়েছিল জীবন-বেদ। কিন্তু হায়—চিরদিনের মতই হয়ত সে বস্তু অসমাপ্তই র'য়ে যাবে। অথচ, লৌকিক বাঁধনটাই দৃঢ়তর হবে চিরদিনের মত। তার বোঝাটা হবে পথের কণ্টক, তবুও ঠোঁটের পাতায় হাসি ফুটিয়ে তাদের অভিনয় ক'র্‌তে হবে, খেল্‌তেও হবে আপন আপন খেলা। পাঁচ জনে তা দেখে খুশী হবে—ভাব্‌বে, এদের মত সুখী আর দুটি আছে কি এ জগতে! কিন্তু যার জীবন হুতাশনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, যে এই রিক্ত পথের যাত্রী, সেই বুঝ্‌বে এর বেদনা কত গভীর—কত দহন জ্বালা বুকে নিয়ে নিঃশব্দে যাত্রা ক'রেছে এরা। ওদের মুখের ওই ঠুন্‌কো হাসিটা সব কিছু নয়,—ওদের কপালের কুঞ্চিত রেখা,—চোখের কোলের কালোছায়া—আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস যা কেউ চেয়েও দেখে না, বুঝেও বুঝ্‌তে চেষ্টা করে না। সেই ছায়ার সুগভীর ইঙ্গিতটা কত স্পষ্ট ও উজ্জ্বলতর হ'য়ে ফুটে আছে ওদের জীবন প্রান্ত-ভাগে। প্রতিটি মুহূর্ত্তে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—তাদের রিক্ত জীবনের ম্লান, বুভুক্ষু হৃদয়ের অনাস্বাদিত সুখ-নেশার দীর্ণ হাহাকার! বুক ভেদ

ক'রে অশোকনাথের নেমে এলো গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস। নিজের মনে নিজেই ব'লে উঠ্‌লেন, হ্যাঁ—সত্যই এরা হারিয়েছে এদের জীবনের যত কিছু সুখ-সম্পদ : খুয়িয়েছে জীবনের আশা ও ভরসা—শুধু বাঁধনটাই হ'য়েছে দৃঢ়। অহরহ তারই বোঝা ব'য়ে চলেছে ওরা এগিয়ে। তাই ওরা হারিয়েছে জীবনের সুর ও ছন্দ। অকারণে জেগেছে জীবনের প্রতি একটা ঘোরতর বিতৃষ্ণা। সংসারটা হ'ল তাই খেলাঘর : কর্ত্তব্যটা হল চলার পথের সেতু। তারই আবর্ত্তে তারা ঘুরে ফিরে বেড়ালো শুধু নিজেকে ভুলে থাকার উদ্দেশ্যে।

তাই—হ্যাঁ—তাই, মরমীপ্রকাশ—ভরা যৌবনের খেয়া পথে সহসা বিভ্রান্ত হ'য়ে ফিরে এসেছে তার সাধনা-মন্দিরে। ভেঙে গেছে তার জীবনের সুর ; মুছে গেছে জীবনের চঞ্চল সে সুখ-স্পন্দন। তাই স্থবির নিস্পন্দের মত জীবনে তার একমাত্র অবলম্বন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ওই সেতারখানা!

...আর মীরা—সেও ভুলে গেছে জীবনের সহজাত উচ্ছ্বাস—মুছে গেছে তার চঞ্চল-যৌবনের মুখর দীপ্তিচ্ছটা। সেও যেন নিজেকে ভুল্‌তে চায় কর্ম্মের আবর্ত্তে। তাই সংসারের কাজ হ'ল তার জীবনের একমাত্র আকর্ষণ। ঘুরে ফিরে বেড়ায় সে বৃদ্ধ দাদুর এই নিঝুমপুরীর আনাচে-কানাচে।

অশোকনাথ সুরবাহারখানা নামিয়ে রেখে সস্নেহে কৌতুক ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—তোমার কিছু যেন, তোমাকে ফাঁকি দিয়ে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে—না দিদি ?

ম্লান একটু হাসে মীরা। বলে, কেন বলুনত দাদু ?

কেন ? সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে চোখ মুখ তোমার বলে, অহর্নিশি অসোয়াস্তির বোঝা একটা যেন ব'য়ে চলেছো তুমি। আর তার বোঝাটাকে ভুলে থাকার জন্যই যেন তোমার এই কর্ম্ম মুখরতা।

কি যে বলেন দাছু! মৃছু হেসে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা ক'রে মীরা।

অশোকনাথের ঠোঁটের পাতায় নিজের অজ্ঞাতেই ফিকে একটু ম্লান হাসির রেখা ওঠে ভেসে। ভাবেন, এই যে তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা, এই যে স্তিমিত ছ'টো চোখ—একে কি ফাঁকি দেওয়া এত সহজ! ঠুনকো একটু হাসি দিয়ে কি এত সহজে তাকে ভোলানো যায়! হায়রে দুর্ব্বল ছলনাময়ী নারী! সারা দুনিয়াটাকে ছলনায় ভুলালেও এ বৃদ্ধের চোখ দুটোকে ফাঁকি দেওয়ার মত শক্তি আজও যে অর্জ্জন ক'র্‌তে পারনি তুমি। তাই মিথ্যে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত এই প্রচেষ্টা—এটা আজ সত্যই নিরর্থক! ভাবছো, ধরা সহজে তুমি দেবে না, কিন্তু তোমার মুখ, তোমার চোখ, তোমার যৌবনের অচঞ্চল এই রূপ, তাকে ত তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি! সে যে তোমার নিজেরই অজ্ঞাতে তোমার স্বরূপ প্রকাশ ক'রে চলে বারবার। হায় অবলা বালিকা, দোষ তোমার নয়, দোষ এই ভুলে ভরা জগতের—এই পৃথিবীর কালো মাটির—আর তার এই শুভ্র ও স্নিগ্ধ আলো বাতাসের। সেই ত আবরণ ও আভরণে, নিজেকে আচ্ছাদিত রেখে, তার বাহ্যিক রূপ-লাবণ্যকে প্রাধান্য দিতে শিক্ষা দিয়েছে। মানুষ, ত তারই সৃষ্ট সামান্য একটি জীব। সেই অনুকরণ স্পৃহাটাই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ও চলার পাথেয়।···

যদিও অশোকনাথের সাধ্যের অতীতবস্তু সকল কিছু, তবুও চিন্তার আবর্ত্ত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'র্‌তে পারেন না তিনি। বিবেকের অহরহ দংশন—এ কি ক'র্‌লাম···নিজের ব্যক্তিগত সুখ ও শান্তির মোহে ছ'টো নিরীহ অমূল্য প্রাণের এই যে জীবন্ত সমাধি টেনে এনেছি—তার প্রায়শ্চিত্ত আজ ক'র্‌বো কেমন ক'রে? কোন মুক্তি-পথের সন্ধান কি খুঁজে পাবো না কোনদিন!···

এই যে দুটো প্রাণীর তারুণ্যে নেমেছে প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য্য, বার্দ্ধক্যের স্থবিরতা, ধ্যানী যোগীর মত আহার ও বিহারে নেমেছে একান্ত উদাসীনতা —এর কি অবসান ক'রতে পারবে কোনদিন ?

লোকসমাজে বাস—তাই আভরণ আছে, আবরণ আছে। কথার ফাঁকে আছে ফিকে একটু হাসি, কিন্তু নেই তার উজ্জ্বলতা, নেই সে মাধুর্য্য : যেন সে বাসি ফুলের মতই সৌরভ ও সৌন্দর্য্যবিহীন। তবুও তাদের গৃহী ও সংসারী সাজতেই হবে। আর আশপাশের লোকেরা তাই দেখে প্রশংসা-মুখর হ'য়ে উঠবে, যেন "শুক ও সারী"। হায় ভগবান !

…সুখী ! হ্যাঁ, সুখীই বটে তারা। ভাবেন অশোকনাথ, অন্ততঃ বাইরের জগতে তারা সত্যই সুখী। কারণ, নেই তাদের কলহ, নেই অকারণ দ্বন্দ্ব ও উচ্ছলতা, আছে পরস্পরের মধ্যে একটা মৌন সম্মতি—যা সাধারণ জীবনে চোখে পড়ে না সহসা। অশোকনাথ একমনে বসে বসে তলিয়ে ভাবেন আর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন—হ্যাঁ এরই নাম বটে জীবন। এরই নেশায় মানুষ সর্ব্বস্ব পণ করে : এটুকুত শেষের সঞ্চয়—

মীরা প্রথম দিনের পরিচয়ের স্মৃতিটাকে, অনেকখানি হালকা, অনেকখানি সহজ ও সরল ক'রে এনেছে বটে, কিন্তু তার সেই ক্ষণিকের ক্ষতটুকু মুছতে পারে নি একেবারে। তাই যথাশক্তি নিয়োজিত ক'রেও সে সম্পূর্ণ সহজ ও সরল হ'য়ে উঠতে পারলো না। কোথায় যেন একটু বাধে। হয়ত, সে বস্তুটা খুবই তুচ্ছ কিন্তু বাঁধনটা তার এতই দৃঢ় যে, কোনমতেই সে আকর্ষণটাকে মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারে না সহজে। এর কারণ যে সে খুঁজে দেখেনি তা নয়, কিন্তু কোথায় যে তার উৎস, সে সন্ধান আজও সে পায়নি। তাই, সে স্বামীর কোলে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে চাইলেও নিঃস্ব ও রিক্ত করতে পারলো না সহজে।

স্বামী তার রূপবান, গুণবান্ ! জীবনে যতটুকুর প্রয়োজন তার কোনটারই অভাব নেই। ভাল তিনিও বাসেন একান্তে। মন-প্রাণ সে

সোহাগ ও আবেগের স্রোতে যে ভেসে যায় না তা নয়, তবুও মনে হয়, সবটুকু যেন উজাড় ক'রে দিতে পারেননি তিনি। তাই এত ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্যের মধ্যেও সেই রিক্ততার সুর ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে প্রতিটি মুহূর্ত্তে। সব কিছুর মধ্যে বসবাস ক'রেও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ভেসে ওঠে সেই বুভুক্ষার হাহাকার—"বুঝি সবটুকু নিঃশেষে পাওয়া তার হ'ল না এ জীবনে।"…সেই বেদনার আবর্ত্তেই সে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, আর কাজের ফাঁকে ফেলে ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস—হায়!

* * * *

মরমীপ্রকাশের জীবনে অভাব নেই—বরং আছে প্রাচুর্য্যের অবকাশ। চাইতে তাকে হয় না—পাশেই সাজানো আছে থরে থরে, শুধু বেছে নেওয়ার যা অপেক্ষা। তবুও তার নেই তৃপ্তি—জীবনে নেই শান্তি।

কিসের যেন বেদনার ক্ষতে সারা দেহ-মন তার বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে দিনের পর দিন—অথচ সে বস্তুটি যে কি তার সন্ধান সে পেল না এ জীবনে।

অভাব তার নেই—হয়ত তারই বেদনায় সে আজ জর্জ্জরিত। চাইতে তাকে হয় না—হয়ত সেটাই তার জীবনের চরম আক্ষেপের বস্তু। অথচ যখন সে উন্মুক্ত জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে এই প্রলুব্ধ বিশ্বের রূপ, তখন সে মোহিত হ'য়ে যায়। ভাবে, এত প্রাচুর্য্যে ভরা এই জগত! এমন মনমোহিনী এর রূপ!

ভাবে—সে তন্ময়। তবুও বুক ভেদ ক'রে তার নেমে আসে ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস—হায়!…

হায়!·কেন হায়?·· ভাবে, মরমীপ্রকাশ। ওই ত আকাশ! কেমন সুনীল ও প্রশান্তিতে ভরা ওর বুক। কেমন শান্ত ওর ছায়া। মনকে টেনে নিয়ে যায় কোন এক সুদূর প্রান্তে—যেখানে সে নিজেই হারিয়ে ফেলে তার নিজের বৈশিষ্ট্য।

মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে থাকে মরমীপ্রকাশ। অন্তরটা তার এক অজ্ঞাত শান্তির ছায়া পরশে শান্ত হ'য়ে আসে। কিন্তু বেশীক্ষণ সে মোহডোরে বাঁধা থাকে না তার মন। নেমে আসে এই বাস্তব পৃথিবীর বুকে।

দেখা যায় দূরে, ছোট একটি জীর্ণ কুটীর। তার প্রাঙ্গণে হেসে, নেচে হেলে দুলে ঘুরে ফিরে বেড়ায় ছোট একটি ছেলে আর মেয়ে। তার একটু দূরে মুগ্ধ নেত্রে দাঁড়িয়ে একটি যুবক ও যুবতী। তাদের খুশীভরা চোখ, হাসি ভরা ঠোঁট, আবেগে উদ্বেলিত উভয় হৃদয়। মনে হয়, হ্যাঁ সুখী বটে—ওরা!···

অকারণে বুকটা জ্বালা ক'রে ওঠে। অজ্ঞাতে নেমে আসে একটা অতৃপ্ত জ্বালাময়ী দীর্ঘশ্বাস!

সচকিত হ'য়ে ওঠে মরমীপ্রকাশ! কেন এত জ্বালা? কিসের তার অভাব?

ওই ত জীর্ণ কুটীর। সর্ব্বত্রই নেই নেই—সেই চির রিক্ততার দীর্ণ আবেশ। তারই পরিবেশে—জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার দু'টি মানুষ, মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে, ম্লান ফ্যাকাসে একটু হাসি হাস্‌ছে মাত্র। তার এত আকর্ষণ, এত জ্বালা?···সবল সুস্থ এই দেহ, প্রশস্ত এই বুকের পাঁজর। তবুও চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যায় কিসের নেশায়—কিসের তৃষায়? কি সে চায়!

তবে কি রিক্ততাই তার জীবনের একমাত্র আকর্ষণ! তারই মোহে সে আজ দিশে হারা? কে জানে! আপন মনে ভাবে মরমীপ্রকাশ।···

ফিরে এসে দাঁড়ালো আয়নার সাম্‌নে। ভাল ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লো নিজের দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। মনটা তার সেই শ্রী ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'ল। ভাব্‌লো কেন তবে মিছে এই অকারণ দুঃসহ জ্বালা বয়ে মরে অহরহ? তার অভাব ত নেই কোন কিছুরই!

ঘরে অমন সুন্দরী তন্বী যুবতী স্ত্রী। রূপে যার সারা ঘর আলো হ'য়ে যায়—যার সুঠাম তনুশ্রী চিত্তকে উদ্বেলিত ক'রে তোলে

—যার চোখের মায়া, ভোলায় এই জগতের অস্তিত্ব, যার ঠোঁটের সামান্য এতটুকু হাসি, জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতিকে অবশ ক'রে তোলে —তার চেয়েও কি বেশী পাওয়ার আশা তার থাকতে পারে জীবনে? এই যে অতৃপ্ত ক্ষুধা, এর চাহিদা কি মিটাতে পার্‌বে কেউ সহসা?

সহসা দু'টো মূর্ত্তি স্পষ্টতর হ'য়ে ভেসে ওঠে আয়নার ওই সাদা কাঁচের পর্দ্দায়। মরমীপ্রকাশ সচকিত হ'য়ে পিছন ফিরে তাকায় বারেক। মূর্ত্তি দুটো অপরিচিত। তবুও এক নিমেষে বুঝে নেয়, পাশের বাড়ীর নোতুন কেউ ভাড়াটে বোধ হয় হ'বে! আদব কায়দায় মনে হ'ল নব-দম্পতি ওরা। চোখে মুখে ভেসে আছে শত নবীন পরিকল্পনা— চাওয়া পাওয়ার মুখর কত নোতুনের স্বপ্ন।

নির্ব্বাক নিশ্চল দর্শকের স্থান অধিকার ক'রে মরমীপ্রকাশ ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইলো নির্লজ্জের মত। মেয়েটির গোলাপি গণ্ড দুটো লজ্জায় যেন আরও একটু রক্তিম হ'য়ে উঠ্‌লো। বাধ্য হ'য়েই যেন সে একটু পাশ ফিরে দাঁড়ালো তার স্বামীর কোলের কাছ ঘেসে। মুখটা ঢাকা পড়ে গেল স্বামীর মুখের ছায়ায়; কিন্তু কণ্ঠস্বর তার তেমনি আবেগ ও উত্তেজনায় উচ্ছ্বাসিত হ'য়ে ভেসে রইলো বহুক্ষণ। মরমীপ্রকাশ কুতূহল ভরা চিত্তে শুনতে লাগ্‌লো তাদের পুলকিত ওই মধুর গুঞ্জন। অকারণে শিহরিত হ'ল দেহ···রোমাঞ্চিত হ'ল মনের স্তিমিত সেই সূক্ষ্ম পর্দ্দাগুলো। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌লো, হ্যাঁ—একেই ব'লে হয়ত জীবনের সজীব স্পন্দন!···

সহসা পিছন থেকে মৃদু কোমল কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—চা এনেছি।

সচকিত হ'য়ে ফিরে তাকালো মরমীপ্রকাশ। দেখ্‌লো, সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মীরা—সদ্যস্নাতা। পিঠে এলানো—কুঞ্চিত ভ্রমর-কাল কেশগুচ্ছ। কপালে ছোট একটি সিঁদুরের টিপ।

বড় ভাল লাগ্‌লো মরমীপ্রকাশের। বহুক্ষণ তাকিয়ে দেখ্‌লে সেই রূপ! তবুও চিত্ত যেন ভরে না—মনে হয় বার বার হেরি সেই রূপ।

মৃদু কণ্ঠস্বর পুনরায় ভেসে উঠ্‌লো—চা, খাবে না?

মরমীপ্রকাশ ভুলে গেছে নিজেকে। ভুলে গেছে স্থান, কাল, পাত্র ভেদ! তার বুভুক্ষিত হৃদয় সহসা উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে। সে চায় তার জীবন-সিন্ধুকে ভোগ উপভোগে রাঙা ক'রে তুল্‌তে। তাই আবেগে, এক হাতে চেপে ধর্‌'লো মীরার হাতখানা। কাছে টেনে নিল তাকে একেবারে বুকের কাছে। তবুও যেন তৃপ্তি সে পায় না। কাছে—আরও কাছে…যেখানে থাক্‌বে না এতটুকুও ব্যবধান - নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে উভয়েই!

খানিকটা চা পড়ে গেল মেঝের ওপর। আঁৎকে উঠ্‌লো মীরা! মৃদু অনুযোগ ভেসে এলো সেইসঙ্গে—পড়ে গেল যে!

যাক্! অবজ্ঞার সুরে টেবিলে নামিয়ে রাখ্‌লো কাপটা। তারপর নিঃশব্দে তাকে নিবিড় ভাবে টেনে নিল তার বুকের উপরে।

বাধা দিল না মীরা। সেও ত নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায় এমনি নিবিড়তর ভাবে। কিন্তু কোথায় যেন একটা অজ্ঞাত বাধা এসে তাকে আড়ষ্ট ক'রে তোলে। তাই শত বাসনা সত্ত্বেও কণ্ঠ তার রুদ্ধ হ'য়ে আসে। শুধু নীরবে পালন ক'রে যায় স্বামীর নির্দ্দেশ। আর সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে স্বামীর সুখ সুবিধার দিকে। এর বেশী হয়ত একদিন কামনা তার ছিল, আজ তা নিঃশেষ হ'য়ে গেছে তার নিজেরই অজ্ঞাতে। তাই এই আন্তরিকতার মূল্য হয়ত কেউ বুঝ্‌বে না—নিঃশব্দে ঠেলে দেবে একটু দূরে।

মীরা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুজিয়ে নেয় চোখের পাতাগুলো।

আবেগে মরমীপ্রকাশ তার মুদ্রিত আঁখির পাতায় চুম্বন ক'রে বার বার। বলে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ, একটিবার!

ক্রমশঃই স্পষ্টতর হ'য়ে কর্ত্তব্য-জ্ঞানটাকে পীড়ন ক'র্‌লো প্রতিটি মুহূর্ত্তে! অথচ তখনও স্বামী সমাহিত সুর ও লয়ের আবর্ত্তে। এসময়ে তাঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে কিনা স্থির ক'র্‌তে না পেরে—ধীরে ধীরে বেরিয়ে সে গিয়েছিল নিঃশব্দে—কিন্তু তখন এই জবাবদিহির প্রশ্নটা স্মরণ হয়নি। তাই লজ্জায় অভিভূত হ'য়ে অপরাধিনীর মত মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে র'লো তেমনি নীরবে।…

মরমীপ্রকাশ উত্তর পেল না তার প্রশ্নের। কিন্তু বুঝ্‌তে পার্‌লো, অপরাধ শুধু মীরার নয়—অপরাধ তার নিজেরও অনেকখানি। সংসার যে জগতের রূঢ় বাস্তবক্ষেত্র! সেখানে হয়ত ক্ষমা নেই কারও। তাই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে মুখে মৃদু হাসি ফোটানোর চেষ্টা ক'রে ব'ল্‌লো—বাঃ—চা-টা ত চমৎকার হ'য়েছে!

চকিতে মীরার মুখখানা লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। ফিরে পেল তার নিজস্ব সত্তা। সলজ্জ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে বারেক তাকিয়ে ফিরে গেল তার নিজের কাজে।…

* * * *

মীরা চলে গেল। কিন্তু আহারে রুচি যেন মিলিয়ে গেল সেই মুহূর্ত্তে। মরমীপ্রকাশ সেতারখানা নামিয়ে রেখে ফিরে এলো দাদুর ঘরে।

অশোকনাথ খুশী মনে ব'লে উঠ্‌লেন, বসো, ভাই বসো। একটু যোগিয়ার তান শোনাও তো ভাই! বহুদিন শোনা হয়নি তোমার হাতের সুর। শোনাও—

মরমীপ্রকাশের ব্যথাহত মনটা তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে ওঠেনি। অবহেলা ও উপেক্ষার বেদনা, জীবনে এই প্রথম অনুভব ক'র্‌লো সে। হৃদয়টা তখনও টন্ টন্ ক'র্‌ছে যাতনায়। তবুও দাদুর ডাকে নিজেকে সচেতন ক'রে তোলার চেষ্টা ক'র্‌লো একটিবার। সযত্নে সেতারটা তুলে নিয়ে দিল সুরের ঝঙ্কার।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। সহসা ব'লে উঠ্লেন অশোকনাথ, সুরে তোমার ঠিক মেজাজ্ আস্ছে না মরমীপ্রকাশ! বোধ হয় মনটা তোমার ভাল নেই। একটু থেমে সহাস্যে ব'ল্লেন, না—সত্যই নাত-বৌ তোমার মন হরণ ক'রে নিয়েছে ভাই!

সচেতন হ'য়ে উঠ্লো মরমীপ্রকাশ। সুরটা ঠিক মত বেঁধে নিয়ে সলজ্জ একটু হাসি হেসে সুরু ক'র্লো পুনরায়।

অশোকনাথ নীরব হয়ে প'ড়্লেন কিন্তু অনুভব ক'র্লেন, এটা ভুল নয়, মোহ্ও নয়, শিল্পীর আশা-ভঙ্গের নির্ম্মম বেদনা। তাই—নিজের অজ্ঞাতে সে হারিয়ে ফেলে সুর ও লয়ের সাধনা।

সহসা চুড়ির ঠুং ঠুং মৃদু গুঞ্জন এলো ভেসে। ফিরে তাকালেন অশোকনাথ। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মীরা। হাসিমুখে ব'লে উঠ্লেন অশোকনাথ, এসো, দিদি এসো—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

খাবার এনেছি দাদু!

বেশ ক'রেছো, সহাস্যে ব'ল্লেন—আমার ঘরে যে আরও একজন অতিথি বসে র'য়েছে দিদি—তার জন্যেও যে কিছু চাই!

না, না—বাধা দিয়ে উঠ্লো মরমীপ্রকাশ। এইমাত্র খেয়ে আস্ছি দাদু!

তা হোক, তুমি নিয়ে এসো ত দিদি! কথার ফাঁকে চকিতে উভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝ্তে পারেন অশোকনাথ, সুর-ভঙ্গ হ'য়েছে কোথায়! নিঃশব্দে বসে বসে ভাবেন, যেখানে উৎপত্তি জীবনের আদি রস, যার প্রেরণায় মানুষ হ'ল মানুষ, হ'ল সচল ও সজীব—সেই উৎস-পথ রুদ্ধ হ'য়ে গেছে অকারণে। তাই, ফোটা ফুল শুকিয়ে গেছে অসময়ে। ভাদরের ভরা গাঙেও নেমেছে নোতুন চর। আজ সেই ভারের বোঝাই মুক্ত ক'র্তে হবে তাঁকে।...

ফিরে এলো মীরা।

অশোকনাথ ব'ল্‌লেন—বুড়ো হ'য়েছি কিনা—তোমার দিদির আর আমাকে পছন্দ হয়না—এমন কি কাছেও আসে না সহসা! তাই ব'ল্‌ছি, তুমি একটু পাশে এসে বসো ত দিদি—অতীতের স্মৃতিটা একবার ঝালিয়ে নিই! মরমীপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে ব'ল্‌লেন—ওগুলো মুখে চট্‌পট্‌ দিয়ে নাও তো ভাই! তুমি কিন্তু—বড় বোকা মেয়ে দিদি। মীরার দিকে ফিরে ব'ল্‌লেন—গরম চা এক কাপ নিয়ে এলে না আমার দাতুর জন্যে? যাও চট্‌পট্‌। আর আমার জন্যে গরম জল ও পাতিলেবু একটা নিয়ে আসবে।

বিস্ময় বোধ করে মীরা। অশোকনাথ সহাস্যে বলেন—ও সব বিলিতি খানা ধাতে এখনও আমার সহ্য হয় না দিদি!

মীরা চলে গেলে পর অশোকনাথ হেসে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন—মুখ ভার ক'রে বসে রইলে যে—মেজাজটা বুঝি এখনও ঠাণ্ডা হয়নি? মুখে দিয়ে—চট্ পট্‌ সুরটা ধরো একবার।

মরমীপ্রকাশ নীরবে আদেশ পালন করে। মীরা চা নিয়ে ফিরে আসে। বলে—চুমুক দিয়ে নাও, নইলে আবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে। দাতু, জল আর নেবু এখুনি কি নিয়ে আস্‌বো?

মৃদু হাসেন অশোকনাথ। বলেন, আন্‌বে বইকি দিদি। কিন্তু একটা কথা—এখানে ব'সে আমায় তৈরী ক'রে দিতে হবে—বুঝ্‌লে? মরমী-প্রকাশকে ব'ল্‌লেন—নাও, বেলা হ'ল। ওগুলো মুখে দিয়ে সুরু করো এবার।

মীরা ফিরে আসে। ইচ্ছে ক'রেই ধীরে সুস্থে বসে বসে, লেবুর জল তৈরী করে। নারীর সহজাত ধর্ম্ম ও সংস্কারের তাগিদে প্রভাতে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে অপরাধ সে ক'রেছিল—এখন সেই অন্যায়ের মাশুল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই এসেছিল সে। তাই মরমীপ্রকাশের সুর শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নানা কাজের অছিলায় ঘরের মধ্যে বসে রইলো সে নীরবে।

খুশী হ'লেন অশোকনাথ। মরমীপ্রকাশও প্রাণ ঢেলে বাজালো সেতারখানা। কিন্তু যার সাহচর্য্যে প্রাণের তন্ত্রীখানা স্পন্দিত ও মুখরিত হ'য়ে উঠেছিল নিজের অজ্ঞাতেই, সেই কক্ষ ত্যাগ ক'রে চলে গেল চোখা-চোখি হওয়ার পূর্ব্বে। প্রাণটা একটা অজানা ব্যথায় টন্ টন্ ক'রে উঠ্লো মরমীপ্রকাশের। যাকে এতটুকু দেখার নেশায় মনটা উদ্বেলিত হয়, যার সঙ্গে নীরবে দুটো কথা কওয়ার আশায় প্রাণটা মুখরিত হ'য়ে ওঠে, সেই বা সহসা ধরা দেয় না কেন? আবার যখন ধরা যায় তখনই বা ভাষা নিঃস্ব হ'য়ে পড়ে কেন? এই যে আকুলতা—এই যে ব্যাকুলতা—এর মধ্যে কি সত্যই কোনদিন ধরা দেবে না মারা? তবে কি তার এই হৃদয়-জোড়া ভালবাসা, এমনি মরুতৃষার মত শুধুই মরীচিকার সৃষ্টি ক'র্‌বে, কূল পাবে না কোনদিন?

মরমীপ্রকাশ! অশোকনাথের স্নেহমাখা মৃদু কণ্ঠস্বর উঠ্‌লো ভেসে। সহসা এমন আন্‌মনা হ'য়ে প'ড়্‌লে কেন ভাই?

সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লে, না, এমনি!

মৃদু হাসেন অশোকনাথ। বলেন- জীবনের রহস্যই এই ভাই! কিন্তু দেখো—অভিমানের বোঝায় যেন চলার পথটা পিচ্ছিল হ'য়ে না পড়ে!

তার মানে?

হাসলেন অশোকনাথ। ব'ল্‌লেন—বুড়ো হ'য়েছি, দেখেওছি অনেক—তাই ছায়া দেখেই টের পাই। কথাটা ব'লেই বুঝ্‌তে পার্‌লেন অশোকনাথ, এতখানি মুখর হওয়া তাঁর উচিত হয়নি আজ। তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ব'ল্‌লেন—ও কিছু নয় ভাই ও কিছু না! একটু টেনে হেসে উঠ্‌লেন। ব'ল্‌লেন—সম্পর্কটা আমাদের তামাসার—তাই একটু ঠাট্টা ক'র্‌লাম মাত্র!...

* * * *

মীরার বয়স সবে চোদ্দ পার হ'লেও, তার এই নারী-জীবনটুকুর অভিজ্ঞতা কারও চেয়ে কিছু কম নয়। এই বয়সেই সে পাকা গৃহিনী। যদিও এ বয়সটা তার স্বপ্ন দেখার বয়স, তবুও বাস্তবমুখী তার প্রতিভা বাস্তবকেই আপন ক'রতে ব্যস্ত সকল সময়। তাই নেশায় বিভোর হ'য়ে থাকার চেয়ে, কেমন ক'রে এই জীবনটাকে রাঙিয়ে তোলা যায়, চির সজীবতার স্পন্দনে কিরূপে স্পন্দিত করা যায়—সেই চিন্তায় থাকে সে মগ্ন।

স্বামীকে পছন্দ তার হয়নি তা নয়—বরং ভালই লেগেছে সকল কিছুর চেয়েও একটু বেশী। কারণ তিনি শুধু রূপবান নন, গুণীও রীতি মত। এই স্বল্প বয়সে যাঁর এত নাম-যশ, ভবিষ্যতে তিনি যে একজন প্রথিতযশা ব্যক্তি হবেন, সে বিষয়ে কি সন্দেহের অবকাশ থাক্‌তে পারে কোনদিন?

এ সংসারে সে নবাগতা। আদর আপ্যায়ণ ও আতিশয্যের ফাঁকে, বাইরের রূপটা মাঝে মাঝে ভেসে আস্‌ছে তার চোখে—ঠিক একটা উজ্জল আলোকের মত। হয়ত অস্পষ্ট, তবুও ত বোঝা যায়—এ আদর শুধু মুখের নয়—এর সঙ্গে আন্তরিকতার পরশও আছে, বিশেষ ক'রে—অশোকনাথের।

স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট। তার ভালবাসায় মলিনতা নেই, কৃত্রিমতাও নেই। সে স্ফটিক জলের মতই স্বচ্ছ। তার ওপর তিনি হৃদয়-খোলা মানুষ। যার কাছে লুকোচুরির কোন বালাই নেই,—প্রাণের প্রতিটি কথা যিনি প্রকাশ করেন অকপটে, সেই প্রকৃতির মানুষ তিনি। তাঁকে ভাল না বেসে কি থাকা যায় কোনদিন?

* * * * *

মীরা মরেছে। নিজেকে হারিয়েছে—ছাঁদ্‌নাতলার প্রথম আঁখি বিনিময়ের সেই শুভ মুহূর্ত্তে। মনে মনে নিজেকে সৌভাগ্যবতী ব'লে

গর্ব্বও সে ক'রেছে সকলের অলক্ষ্যে। সে আশা তার ব্যর্থ হয়নি, কিন্তু ফুল-শয্যার রাতে যখন সে সত্যকার পেল স্বামীর হৃদয়ের পরিচয়, সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তেই আচম্বিতে তার মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলো যে আঘাত পেল, তার জের সে কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লো না সহজে। হয়ত পার্‌বেও না কোনদিন! যদিও মনকে সে বুঝিয়েছে,—একটা যন্ত্রের প্রতি ভালবাসা কি রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের চেয়েও বেশী আকর্ষণীয় হ'তে পারে কোনদিন? ওটা ত মুখের কথা! তার জীবন সাধনার পাথেয়···তবুও অন্তর পায়নি—তৃপ্তি! বার বার ঘুরে ফিরে, সেই একই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়—"জীবনের সব কিছুর প্রথমে এই সেতারখানা—তারপর তুমি,—এই ঘর···এই সংসার···"

তার চেয়েও বড়! ওই শুক্‌নো লাউয়ের খোলা, আর তারে গড়া ওই নিষ্প্রাণ যন্ত্রটা! বড়—হ্যাঁ বড়। তার চেয়েও বড়—তার চেয়েও প্রিয়—

মনটা প্রতিটি মুহূর্ত্তে একটা সুতীব্র অভিমানের রূঢ় কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয় মীরার। বড়, তার চেয়েও বড়—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ - সব চেয়ে বড় ও প্রিয়, নিস্পন্দ-নিথর ওই যন্ত্রখানা—

তাই মীরা নিজেকে ধরা দিয়েও একেবারে নিঃস্ব ক'রে বিলিয়ে দিতে পার্‌লো না সহজে। "জীবনের বাকী যেটুকু পাথেয়, সেটুকুই সে রাঙিয়ে তু'ল্‌বে, এর বেশী অধিকার তার নেই।"·· তাই একান্ত নিজস্ব আপনার বস্তুকেও সে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে—আর নিভৃতে গোপন করে তার হৃদয়-বেদনা!···

ভয়, হ্যাঁ ভয়—তার আছে বৈকি! সে বস্তুটি তার নিজের চিত্তেরই দুর্ব্বলতা। তাই, সকল সময়ে থাকে সে সজাগ। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ক'রে চলে সে অভিনয়। যদিও সে বোঝে এবং মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধিও ক'রে, সরল ও আত্মভোলা স্বামীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন সে নিজেই, তবুও তাঁর ডাকে ঠিক প্রাণ খুলে নিজের সমস্ত স্বত্বাকে বিলিয়ে সে দিতে

পারে না—কোথায় যেন বাধে। মীরা নিজেই উপলব্ধি করে, সেই শূন্যতার ব্যবধান একটা পাষাণ প্রাচীরের মত স্থায়ী অন্তরায়ের সৃষ্টি ক'রছে তাদের নিবিড় এই মিলনের পথে। বুক ভেঙে নেমে এলো চাপা দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু উপায় কি? তাই নিজের সঙ্গেই চলে তার অহরহ অন্তর-দ্বন্দ্ব। তবুও—জড় সেই বোঝাটার ভার সে কাটিয়ে উঠ্তে পারে না কোনমতে। হায়রে দুর্ব্বল মন। এমনই সূক্ষ্ম তার গ্রন্থী, একবার সে বাধন ছিন্ন হ'লে জোড়া আর তাকে দেওয়া যায় না কোনমতে।…

নিজেকে ভোলার আশায় সে সারাদিন তাই সংসারের কাজে থাকে মেতে। যেন এই নেশাটাই তার ব্যক্তিগত জীবনের সর্ব্বস্ব সাধনা। এর বেশী সে চেনে না, জানেও না। তার বেশী কামনা হয়ত হৃদয়ে ছিল, কিন্তু তা' নিঃশেষ হ'য়ে গেছে তার নিজেরই অজ্ঞাতে…

*　　*　　*　　*　　*

মীরার আচরণে সকলেই বিস্ময়াভিভূত হ'ল। যার বাবার অগাধ ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্য, যে আবাল্য বিলাস-ব্যসনের মধ্যে হ'য়েছে মানুষ, তার জীবনে এমন কাজের নেশা, কেমন ক'রে যে দানা বাঁধ্‌লো—কে জানে?

যশোদাময়ী বলেন, অমন মেয়ে আর দেখা যায় না! যেমন রূপ, তেমনি গুণ। যেন রূপে-গুণে দিদি আমার লক্ষ্মী-সরস্বতী!

প্রতিবেশীরা সায় দেন। বলেন সত্যই অমন ভাল মেয়ে বড় একটা চোখে পড়ে না আজকাল। বড় লোকের মেয়ে—তার ওপর এমন রূপ, তবুও নেই এতটুকু অহঙ্কার—এতটুকু অভিমান। সত্য কথা ব'ল্‌তে কি দিদি, যেমন তোমার নাতি, ঠিক তেমনি হ'য়েছে তোমার নাত-বৌ। যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণ।

কথাগুলো শুনে খুশী হ'লেন যশোদাময়ী। তাঁর উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই মৃণালিনী খুশীভরা কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন—এ সবই ত আপনাদের আশীর্ব্বাদ দিদি!…

অনাথবন্ধুর মত অর্ধ-ধ্যানমগ্ন উদাসী সংসারীও মুগ্ধ হ'লেন মীরার আচার-ব্যবহারে। ব'ল্লেন—সত্যই মা যেন সংসারে আমার জীবন্ত লক্ষ্মী প্রতিমা। দেখ্ছো না—এই কটা দিনের মধ্যে সুনিপুণ হাতে মা আমার সংসারের শ্রী কেমন ফুটিয়ে তুলেছে !···

সত্যই মীরার একনিষ্ঠ সেবায় সংসারের সকলেই আত্মতৃপ্তি বোধ ক'রেছেন, এমন কি অশোকনাথও। কিন্তু মরমীপ্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিপূর্ণভাবে খুশী হ'তে পারলেন না তিনি। বুঝ্লেন বিরাট ফাঁক র'য়ে গেছে কোথাও। তাই, ব'সে ব'সে ভাবেন—তবে কি শুধু উপচার ও আড়ম্বরই হ'ল সার—প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না কোনদিন ! তবে কি তাঁর মনের অহেতুক শঙ্কাটাই পরিপূর্ণতা লাভে এই অমূল্য জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে যাবে চিরদিনের মত ! বার বার ঘুরে ফিরে মরমীপ্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য ক'রে চলেন এক মনে। খতিয়ে দেখেন, কই নব জীবনের আকর্ষণ ও মাদকতার ছায়াটা ত পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠেনি পূর্ণতররূপে। তবে কি তাঁর আশঙ্কাটাই সত্য ! তবে কি এটা কেবল নিমন্ত্রণবাড়ীর মর্য্যাদা রক্ষার ব্যবস্থা ! নিমন্ত্রিতেরা শুধু এলো আর গেলো। ভুরিভোজে তৃপ্তি লাভ ক'রে গৃহস্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'ল—বাহ্যিক আড়ম্বরের স্তুতিগান ক'রলো, ··· এটাও কি ঠিক তবে তাই ! সংসারের এই যে উচ্ছ্বাস···প্রতিবেশীর এই যে প্রশংসা মুখরতা—এর কি কোন মূল্য নেই ! সবই কি অকারণ বাহ্যিক চঞ্চলতার জৌলস !···

নিজের ঘরে ফিরে এসে বসে বসে ভাবেন অশোকনাথ—যে রিক্ততার তিক্ত স্বাদ তিনি সারা জীবন ধ'রে পান ক'রে এসেছেন—যার বিষ-ক্রিয়ায় হৃদয়টা হাহাকার ক'রেছে অনিবার—যার অসহনীয় বেদনায় অতিষ্ঠ হ'য়ে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত মিথ্যাই ক'রেছেন ছোটা-ছুটি—কুহকিনী শান্তির প্রলোভনে অলীক কল্পনার জাল বিস্তারে

হৃদয়টাকে রাঙিয়ে তুলতে চেষ্টা ক'রেছেন বার বার। সেই ব্যর্থতার ক্ষতে এই শিশু জীবনটাও কি তবে পিষ্ট হবে চিরদিনের মত! যে আশা ও আকাঙ্খায় তিনি নোতুন মন্দির গ'ড়ে তুল্‌তে চেয়েছিলেন—যে জ্বলন্ত হাহাকারের বেদনার ছায়াটা মুছতে চেষ্টা ক'রেছিলেন, একটি ফুটন্ত জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে ‧ সে চেষ্টাটুকুও কি তবে তাঁর ব্যর্থ হ'য়ে গেল!…

* * * *

অশোকনাথ আজ সত্যই অসহায়, সত্যই নিরুপায়—নীরব দর্শকমাত্র। তবুও নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত না ক'রে নিশ্চেষ্ট থাকৃতে পারেন না তিনি। তাই দিন যত যায়—স্পষ্টই উপলব্ধি করেন—হু'টী জীবন, আশা ও আকাঙ্খা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল পরস্পরের কাছে—সৃষ্টি ক'র্‌তে চেয়েছিল জীবন-বেদ। কিন্তু হায়—চিরদিনের মতই হয়ত সে বস্তু অসমাপ্তই র'য়ে যাবে। অথচ, লৌকিক বাঁধনটাই দৃঢ়তর হবে চিরদিনের মত। তার বোঝাটা হবে পথের কণ্টক, তবুও ঠোঁটের পাতায় হাসি ফুটিয়ে তাদের অভিনয় ক'র্‌তে হবে, খেল্‌তেও হবে আপন আপন খেলা। পাঁচ জনে তা দেখে খুশী হবে ‧ভাব্‌বে, এদের মত সুখী আর দুটি আছে কি এ জগতে! কিন্তু যার জীবন হুতাশনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, যে এই রিক্ত পথের যাত্রী, সেই বুঝ্‌বে এর বেদনা কত গভীর—কত দহন জ্বালা বুকে নিয়ে নিঃশব্দে যাত্রা ক'রেছে এরা। ওদের মুখের ওই ঠুন্‌কো হাসিটা সব কিছু নয়,—ওদের কপালের কুঞ্চিত রেখা,—চোখের কোলের কালোছায়া—আর বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস যা কেউ চেয়েও দেখে না, বুঝেও বুঝ্‌তে চেষ্টা করে না। সেই ছায়ার সুগভীর ইঙ্গিতটা কত স্পষ্ট ও উজ্জ্বলতর হ'য়ে ফুটে আছে ওদের জীবন প্রান্ত-ভাগে। প্রতিটি মুহূর্ত্তে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—তাদের রিক্ত জীবনের মান, বুভুক্ষু হৃদয়ের অনাস্বাদিত সুখ-নেশার দীর্ণ হাহাকার! বুক ভেদ

ক'রে অশোকনাথের নেমে এলো গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস। নিজের মনে নিজেই ব'লে উঠ্‌লেন, হ্যাঁ—সত্যই এরা হারিয়েছে এদের জীবনের যত কিছু সুখ-সম্পদ : খুয়িয়েছে জীবনের আশা ও ভরসা—শুধু বাঁধনটাই হ'য়েছে দৃঢ়। অহরহ তারই বোঝা ব'য়ে চলেছে ওরা এগিয়ে। তাই ওরা হারিয়েছে জীবনের সুর ও ছন্দ। অকারণে জেগেছে জীবনের প্রতি একটা ঘোরতর বিতৃষ্ণা। সংসারটা হ'ল তাই খেলাঘর : কর্ত্তব্যটা হল চলার পথের সেতু। তারই আবর্ত্তে তারা ঘুরে ফিরে বেড়ালো শুধু নিজেকে ভুলে থাকার উদ্দেশ্যে।

তাই—হ্যাঁ—তাই, মরমীপ্রকাশ—ভরা যৌবনের খেয়া পথে সহসা বিভ্রান্ত হ'য়ে ফিরে এসেছে তার সাধনা-মন্দিরে। ভেঙে গেছে তার জীবনের সুর; মুছে গেছে জীবনের চঞ্চল সে সুখ-স্পন্দন। তাই স্থবির নিস্পন্দের মত জীবনে তার একমাত্র অবলম্বন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ওই সেতারখানা!

…আর মীরা—সেও ভুলে গেছে জীবনের সহজাত উচ্ছ্বাস—মুছে গেছে তার চঞ্চল-যৌবনের মুখর দীপ্তিচ্ছটা। সেও যেন নিজেকে ভুল্‌তে চায় কর্ম্মের আবর্ত্তে। তাই সংসারের কাজ হ'ল তার জীবনের একমাত্র আকর্ষণ। ঘুরে ফিরে বেড়ায সে বৃদ্ধ দাদুর এই নিঝুমপুরীর আনাচে-কানাচে।

অশোকনাথ সুরবাহারখানা নামিয়ে রেখে সস্নেহে কৌতুক ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—তোমার কিছু যেন, তোমাকে ফাঁকি দিয়ে দূরে সরে দাঁড়িয়েছে - না দিদি?

ম্লান একটু হাসে মীরা। বলে, কেন বলুনত দাদু?

কেন? সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে চোখ মুখ তোমার বলে, অহর্নিশি অসোয়াস্তির বোঝা একটা যেন ব'য়ে চলেছো তুমি। আর তার বোঝাটাকে ভুলে থাকার জন্যই যেন তোমার এই কর্ম্ম মুখরতা।

কি যে বলেন দাদু! মৃদু হেসে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা ক'রে মীরা।

অশোকনাথের ঠোঁটের পাতায় নিজের অজ্ঞাতেই ফিকে একটু ম্লান হাসির রেখা ওঠে ভেসে। ভাবেন, এই যে তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা, এই যে স্তিমিত দু'টো চোখ—একে কি ফাঁকি দেওয়া এত সহজ! ঠুন্‌কো একটু হাসি দিয়ে কি এত সহজে তাকে ভোলানো যায়! হায়রে দুর্ব্বল ছলনাময়ী নারী! সারা দুনিয়াটাকে ছলনায় ভুলালেও এ বৃদ্ধের চোখ দুটোকে ফাঁকি দেওয়ার মত শক্তি আজও যে অর্জ্জন ক'র্‌তে পারনি তুমি। তাই মিথ্যে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত এই প্রচেষ্টা—এটা আজ সত্যই নিরর্থক! ভাবছো, ধরা সহজে তুমি দেবে না, কিন্তু তোমার মুখ, তোমার চোখ, তোমার যৌবনের অচঞ্চল এই রূপ, তাকে ত তুমি ফাঁকি দিতে পারোনি! সে যে তোমার নিজেরই অজ্ঞাতে তোমার স্বরূপ প্রকাশ ক'রে চলে বারবার। হায় অবলা বালিকা, দোষ তোমার নয়, দোষ এই ভুলে ভরা জগতের—এই পৃথিবীর কালো মাটির—আর তার এই শুভ্র ও স্নিগ্ধ আলো বাতাসের। সেই ত আবরণ ও আভরণে, নিজেকে আচ্ছাদিত রেখে, তার বাহ্যিক রূপ-লাবণ্যকে প্রাধান্য দিতে শিক্ষা দিয়েছে। মানুষ, ত তারই সৃষ্ট সামান্য একটি জীব। সেই অনুকরণ স্পৃহাটাই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ও চলার পাথেয়।...

যদিও অশোকনাথের সাধ্যের অতীতবস্তু সকল কিছু, তবুও চিন্তার আবর্ত্ত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'র্‌তে পারেন না তিনি। বিবেকের অহরহ দংশন—এ কি ক'র্‌লাম...নিজের ব্যক্তিগত সুখ ও শান্তির মোহে দু'টো নিরীহ অমূল্য প্রাণের এই যে জীবন্ত সমাধি টেনে এনেছি—তার প্রায়শ্চিত্ত আজ ক'র্‌বো কেমন ক'রে? কোন মুক্তি-পথের সন্ধান কি খুঁজে পাবো না কোনদিন!...

এই যে দুটো প্রাণীর তারুণ্যে নেমেছে প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য্য, বার্দ্ধক্যের স্থবিরতা, ধ্যানী যোগীর মত আহার ও বিহারে নেমেছে একান্ত উদাসীনতা —এর কি অবসান ক'রতে পার্‌বে কোনদিন ?

লোকসমাজে বাস—তাই আভরণ আছে, আবরণ আছে। কথার ফাঁকে আছে ফিকে একটু হাসি, কিন্তু নেই তার উজ্জ্বলতা, নেই সে মাধুর্য্য ঃ যেন সে বাসি ফুলের মতই সৌরভ ও সৌন্দর্য্যবিহীন। তবুও তাদের গৃহী ও সংসারী সাজতেই হবে। আর আশপাশের লোকেরা তাই দেখে প্রশংসা-মুখর হ'য়ে উঠ্‌বে, যেন "শুক ও সারী"। হায় ভগবান !

···সুখী ! হ্যাঁ, সুখীই বটে তারা। ভাবেন অশোকনাথ, অন্ততঃ বাইরের জগতে তারা সত্যই সুখী। কারণ, নেই তাদের কলহ, নেই অকারণ দ্বন্দ্ব ও উচ্ছৃলতা, আছে পরস্পরের মধ্যে একটা মৌন সম্মতি—যা সাধারণ জীবনে চোখে পড়ে না সহসা। অশোকনাথ একমনে বসে বসে তলিয়ে ভাবেন আর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন—হ্যাঁ এরই নাম বটে জীবন। এরই নেশায় মানুষ সর্ব্বস্ব পণ করে ঃ এটুকুত শেষের সঞ্চয়—

মীরা প্রথম দিনের পরিচয়ের স্মৃতিটাকে, অনেকখানি হাল্‌কা, অনেকখানি সহজ ও সরল ক'রে এনেছে বটে, কিন্তু তার সেই ক্ষণিকের ক্ষতটুকু মুছ্‌তে পারে নি একেবারে। তাই যথাশক্তি নিয়োজিত ক'রেও সে সম্পূর্ণ সহজ ও সরল হ'য়ে উঠ্‌তে পারলো না। কোথায় যেন একটু বাধে। হয়ত, সে বস্তুটা খুবই তুচ্ছ কিন্তু বাঁধনটা তার এতই দৃঢ় যে, কোনমতেই সে আকর্ষণটাকে মানুষ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না সহজে। এর কারণ যে সে খুঁজে দেখেনি তা নয়, কিন্তু কোথায় যে তার উৎস, সে সন্ধান আজও সে পায়নি। তাই, সে স্বামীর কোলে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে চাইলেও নিঃস্ব ও রিক্ত কর্‌তে পারলো না সহজে।

স্বামী তার রূপবান, গুণবান্‌ ! জীবনে যতটুকুর প্রয়োজন তার কোনটারই অভাব নেই। ভাল তিনিও বাসেন একান্তে। মন-প্রাণ সে

সোহাগ ও আবেগের স্রোতে যে ভেসে যায় না তা নয়, তবুও মনে হয়, সবটুকু যেন উজাড় ক'রে দিতে পারেননি তিনি। তাই এত ঐশ্বর্য্য ও প্রাচুর্য্যের মধ্যেও সেই রিক্ততার সুর ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে প্রতিটি মুহূর্ত্তে। সব কিছুর মধ্যে বসবাস ক'রেও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ভেসে ওঠে সেই বুভুক্ষার হাহাকার—"বুঝি সবটুকু নিঃশেষে পাওয়া তার হ'ল না এ জীবনে।"···সেই বেদনার আবর্ত্তেই সে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, আর কাজের ফাঁকে ফেলে ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস—হায়!

*   *   *   *

মরমীপ্রকাশের জীবনে অভাব নেই—বরং আছে প্রাচুর্য্যের অবকাশ। চাইতে তাকে হয় না—পাশেই সাজানো আছে থরে থরে, শুধু বেছে নেওয়ার যা অপেক্ষা। তবুও তার নেই তৃপ্তি—জীবনে নেই শান্তি।

কিসের যেন বেদনার ক্ষতে সারা দেহ-মন তার বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে দিনের পর দিন—অথচ সে বস্তুটি যে কি তার সন্ধান সে পেল না এ জীবনে।

অভাব তার নেই—হয়ত তারই বেদনায় সে আজ জর্জ্জরিত। চাইতে তাকে হয় না—হয়ত সেটাই তার জীবনের চরম আক্ষেপের বস্তু। অথচ যখন সে উন্মুক্ত জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে এই প্রলুব্ধ বিশ্বের রূপ, তখন সে মোহিত হ'য়ে যায়। ভাবে, এত প্রাচুর্য্যে ভরা এই জগত! এমন মনমোহিনী এর রূপ!

ভাবে—সে তন্ময়। তবুও বুক ভেদ ক'রে তার নেমে আসে ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস—হায়!···

হায়!·· কেন হায়?·· ভাবে, মরমীপ্রকাশ। ওই ত আকাশ! কেমন সুনীল ও প্রশান্তিতে ভরা ওর বুক। কেমন শান্ত ওর ছায়া। মনকে টেনে নিয়ে যায় কোন এক সুদূর প্রান্তে—যেখানে সে নিজেই হারিয়ে ফেলে তার নিজের বৈশিষ্ট্য।

মুগ্ধ নেত্রে তাকিয়ে থাকে মরমীপ্রকাশ। অন্তরটা তার এক অজ্ঞাত শান্তির ছায়া পরশে শান্ত হ'য়ে আসে। কিন্তু বেশীক্ষণ সে মোহডোরে বাঁধা থাকে না তার মন। নেমে আসে এই বাস্তব পৃথিবীর বুকে।

দেখা যায় দূরে, ছোট একটি জীর্ণ কুটীর। তার প্রাঙ্গণে হেসে, নেচে হেলে দুলে ঘুরে ফিরে বেড়ায় ছোট একটি ছেলে আর মেয়ে। তার একটু দূরে মুগ্ধ নেত্রে দাঁড়িয়ে একটি যুবক ও যুবতী। তাদের খুশীভরা চোখ, হাসি ভরা ঠোঁট, আবেগে উদ্বেলিত উভয় হৃদয়। মনে হয়, হ্যাঁ সুখী বটে—ওরা!…

অকারণে বুকটা জ্বালা ক'রে ওঠে। অজ্ঞাতে নেমে আসে একটা অতৃপ্ত জ্বালাময়ী দীর্ঘশ্বাস!

সচকিত হ'য়ে ওঠে মরমীপ্রকাশ! কেন এত জ্বালা? কিসের তার অভাব?

ওই ত জীর্ণ কুটীর। সর্ব্বত্রই নেই নেই—সেই চির রিক্ততার দীর্ণ আবেশ। তারই পরিবেশে—জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার দু'টি মানুষ, মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে, ম্লান ফ্যাকাসে একটু হাসি হাস্‌ছে মাত্র। তার এত আকর্ষণ, এত জ্বালা?…সবল সুস্থ এই দেহ, প্রশস্ত এই বুকের পাঁজর। তবুও চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যায় কিসের নেশায়—কিসের তৃষায়? কি সে চায়!

তবে কি রিক্ততাই তার জীবনের একমাত্র আকর্ষণ! তারই মোহে সে আজ দিশে হারা? কে জানে! আপন মনে ভাবে মরমীপ্রকাশ।…

ফিরে এসে দাঁড়ালো আয়নার সাম্‌নে। ভাল ক'রে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লো নিজের দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। মনটা তার সেই শ্রী ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'ল। ভাব্‌লো কেন তবে মিছে এই অকারণ দুঃসহ জ্বালা বয়ে মরে অহরহ? তার অভাব ত নেই কোন কিছুরই!

ঘরে অমন সুন্দরী তন্বী যুবতী স্ত্রী। রূপে যার সারা ঘর আলো হ'য়ে যায়—যার সুঠাম তনুশ্রী চিত্তকে উদ্বেলিত ক'রে তোলে

—যার চোখের মায়া, ভোলায় এই জগতের অস্তিত্ব, যার ঠোঁটের সামান্য এতটুকু হাসি, জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতিকে অবশ ক'রে তোলে —তার চেয়েও কি বেশী পাওয়ার আশা তার থাক্‌তে পারে জীবনে? এই যে অতৃপ্ত ক্ষুধা, এর চাহিদা কি মিটাতে পার্‌বে কেউ সহসা?

সহসা দু'টো মূর্ত্তি স্পষ্টতর হ'য়ে ভেসে ওঠে আয়নার ওই সাদা কাঁচের পর্দ্দায়। মরমীপ্রকাশ সচকিত হ'য়ে পিছন ফিরে তাকায় বারেক। মূর্ত্তি দুটো অপরিচিত। তবুও এক নিমেষে বুঝে নেয়, পাশের বাড়ীর নোতুন কেউ ভাড়াটে বোধ হয় হ'বে! আদব কায়দায় মনে হ'ল নব-দম্পতি ওরা। চোখে মুখে ভেসে আছে শত নবীন পরিকল্পনা— চাওয়া পাওয়ার মুখর কত নোতুনের স্বপ্ন।

নির্ব্বাক নিশ্চল দর্শকের স্থান অধিকার ক'রে মরমীপ্রকাশ ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইলো নির্লজ্জের মত। মেয়েটির গোলাপি গণ্ড দুটো লজ্জায় যেন আরও একটু রক্তিম হ'য়ে উঠ্‌লো। বাধ্য হ'য়েই যেন সে একটু পাশ ফিরে দাঁড়ালো তার স্বামীর কোলের কাছ ঘেসে। মুখটা ঢাকা পড়ে গেল স্বামীর মুখের ছায়ায়; কিন্তু কণ্ঠস্বর তার তেমনি আবেগ ও উত্তেজনায় উচ্ছ্বাসিত হ'য়ে ভেসে রইলো বহুক্ষণ। মরমীপ্রকাশ কুতূহল ভরা চিত্তে শুনতে লাগ্‌লো তাদের পুলকিত ওই মধুর গুঞ্জন। অকারণে শিহরিত হ'ল দেহ...রোমাঞ্চিত হ'ল মনের স্তিমিত সেই সূক্ষ্ম পর্দ্দাগুলো। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌লো, হ্যাঁ—একেই ব'লে হয়ত জীবনের সজীব স্পন্দন!...

সহসা পিছন থেকে মৃদু কোমল কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—চা এনেছি।

সচকিত হ'য়ে ফিরে তাকালো মরমীপ্রকাশ। দেখ্‌লো, সাম্‌নে দাঁড়িয়ে মীরা—সদ্যস্নাতা। পিঠে এলানো—কুঞ্চিত ভ্রমর-কাল কেশগুচ্ছ। কপালে ছোট একটি সিঁদুরের টিপ।

বড় ভাল লাগ্‌লো মরমীপ্রকাশের। বহুক্ষণ তাকিয়ে দেখ্‌লে সেই রূপ! তবুও চিত্ত যেন ভরে না—মনে হয় বার বার হেরি সেই রূপ।

মৃদু কণ্ঠস্বর পুনরায় ভেসে উঠ্‌লো—চা, খাবে না?

মরমীপ্রকাশ ভুলে গেছে নিজেকে। ভুলে গেছে স্থান, কাল, পাত্র ভেদ! তার বুভুক্ষিত হৃদয় সহসা উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে। সে চায় তার জীবন-সিন্ধুকে ভোগ উপভোগে রাঙা ক'রে তুল্‌তে। তাই আবেগে, এক হাতে চেপে ধর্‌'লো মীরার হাতখানা। কাছে টেনে নিল তাকে একেবারে বুকের কাছে। তবুও যেন তৃপ্তি সে পায় না। কাছে—আরও কাছে···যেখানে থাক্‌বে না এতটুকুও ব্যবধান—নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে উভয়েই!

খানিকটা চা পড়ে গেল মেঝের ওপর। আঁৎকে উঠ্‌লো মীরা! মৃদু অনুযোগ ভেসে এলো সেইসঙ্গে—পড়ে গেল যে!

যাক্! অবজ্ঞার সুরে টেবিলে নামিয়ে রাখ্‌লো কাপটা। তারপর নিঃশব্দে তাকে নিবিড় ভাবে টেনে নিল তার বুকের উপরে।

বাধা দিল না মীরা। সেও ত নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায় এমনি নিবিড়তর ভাবে। কিন্তু কোথায় যেন একটা অজ্ঞাত বাধা এসে তাকে আড়ষ্ঠ ক'রে তোলে। তাই শত বাসনা সত্ত্বেও কণ্ঠ তার রুদ্ধ হ'য়ে আসে। শুধু নীরবে পালন ক'রে যায় স্বামীর নির্দ্দেশ। আর সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে স্বামীর সুখ সুবিধার দিকে। এর বেশী হয়ত একদিন কামনা তার ছিল, আজ তা নিঃশেষ হ'য়ে গেছে তার নিজেরই অজ্ঞাতে। তাই এই আন্তরিকতার মূল্য হয়ত কেউ বুঝ্‌বে না—নিঃশব্দে ঠেলে দেবে একটু দূরে।

মীরা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুজিয়ে নেয় চোখের পাতাগুলো।

আবেগে মরমীপ্রকাশ তার মুদ্রিত আঁখির পাতায় চুম্বন ক'রে বার বার। বলে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ, একটিবার!

কেন? মানুষের জীবনে কি কথার শেষ আছে কোনকালে?

মীরা নীরব। কথা এক কালে, সে বস্তুটা ছিল অফুরন্ত। কিন্তু কখন যেন সব শেষ হ'য়ে গেছে তার নিজেরই অজ্ঞাতে। তাই হারিয়ে ফেলেছে সে ভাষা, হারিয়েছে তার গভীর মাদকতা। অবশ্য প্রয়োজন যখন আসে—সেই দেয় তার রূপ। তারপর, বাকী থাকে যেটুকু, সেটুকু বিলীন হ'য়ে যায় দেহ-মনে। তাই ত নিঃশব্দে সে নিজেকে বিলিয়ে দেয় স্বামীর চরণে। এর বেশী বলার সাধ্য তার নেই, সাধনাও নেই। যদিও চাওয়ার বাসনা তার অফুরন্ত, তবুও এ জীবনে যেটুকু সে পেল, যেটুকু সে পেয়েছে, সেটুকু ত কারও চেয়ে কম কিছু নয়! তাই নেই তার অপ্রকাশিতের বেদনা; বরং ভরপূর হ'য়ে আছে সে স্বামীর গভীর সোহাগ, স্নেহ ও মমতার স্নিগ্ধ পরশে। এর বেশী সে চায় না। আজীবন শুধু এটুকু পেলেই সে তৃপ্ত—এই সাধনাই সে ক'রে চলে মনে-প্রাণে।

বহুক্ষণ অপেক্ষার পর মরমীপ্রকাশ জিজ্ঞাসা ক'রে, ঘুমিয়ে প'ড়লে?

না!

উত্তর ত দিলে না?

কি দেবো?

যা হোক একটা কিছু!

তারও ত অবসর জীবনে আমার রাখনি কোনদিন!

নিজের মনে ক্ষণিক ভেবে নেয় মরমীপ্রকাশ। বলে, তবে কি আমাকে তোমার পছন্দ হয়নি?

সভয়ে, সবলে মীরা আকর্ষণ ক'রে স্বামীর হাতখানা। বলে, ওকি কথা ব'ল্ছো তুমি?

ঠিকই ব'ল্ছি মীরা! তাই—প্রতিটি পলে তুমি শুকিয়ে

শুকিয়ে এমনি নীরস হ'য়ে গেছ। তাই ডাকে আর সাড়া দিতে পারো না।

না—না—প্রতিবাদ ক'রে ওঠে মীরা, আমি ঠিকই আছি! বিশ্বাস করো, তোমাকে পেয়ে সত্যই আমি সুখী হ'য়েছি, শান্তি পেয়েছি জীবনে। কিন্তু মনের ভাষা প্রকাশের শক্তি আমার নেই—ওগো বিশ্বাস ক'রো, তুমি ছাড়া এ জগতে অন্য কিছু যে ভাব্‌তেও শিখিনি এ জীবনে!

মরমীপ্রকাশ বোঝে। তা সে মর্ম্ম দিয়েও উপলব্ধি করে। কিন্তু এই নির্ব্বাক—নির্ব্বিকার মানুষটাকে নিয়ে কি শান্তিতে কেউ ঘর বাঁধ্‌তে পারে কোনদিন? না বাঁধ্‌লেও সেই ঘরের প্রতি আকর্ষণটা স্থায়ী হ'তে পারে কোনকালে?

কিন্তু উপায় কি! যে মন স্থির ও ধীর—বহিঃচাঞ্চল্যে নিজেকে যে ব্যাপ্ত ক'রে নিজ-স্বত্বাকে রিক্ত ক'র্‌তে প্রস্তুত নয়,—তার প্রতি অকারণ অবিচার করা কি উচিত হ'বে কোনদিন?

গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে নিজেকে সংযত ক'রে তোলার চেষ্টা করে মরমীপ্রকাশ। ধীরে ধীরে মীরার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, ছিঃ—মিথ্যে চোখের জল ফেল্‌তে নেই মীরা! অবিশ্বাস কি তোমায় ক'র্‌তে পারি এ জীবনে? তবে তোমার শান্ত, ধীর ও স্থির কোমল মুখের দিকে তাকিয়ে মনে একটা স্বতস্ফূর্ত্ত প্রশ্ন জাগে, যে এত ভাল, এত সুন্দর, তাকে অকারণে পিষ্ট ক'র্‌ছি না তো! তাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিলাম—এটা সত্য নয়, নিছক মনের একটা খেয়াল—শোন, বিশ্বাস করো মীরা…

সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হ'ল, মরমীপ্রকাশের। তবুও বলে, শোন মীরা, বিশ্বাস করো তুমি! কোন সন্দেহ তোমার প্রতি আমার নেই, বরং সত্যই তোমাকে জীবন-সঙ্গিনী রূপে পেয়ে, জীবন আমার ধন্য হ'য়েছে—শান্তি—

থেমে গেল মরমীপ্রকাশ। মিথ্যা স্তোক বাক্যে মীরাকে ভোলাতে চাইলেও রাজী হ'ল না অন্তর। তাই কথার মোড় ফেরালো মরমীপ্রকাশ, শোন—বিশ্বাস করো মীরা—

আবেগে মরমীপ্রকাশ বুকের ওপর টেনে নিল মীরাকে। সস্নেহে চোখের পাতাগুলো মুছিয়ে দিয়ে বলে,—বিশ্বাস করো—তুমি ছাড়া আমি নেই—তুমি বিহনে আমি রিক্ত—আমার আমি অন্তঃসার শূন্য! তুমি আমার—আমার—

* * * *

মীরা স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে, তন্দ্রাদেবীর কোলে পড়ে ঢলে। মুছে যায় তার বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের ঠুন্‌কো অভিমান। ভুলে যায় সে, চকিতের এই ভুল বোঝা বুঝির অহেতুক ব্যথা ও বেদন!…

মীরা সত্যই অকপট। তার হৃদয়ে ছলনা বা কপটতার স্থান নেই। সে সরল বিশ্বাস নিয়েই নেমে এসেছে ধূলায় ধূসর এই বাস্তব জগতের বুকে। তাই অভিমান তার যত, প্রাণখোলা বিশ্বাসও তার ঠিক ততখানি। মন-প্রাণ দিয়েই সে ভালবাসে ও ভক্তি করে তার স্বামীকে। কিন্তু তার জড় মন ব্যথা দেয় মরমীপ্রকাশের হৃদয়ে। তাই সব পেয়েও মরমীপ্রকাশ পেল না তৃপ্তি, পেল না শান্তি। পুরুষ জীবনের যেটুকু বুভুক্ষা, সেটুকু হয়ত তৃপ্ত হ'য়েছে, কিন্তু শিল্পী-মন তার কেঁদে বেড়ালো, হাহাকার ক'রে। তার কাছে রক্ত-মাংসের সম্পর্কটাই সব চেয়ে বড় আকর্ষণ নয়—সেইটুকুই তার জীবনের একমাত্র কাম্য বস্তু নয়, তার চেয়েও যে সে বেশী একটু চায়—সেটা তার মন। সে চায়—সেই সচল মনের একনিষ্ঠ সহানুভূতি। সে চায়—তার হৃদয়ের পুঞ্জিভূত রসে সিক্ত উৎসাহ ও প্রেরণা। শুধু সেইটুকুর অভাবেই সে প্রতিটি মুহূর্ত্তে জ্বলে পুড়ে মরে। নীরবে একান্তে বসে বসে ভাবে, ভাল—ভালই; কিন্তু বেশী ভালও সহ্য করা দায়! আই

আজ সব কিছুরই অধিকারী হ'য়েও সে আজ সর্ব্বাপেক্ষা হীন, দরিদ্র ও চির রিক্ত। তারই অব্যক্ত বেদনায় সে জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে প্রতিটি মুহূর্ত্তে।...

* * * *

মেয়েটির বয়স হ'ল তিন। ছোট্ট ফুট্‌ফুটে ও টুক্‌টুকে। তার মার মতই তার গড়ণ। হাসি, চলা-ফেরা, এমন কি কথা বলার ধরণটিও যেন তার মা'র ছাঁচে ঢালা। হাসে, নাচে, ছুটে বেড়ায়—কিন্তু তার আকর্ষণটা যেন মা'র চেয়েও বাপের প্রতি স্বভাবতঃ একটু বেশী। বাবাকে কেন্দ্র ক'রেই সে ঘুরে ফিরে বেড়ায়।

অনিতা ছোট হ'লেও বড় চঞ্চল—বড় অভিমানিনী। মীরা শাসন করে - এ ইটুকু বয়সে যদি সকলকে এমন ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলে, বড় হ'লে কি ক'র্‌বে বলো ত?

মরমীপ্রকাশ হাসে। বলে—তা হোক্, চঞ্চল হওয়াই ভাল। নইলে প্রাণের স্পন্দন বোঝা যায় না। ও কাছে কাছে থাকে ব'লেই ত দাদুর অভাবটা অনুভব করার অবসর আমি খুঁজে পাই না সহসা।

মীরার কিন্তু শঙ্কা দূর হয় না। বলে—কি যে বলো! মেয়েছেলেকে যে পরের ঘর ক'র্‌তে হবে! তার কি এত চঞ্চল স্বভাব ভালো?

মরমীপ্রকাশ আদরে কোলে তুলে নেয় মেয়েকে। আদরে তার চিবুকে দোলা দিয়ে বলে—ছোট বেলায় ছেলেমেয়ে একটু চঞ্চল হওয়া ভাল! আমিও কি কম দুষ্টু ছিলাম ছোটবেলায়? কত ভেঙেছি, কত দুষ্টুপনা ক'রেছি, কিন্তু আজকে কি তোমার মনে হয়, তেমনি দুষ্টুই র'য়ে গেছি?

মীরা হাসে। বলে—তোমার কথা ছেড়ে দাও, তুমি যে পুরুষ।

হ'লামই বা পুরুষ, প্রকৃতিটা ত এক! শোননি, যারা ছোটবেলায় দুষ্টু থাকে, বড় হ'লে শান্ত হ'য়ে যায়। এই ত সেদিন ঠান্‌দিদি গল্প ক'র্‌লেন —মীরাও ছোটবেলায় কি চঞ্চলই না ছিল; সারা বাড়ীটাকে সরগরম

ক'রে রাখ্‌তো! আমরা ত ভয়েই সারা। এই ধিঙ্গী মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ক'র্‌বে কি!—কিন্তু এখন তাকে দেখে মনেই হয় না সে সত্যই চঞ্চল ছিল কোনদিন! আদরে মেয়ের কচি গণ্ডে চুমু খেয়ে মরমীপ্রকাশ বলে—মেয়ে আমার পেয়েছে তা'র মা'র প্রকৃতি! নয় কি?

বাধা দিয়ে ওঠে মীরা—থামো গো থামো। ওসব ঠান্‌দিদির বানানো গল্প—তাছাড়া আমরা ছিলাম অন্য প্রকৃতির—

বাধা দিয়ে বলে মরমীপ্রকাশ—না গো—না, ঠিক সেই একই প্রকৃতি। তোমার বেলায় যা, আমার বেলাও তা'। অনিতারও হবে ঠিক তেমনি! তা ছাড়া সত্য কথা ব'ল্‌তে কি, একটু চঞ্চল না হ'লে জীবনের পরশ ঠিক উপলব্ধি যে করা যায় না!

মীরা হাল ছেড়ে দেয়—কি জানি বাবু! তোমাদের ভাল মন্দ আমাদের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

মরমীপ্রকাশ উত্তর দেয় না। হাসিমুখে মেয়েকে সাদরে বুকের ওপর নেয় তুলে। চিবুকে একটু দোলা দিয়ে বলে—আমার অনিতা মা'র মত মেয়ে কি তুমি খুঁজে পাবে কোনকালে? এমন শান্ত-শিষ্ট—এমন সুন্দর! না—না—আমি জোর দিয়ে ব'ল্‌তে পারি—সারাজগত তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়ালেও এর জোড়া তুমি খুঁজে পাবে না কোনদিন।

মীরা উত্তর দেয় না। নীরবে বসে বসে শুধু হাসে আর ভাবে—কথাটা কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলেন নি তার স্বামী।···

* * * *

মীরা সন্তানকে কেন্দ্র ক'রে তার জীবনের পরিপূর্ণ আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়ার আশায় হয় উন্মুখ। তারই সাধনায় সকল সময় থাকে সে মগ্ন। যদিও সে শিশু, তবুও তার সঙ্গে সে কথা কয়—মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে। আদরে, সোহাগে বুকে তাকে চেপে ভরিয়ে নেয় শূন্য স্থানটুকু। হাসি মুখে আপন গণ্ডে তার তুল্‌তুলে

অধরটি দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ ক'রে, আত্মবিমোহিত স্বরে নিজের মনে নিজেই ব'লে ওঠে—জীবনে তুই ছাড়া আমার দুঃখের বেদনা এমন নিবিড় ক'রে বুঝ্‌বে কে আর বল ? ওরে আমার দুঃখের সান্ত্বনা, নিরাশার আশা, সুখের চেতনা, আত্মবিস্মৃতির স্বর্গ, বল্ রে বল্, তুই ছাড়া জগতে আর কি কেউ আছে এমন আপন জন—যাকে স্পর্শ ক'র্‌লেই ভুলে যেতে পারি নিজেকে ? না—না—খোকন, কেউ নেই ! এ দুনিয়ায় এমন আপন জন জীবনে আমার কেউ নেই ! শুধু তুই—খোকা, শুধু তুই···সেই সোনার কাঠি জীবনে আমার তুই ! তুই আমার আশা, তুই আমার হৃদয়ের ভাষা, আমার জীবনের স্বপ্ন। ওরে শোন্—তুই যখন বড় হ'বি,—যেদিন তুই সত্যকারের মানুষ হ'বি—আমার জীবনের সকল তপস্যা সফল হবে সেদিন। সকল সমস্যা সেদিনই আমার হবে সমাধান ! এ বুকের রুদ্ধ ভাষা আমার হবে সচেতন। বুঝ্‌লি খোকা, তুই রে আমার ধন, তুই রে আমার মন, তুই রে আমার স্বর্গ—তুই যে পরকাল !—তোর জন্যেই বেঁধেছি আমি ঘর, পেতেছি এই সংসার। তুই ছাড়া এ জগতে কি সম্বল আর আছে বল্ ?

বুকের জমাট বাঁধা ভাষার যখন বহিঃপ্রকাশ হয় স্তব্ধ, চোখের পাতাগুলো তার নিজের অজ্ঞাতেই হ'য়ে আসে রুদ্ধ ! বুকের ওপর তার ওই কচি ও কোমল দেহখানা চেপে কথা কয় সে অন্তরে অন্তরে। সে ভাষা একমাত্র বোঝে—রক্তের উষ্ণতা, জীবনের অদম্য আবেগ আর শুভ সেই মুহূর্ত্ত !

মীরা তৃপ্তি বোধ করে। শিশু কিন্তু বিস্ময়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে কখনও থাকে তার মার মুখের দিকে তাকিয়ে, কখনও বা তার এলো চুলের উড়ে আসা দু'চার গুচ্ছ ধ'রে নিজের মনে দেয় টান, কখনও বা সেইগুলো নিয়ে আপন মনে ক'রে চলে খেলা। সঙ্গে সঙ্গে চোখে মুখে তার ভেসে ওঠে সুনির্ম্মল হাসির একটা ছটা।

মাতৃ-হৃদয় পুলকে উদ্বেলিত হয়। স্বর্গের নাম শুনেছে সে জ্ঞান অর্জ্জনের পর মুহূর্ত্ত থেকে; তার সংস্কারও একটা—গাঁথা র'য়ে গেছে মনের ওই সূক্ষ্ম পর্দ্দার প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তবুও মনে হয় কাল্পনিক সেই স্বর্গ সুখ অপেক্ষা পার্থিব এই একান্ত মমত্ববোধ বেশী তৃপ্তিদায়ক—নিবিড় শান্তির পথ প্রদর্শক।...

* * * *

মরমীপ্রকাশের সংসারের প্রতি আকর্ষণ কারও চেয়ে কম কিছু নয়। বরং একান্ত নিবিড় ক'রেই ভালবাসে সে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে, কিন্তু তবুও মনটা তার তৃপ্তি পায় না। গুম্‌রে মরে—কি জানি কিসের এক অজ্ঞাত বেদনার আবর্ত্তে। তাই এই গণ্ডীর মধ্যে সে তৃপ্তি পায় না, শান্তি পায় না—যেন বর্হিবিশ্বে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পার্‌লেই সকল সমস্যার ব্যূহচক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে সে।

আজকাল, সেই নেশাই তাকে পেয়ে ব'সেছে। ঘরে যখন থাকে তখন সেতার আর মেয়ে অনিতাই হয় তার সাথী। বাকী সময়টুকু সে ঘুরে ফিরে বেড়ায় সহরের এদিকে ওদিকে। গুণগ্রাহী ভক্তের অভাব তার নেই—নিশ্চিন্তে সময়টা যায় কেটে। সেই সঙ্গে মনের ওই জমাট বাঁধা অনড় বেদনার বোঝাটাও হাল্‌কা হ'য়ে আসে।... জীবনের যত শান্তি, অশান্তি, সুখ-স্মৃতি ও বেদনার কুজ্ঝটিকা ওই একটি বস্তুকে কেন্দ্র ক'রেই ত' মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে! তাই তার প্রত্যক্ষ অনুভূতিটাকে ভুলে থাকার জন্য, মানুষের জীবনে এত আয়োজন—এত প্রয়োজন।

মরমীপ্রকাশ আজকাল নিয়মিত বাইরের জলসায় যোগ দেয়। বিনা পারিশ্রমিকে আগ্রহশীল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়। ঘরের আকর্ষণ তার প্রায় মুছে এসেছে বলাই চলে। যতটুকু তার প্রয়োজন তার বেশী সে সেখানে থাকৃতে পারে না, মনও তার চায় না।

মীরা ঘোর সংসারী। ছেলেকে কেন্দ্র ক'রেই সে ভুলেছে নিজের সকল সত্ত্বা। ভুলেছে জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতার আশা ও আকাঙ্ক্ষা। তারই আয়োজন ও প্রয়োজনে কখন যে কেটে যায় সময়, সে কথা উপলব্ধির অবকাশ পায় না সে সহসা। ক্লান্তিতে যখন দেহ-মন আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে, চোখের পাতাগুলো যখন বুজে আসে আপনা থেকে, তখনই সে নেয় বিশ্রাম। তার পূর্ব্বে অবসর সে পায় না কোনমতে। তার ফাঁকে স্বামীর আহার, বিহার ও স্বাচ্ছন্দতার ব্যবস্থাও সে করে। কখনও বা ক্লান্ত স্বামীর পাশে বসে মৃদু ব্যজন করে, কখনও বা গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়, কখনও বা তার মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে মমতা ভরা কণ্ঠে অনুযোগ করে—সারা দিন টো টো ক'রে কোথায় ঘুরে ফিরে বেড়াও বলো ত ? শরীরটা যে মাটি হ'য়ে যাচ্ছে ! একটু বিশ্রাম না নিলে চলে কি কখনও !

এই কয়টি কথাই সে শিখেছে জীবনে। তার বেশী কোন কথা শোনেনি মরমীপ্রকাশ। তবুও ভাল লাগে তার। বোঝে, এগুলো কারও শেখানো কথা নয়, তার নিজস্ব অন্তরেরই বাণী। তাই তার প্রতিটি কথার সুরে মর্ম্ম-স্পর্শী একটা প্রীতি, সৌহার্দ্দ ও মমতার ঝঙ্কার ভেসে উঠে মরমীপ্রকাশের হৃদয়টাকে অকারণে আলোড়িত করে বারে বারে।

ক্ষণিকের সুখ ! তবুও ভাল লাগে। মনে হয় বার বার শুনলেও পুরাণো হবে না কোনদিন। তাই অকারণেই ঠোঁটের পাতা দুটো আপনা থেকে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। অনির্ব্বচনীয় একটা তৃপ্তির আমেজে অন্তরটা তার উদ্বেলিত হয় কয়েক মুহূর্ত্তের তরে।...

মীরা অভিমানে ভেঙে পড়ে। বলে—একটি কথাও কি মন দিয়ে শুনবে না কোনদিন ? যেদিন ম'রে যাবো, সেদিন বুঝবে ! আর বার বার বিরক্ত ক'রতে আসবো না কোনদিন।

প্রাণটা দুলে ওঠে মরমীপ্রকাশের। সত্যই ও বস্তু সে কামনা করে না। নিবিড় ক'রে সেও ভালবাসে তাকে! কিন্তু অতি ভাল ব'লেই ত তার এত খেদ, এত দুঃখ, এত বেদনা।

আদরে তাকে নিবিড় ক'রে কোলের কাছে টেনে নেয় মরমীপ্রকাশ। বলে—ছিঃ, ওকি কথা মীরা! আমি কি তাই চাই? তুমি কি জানো না, তুমি ছাড়া এ সংসারে আমার কোন মূল্য নেই! কিন্তু কার কথা শুন্‌বো বলো? যে প্রাণ খুলে একটি কথাও ব'ল্‌লো না কোনদিন, যে মন খুলে জানালো না তার অন্তরের বেদনা কোথায়, যে জানে না কলহ কাকে বলে—তার কাছে দুটো কথাই ত শুন্‌তে ছুটে আসি বার বার। সে কি মন খুলে কোন কথা ব'ল্‌বে কোনকালে? বলো না মীরা, কোথায় তোমার বেদনা! তা কি জীবনের বিনিময়েও দূর ক'র্‌তে পার্‌বো না কোনদিন?

কি যে বলো! সেই চির পরিচিত মৃদু হাসি ফুটে ওঠে তার ঠোঁটের পাতায়। বলে—ওগো বিশ্বাস করো, সত্যই কোন অভিযোগ, কোন গোপন ব্যথা লুকিয়ে নেই আমার অন্তরে। বরং এ কথাই জোর দিয়ে আজ ব'ল্‌তে পারি—কোন নারী কি এত সুখ ও শান্তি জীবনে তার পেয়েছে কোন দিন? না—না—এর বেশী আমি চাই না, এর বেশী চাহিদাও আমার নেই। তোমাকে পেয়ে, তোমার এ সংসারে বাস ক'রে যত সুখ পেয়েছি, তার বেশী কি কেউ দিতে পার্‌তো কোনকালে।

কি জানি! নীরবে বসে বসে ভাবে মরমীপ্রকাশ। মানুষের মনের ব্যথা যে কোথায়—কে জানে! শুধু কি পেয়েই সে তৃপ্ত! না—না—ঠিক তা নয়। কিছু তার বহিঃপ্রকাশও চাই—নইলে যে সে চির অপূর্ণতার জের ব'য়ে চলে সারা জীবন। তাই ত মানুষ শত প্রাচুর্য্যের মধ্যে বসবাস ক'রেও নীরবে ফেলে দীর্ঘশ্বাস—এর শেষ কি আছে কোনদিন?···

*　　*　　*　　*

মীরা প্রথম পরিচয়ের দিনে মনে যে আঘাত পেয়েছিল, সেই ব্যথা আজ আর তার মনে অনড় ও অচলের মত সজাগ হ'য়ে ব'সে নেই সত্য, কিন্তু অবচেতন মন থেকে তার স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায় নি। তাই শত চেষ্টা সত্বেও ঠোঁটের পাতায় তার বুকের ভাষা রূপ পায় নি আজও। সে নিজের আবর্ত্তে নিজেই ঘুরপাক্ খেয়ে, নিজের অপ্রকাশিত ব্যথায় আপনি জর্জ্জরিত হ'য়েছে এতদিন। অকারণে তার যৌবনে নেমেছে বার্দ্ধক্যের স্থবিরতা। কিন্তু তার শুদ্ধ ওই বুকের ভাষা সন্তান-রূপ ধারণ ক'রে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে এ বাস্তবের পীঠ-ভূমিতে। তাই তাকে বুকে তুলে নিয়েই মীরা নোতুন ক'রে উপলব্ধি ক'র্লো তার নিজস্ব সেই হারানো সত্বাকে। রোমাঞ্চিত হ'ল দেহ-মন। ভুলে গেল সে নিজেকে। কবে কোন্ শিশুকালে প্রকৃতির আকর্ষণে পেতেছিল, ধুলো-বালির সংসার। সেই আশা মূর্ত্তিমতী বাস্তব রূপ নিয়ে যখন তারই দ্বারে এসে দিল ধর্ণা, তখন সে কি আত্মবিস্মৃতির পথে নিজেকে বিসর্জ্জন না দিয়ে স্থির থাকৃতে পারে একটি মুহূর্ত্ত ?

আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের আকৃতি ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে নিজেই মুগ্ধ হয় মানুষ, আর সেই জীবনের আশা ও স্বপ্ন যখন বাস্তব রূপ নিয়ে নেমে আসে ধরায়, তার বিস্ময় বিমুগ্ধ সে মোহিনী রূপ দেখে, মানুষ যদি আত্মবিস্মৃত না হয়, তবে মুগ্ধ হ'বে সে কিসের প্রয়োচনায় ? এমন কি বস্তু আছে এ বন্ধুর জগতে, যা ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারে নিজের অস্তিত্ব, মুছিয়ে দিতে পারে জীবনের দুঃখ ও বেদনার ইতিহাস !

অর্থ ! না—শান্তি নেই সেখানে। মোহ—সেও ভেঙে যায়। সুখ !—সেও অসার। তবে ?

নির্ম্মল আনন্দ ! যার মধ্যে মানুষ হারিয়ে ফেলে নিজেকে। যেখানে ব্যথা নেই, দুঃখ নেই, আক্ষেপ নেই—আছে শুধু অনাবিল

আনন্দ। যা আজীবন পান ক'রেও মানুষের জীবনের আশা মেটে না কোনকালে। নিজেকে রিক্ত ক'রেও যেখানে দুঃখের রূঢ় পরশ উপলব্ধির অবসর আসে না জীবনে। সেই অনাবিল আনন্দের প্রতিমূর্তিই হ'ল সন্তান! তার সুখপরশ পেয়েই ক্ষুদ্র নারী হৃদয় পরিণত হ'ল মাতৃ-হৃদয়রূপী অনন্ত সাগরে।

সেই অমৃতের স্বাদ পেয়েছে মীরা। তাই আজ সে স্থির ও গম্ভীর। তাই আজ আর নেই ক্ষোভ, নেই বেদনা—নেই অভিমান। সে ভুলেছে নিজেকে।...

ধ্যান-গম্ভীর পুরুষ প্রকৃতি। নীরস তার জীবন সাধনা। তাকে মোহমুগ্ধ করে প্রকৃতি, নিজ স্বার্থ সিদ্ধির গোপন বাসনায়। অন্তরে দেয় তার সৃষ্টির প্রেরণা।

সেই সৃষ্টি যবে হয় পূর্ণ, প্রকৃতি হয় স্থির। কিন্তু অচঞ্চল সেই রূঢ় পুরুষ প্রকৃতি, ক্ষণিকের মোহ-সুখে হারালো নিজেকে। মুছে গেল তার হৃদয়ের স্থৈর্য্য। আলোড়িত হ'ল সে চঞ্চল আবেগে। সৃষ্টির নেশায় হ'ল সে দিশেহারা।

যে চাঞ্চল্য ও উচ্ছাস ধারায় তার হৃদয় হ'ল বিচলিত, যার মোহ-মাদকতায় অনুভব ক'রলো হৃদয়ের স্পন্দন—যাকে সে নিবিড়তর ক'রে উপভোগের আশায় হ'ল মুখরিত, সেই ব্যর্থতার প্রতিঘাতে জর্জ্জরিত হ'ল সে প্রতিটি মুহূর্ত্তে। তাই, আশাহত এই পুরুষ প্রকৃতি শুধু বিক্ষুব্ধ হ'ল না—কেন্দ্রীভূত এই ঘরের মোহ তার চূর্ণ হ'য়ে গেল চিরতরে। অনন্ত তার সৃষ্টির প্রেরণা। তারই আবর্ত্ত—করে তাকে ঘর ছাড়া—গড়ে তুলে বহির্মুখী।

মরমীপ্রকাশও সহসা প্রকৃতির সেই সহজাত আকর্ষণকে উপেক্ষায় উড়িয়ে দিতে পারলো না। বিশ্বের মোহিনীরূপ, তার সহজ আত্মপ্রকাশের পথে তাকে প্রলুব্ধ করে বারে বার।

যে ধ্যান ও ধারণায় সে ছিল মগ্ন; যার আকর্ষণ ছিল তার জীবনের একটি মাত্র আরাধ্য বস্তু—সেই আকর্ষণটুকুও ধীরে ধীরে শিথিলতর হ'তে সুরু হ'লো। ফলে—নিয়ম নিষ্ঠাটাই পেল প্রাধান্য। মজ্জাগত সংস্কারের মত—তারই বোঝা ব'য়ে চ'ল্‌লো সে নীরবে। নিয়ম মাফিক যন্ত্রখানা নিয়ে বসে। কলের পুতুলের মত সাধনাও ক'রে কিছুক্ষণ কিন্তু বাঁধনহারা মনটা তার কিছুতেই স্থির হ'তে চায় না। তাই সে বহিঃজগতের আশ্রয় নেয়। খুঁজে বেড়ায় পথের দিশা। যদি শান্তি কোথাও মেলে এতটুকু! প্রতিটি গানের মজ্‌লিশে সে যোগ দেয়। গুণগ্রাহীর সংখ্যাও বাড়ে সেই মত। তার ফাঁকে যশের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। ফলে প্রতিষ্ঠা তার বাড়ে কিন্তু তবুও তার অন্তর পায়না তৃপ্তি! সেই একঘেয়ে অসোয়াস্তি—সেই অতৃপ্তির অসহনীয় জ্বালায় চিত্ত তার হয় বিচলিত। কি যে সে চায়—কে জানে?···

* * *

বিজয়া সম্মিলনীর মজলিশে, মরমীপ্রকাশের আলাপ হ'ল প্রতিবেশী মৃদঙ্গকুমারের সঙ্গে। জজের ছেলে। অগাধ তার প্রতিপত্তি। ঘটা ক'রে এই মিলনোৎসবের আয়োজন ক'রেছিল সে নিজেই। তার আড়ম্বর ও প্রাচুর্য্য-সম্ভারে সারা সহরটি মুখরিত হ'য়ে উঠলো কয়েক দিনের মত। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির হ'ল সমাগম। বহু খ্যাতনামা শিল্পীর হ'ল সমাবেশ। কিন্তু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'র্‌লো মরমীপ্রকাশ।

উৎসবের হৈ চৈ থেমে গেল। মৃদঙ্গকুমার একটু নির্জ্জন স্থানে তাকে ডেকে এনে ব'ল্‌লো, বহুদিনের ইচ্ছা—একটু গান বাজনা শিখি; যদি আপনি একটু দয়া করেন তা'হলে সত্যই উপকৃত হবো আমি।

মরমীপ্রকাশ চায় একটা কাজ। তারই মধ্যে ডুবে থেকে, আর কিছু না হোক নিজেকে ত ভুলে থাক্‌তে পার্‌বে সে কিছুক্ষণ! রাজী হ'ল সহজেই।

উভয়ের বাড়ী খুবই কাছাকাছি। মাত্র কয়েক শত গজের ব্যবধান। মরমীপ্রকাশ অবসর সময় মত আসে। মৃদঙ্গকুমারকে সেতার শেখায়। একটু গল্প-গুজব করে।—তারপর লঘু জলপানে আপ্যায়িত হ'য়ে ফিরে যায় সে নিজের কাজে।

এমনি ক'রে কেটে গেল একটি মাস। সহসা মৃদঙ্গকুমার আলাপ করিয়ে দিল তাঁর কনিষ্ঠা মনীষার সঙ্গে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্রী। হাসি মুখে মৃদঙ্গকুমার ব'ল্‌লো—মা সরস্বতী আমার প্রতি বিমুখ হ'লেও আমার বোনটি কিন্তু বংশের মুখ রক্ষা ক'রেছে মরমীপ্রকাশদা! তাছাড়া—আমার ত ওই একটি মাত্র বোন—মা-বাবার ভীষণ আদুরে। মানে একটু বেশী স্বাধীনা—চলে নিজেরই খুশী মত।

মনীষা বাধা দিয়ে ওঠে—সব সময়েই তুমি একটু মাত্রা ছাড়িয়ে চলো দাদা।

কখনও না। মৃদু কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে মৃদঙ্গকুমার ব'ল্‌লো—হ্যাঁ, এবার আসল কথায় আসা যাক, মরমীপ্রকাশদা। ওর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ পরিচয় না ঘটলেও ও কিন্তু আপনার বিশেষ অনুগত একটি ভক্ত। গান অবশ্য নিজেও শিখে; একজন শিক্ষকও আছেন। তবুও এ সময়টা ওই চিকের আড়ালে বসে একমনে শোনে আপনার এই সুরের খেলা। তাই ভাব্‌লাম—গুরুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া উপযুক্ত শিষ্যের কর্ত্তব্য।

একটু টেনে মৃদঙ্গকুমার মনীষার মুখের দিকে চেয়ে হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—বল্‌ না এবার বাড়িয়ে ব'লেছি কি একটিও কথা?

উত্তরে মনীষা মৃদু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো, সত্যই অপরূপ আপনার হাত। কাণে ও সুর গেলে একটি মুহূর্ত্তও স্থির থাকা যায় না। যদিও রক্ত-মাংসে গড়া আমরা এ পৃথিবীর মানুষ, তবুও সে সুর ভুলিয়ে দেয় এই রূঢ় বাস্তবের নির্ম্মম বোঝার কথা। টেনে নিয়ে যায় কোন এক সুদূর প্রান্তে—হারিয়ে ফেলি নিজেকে।

উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠের স্বর বোধ করি নিজের কাণেই যেন একটু বেসুরো বাজে। নিজেকে সংযত ক'রে তোলে মনীষা। মৃদু হাসি ঠোঁটের পাতায় যুক্ত ক'রে তারই ফাঁকে ব'লে ওঠে, যখন আপনার বাজনা থেমে যায়—মনটা একটা অজানা ব্যথায় ভরপূর হ'য়ে ওঠে। ভাবি—এ সুরকে কি আরও একটু বেশীক্ষণ ধরে রাখা যেতো না? কিন্তু তন্ময়তা আমার নির্ম্মম আঘাতে চূরমার ক'রে দিয়ে যায়—পাশের ওই দেওয়াল্‌-ঘড়িটা। বুঝ্‌লেন—পুনরায় একটু টেনে মৃদু হাস্‌লো মনীষা। ব'ল্‌লো—যন্ত্রটা বাস্তবের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি কিনা—তাই হৃদয়ে এতটুকুও রস-কস ওর নেই—কেবল টিক্‌, টিক্‌—আর টিক্—আর মাঝ পথে যেন কার ঘুম ভাঙানো গান—ঢং—ঢং—ঢং···

ঠিক শিশুর মত খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌লো মনীষা। ব'ল্‌লো—বুঝ্‌লেন, ওরা মানুষের হৃদয়ের মর্ম্ম বুঝ্‌বে না কোনকালে।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিল মৃদঙ্গকুমার, জানেন আরও একটা মজার কথা—

মরমীপ্রকাশ সজাগ হৃদয়ের স্পন্দন স্পষ্টই অনুভব ক'রে চলেছে নিঃশব্দে—তবুও মনে হ'ল এতক্ষণ বসে বসে বুঝি বা সে স্বপ্নই দেখে এলো! এর চেয়েও মধুর ও নয়নাভিরাম রূপ দেখেছে সে জীবনে—কিন্তু এমন সজীব, এমন মুখর প্রাণপূর্ণা মূর্ত্তি জীবনে দেখেনি সে কোনদিন। কথা ত নয়—যেন সুরের মূর্চ্ছনা। হাসি ত নয়—যেন

স্বর্গ থেকে ঝরে পড়া ফুটন্ত গোলাপ। তার চেয়েও মধুময় তার টানা ভাসা চোখের দুটো ওই গভীর কালো তারা। প্রাণের স্পন্দনে মুখর ও সজীব তার রূপ। চকিতে ভুলিয়ে দেয় এই বিশ্বের মায়া—টেনে নিয়ে যায় কোন্ এক সুদূর অজানা দেশে। যদিও গায়ের রংটা তার উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণা—তবুও নিটোল পাথর-কোঁদা তার উদ্ভাসিত যৌবন যেন প্রতিটি স্পন্দনে হাতছানি দিয়ে ডাকে—ওরে আয়—আরও কাছে আয়,—ভরিয়ে নে তোর ও হৃদয় কুম্ভখানা।···

মৃদঙ্গকুমারের ডাকে স্বপ্ন-ঘোর টুটে যায় মরমীপ্রকাশের। সচকিত হ'য়ে চোখ মেলে তাকালো সে মৃদঙ্গকুমারের মুখের দিকে ফিরে।

মৃদঙ্গকুমার মৃদু হাস্‌লো পুনরায়। ব'ল্‌লো—আপনার সঙ্গে বাজিয়ে আপনার দেওয়া সুর খাতার পাতায় সযত্নে টুকে রেখেও—যে বস্তুটা আয়ত্বাধীনে হ'ল না সহজে—দেখি ও পোড়ারমুখী নিজের হাতে বসে বসে বাজায় সেই সুর। চমৎকার ওর অনুকরণ শক্তি—তার চেয়েও তীক্ষ্ণ ওর মেধা।

মনীষার কণ্ঠে সলজ্জ ক্ষীণ প্রতিবাদের সুর ভেসে উঠ্‌লো—না-না মরমীপ্রকাশদা—বিশ্বাস ক'র্‌বেন না দাদার কথা! চিরদিনই বাড়িয়ে বলা ওর স্বভাব।

মৃদু হাসলো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লো—এতে লজ্জার কিছু নেই মনীষাদেবী! এটাও একটা প্রতিভা। মৃদঙ্গবাবু কি তা' অস্বীকার ক'র্‌তে পারেন?

হেসে উঠ্‌লো মৃদঙ্গকুমার। ব'ল্‌লো—না মরমীপ্রকাশদা' আমার স্বভাবটা বরং একটু উল্‌টো ধরণের। জীবনে বিশ্বাস আর স্বীকৃতি ছাড়া আর তৃতীয় ত্রুটি পাবেন না সহজে।

হাসিতে ফেটে পড়্‌লো মনীষা। মরমীপ্রকাশও প্রাণখুলে হা'স্‌লো

এই প্রথম। ব'ল্লো—আর না—অনেক বেলা হ'য়ে গেছে, এবার ওঠা যাক্—কি বলেন মৃদঙ্গবাবু?

তা' একটু হ'ল বই কি! গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল মৃদঙ্গকুমার। ব'ল্লো—কিন্তু···একটা গুরুতর অভিযোগ আছে শিষ্যের তরফ থেকে।

সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালো মরমীপ্রকাশ!

মিঠে স্বরে অভিযোগ জ্ঞাপন ক'র্লো মৃদঙ্গকুমার। প্রায় একমাস হ'তে চ'ল্লো আমাদের পরিচয়—তার ওপর আপনি আমার শিক্ষা গুরু, আর ওই 'বাবু' শব্দটা অলঙ্কাররূপে নাই বা জুড়্লেন নামটার পিছনে।

ওঃ এই কথা! হেসে উঠ্লো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্লো, বয়সে পরিচয় হ'লে একটু সম্মান দিতে হয় বইকি!

দোহাই গুরুদেব—সম্মানের চেয়ে বন্ধুত্বের মূল্য যে অনেকখানি বেশী! যদিও বয়সে আমরা প্রায় সমবয়সী, তবুও সম্পর্কটা আমাদের উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ ক'রে গেছে। তাই ব'লছিলাম—শুধু মৃদঙ্গ ব'লে ডাক্তে যদি দ্বিধা বোধ করেন—কুমার কথাটা না হয় যোগ ক'রে দেবেন!

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্লো মনীষা। ব'ল্লো,না—না মরমীপ্রকাশদা' আপনি বরং কুমার সাহেব ব'লেই ডাক্বেন। মাঝে মাঝে ওঁর বন্ধুবান্ধবের দল ওই নামে ডাক দিয়ে থাকেন। দেখে শুনে মনে হয়—উনি শুনেও যেন বেশ একটু খুশী বোধ করেন।

সেও বরং ভালো। মৃদু হাস্লো মৃদঙ্গকুমার।

মরমীপ্রকাশও সে হাসিতে যোগ দিল। ব'ল্লো, বেশ তাই হ'বে।

অভিযোগ আরও একটা আছে! একটু গম্ভীর স্বরে ব'লে উঠ্লো মৃদঙ্গকুমার।

নোতুন কিছু কি? মরমীপ্রকাশের চোখে মুখে গভীর বিস্ময়।

না—গুরুত্ব তা'র তেমন কিছু নয়! শুধু ব'ল্ছিলাম—উনি, মানে

আমাদের মনীষা, দেবী নন মানবী! কাজে কাজেই মনীষা ব'লে ডাক্‌লে কি ভাল শোনায় না?

স্মিতহাস্যে উত্তর দিল মনীষা—নিশ্চয়! আপনি আমায় মনীষা ব'লেই ডাক্‌বেন মরমীপ্রকাশদা'। কিন্তু—নামটা আপনারও বেজায় বড়—আমি প্রকাশদা' বলেই ডাক্‌বো কিন্তু!

বেশ, বেশ তাই হ'বে! হাসি মুখে নেমে দাঁড়ালো মরমীপ্রকাশ।...

মৃদঙ্গকুমারের মা, অনুসূয়া দেবী সেকালের মানুষ হ'লেও যথেষ্ট শিক্ষিতা, বিশেষ ক'রে উচ্চ হৃদয়-সম্পন্না। তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই মরমীপ্রকাশকে আদর-যত্নে একান্ত আপনার ক'রে নিলেন। মরমীপ্রকাশও তাঁর সঙ্গে 'মাসীমা' সম্পর্ক স্থাপন ক'রে সেই প্রীতির বাঁধনকে আরও দৃঢ়তর ক'রে তুল্‌লো।

যদিও পরস্পরের সঙ্গে রক্তের কোন নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল না, সামাজিক প্রথায় জাতি ও বর্ণের ব্যবধানটা ছিল সুদূরপ্রসারী, তবুও হৃদয়ের আন্তরিকতা ও প্রীতির মাধুর্য্যে উভয়ের মধ্যে গ'ড়ে উঠেছিল এমন একটা অভিন্ন-হৃদ্যতা, যার মূল্য লৌকিক রক্তের বাঁধনের চেয়েও কোন অংশে হীন ত নয়ই বরং আর একটু গভীর ও নিবিড় বলা যেতে পারে অনায়াসে।

মরমীপ্রকাশের হাজিরাখাতায় হয়ত কোন কারণে একদিন একটু ইতর বিশেষ দেখা গেল। অনুসূয়াদেবী বিচলিত হয়ে ওঠেন সেই মুহূর্ত্তে। অকারণ শঙ্কায় ব্যাকুল হ'য়ে মৃদঙ্গকুমারকে বার বার তাগিদ্‌ দেন, যা না মৃদঙ্গ, একবার খবর নিয়ে আয় না! ছেলেটা এখনও এলোনা কেন?

ঘরের বাইরে নিজ প্রয়োজন ব্যতিরেকে পা দেওয়ার অভ্যাস ছিল না মৃদঙ্গকুমারের। মার অনুরোধ এড়ানো অসম্ভব প্রায়—অথচ কোন না কোন একটা অছিলায় ঘরেও বসে থাকা যায় না সহজে।

অস্বোয়াস্তি ও বিরক্তিতে মনটা তার তিক্ত হ'য়ে ওঠে। অনুসূয়া-দেবী তার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝ্‌তে পারেন তার অন্তরের কথা। তবুও মুখে হাসি ফুটিয়ে বলেন—ওরে বুঝিস্‌নে, ও যে আমার আর একটা ছেলে—ঠিক তোদেরই মত! নইলে অকারণে ওর জন্যই বা মনটা এত ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে কেন, বল?

মৃদঙ্গকুমারও মরমীপ্রকাশকে যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। গুণী শিল্পী তিনি। সাধারণ মানুষের অনেক উপরে তাঁর স্থান। তার উপর একাধারে তিনি গুরু ও অন্তরঙ্গ বন্ধু—অথচ মার এই অহেতুক শঙ্কার কারণও খুঁজে সে পায় না কোনদিন। একটা লোককে নিয়মিত আস্‌তেই—হবে! এতটুকুও ইতরবিশেষ হওয়ার উপায় থাক্‌বে না—এও কি সম্ভব কোনদিন! কাজেও ত মানুষ আট্‌কে প'ড়্‌তে পারে! কিন্তু যারা সব কিছু বুঝেও বোঝেনা তাদের কি বোঝানো যায় কোনকালে? তারা বুঝেও অবুঝ, এটাই তাদের প্রকৃতি! বিরক্তি পুঞ্জিভূত ত হয় সেখানেই!

অনুসূয়া দেবী কিন্তু নির্ব্বিকার। তিনি ব'লে চলেন—তোরা অকারণ রাগ করিস্‌ মৃদঙ্গ। বুঝিস্‌নে, মার অন্তরের বেদনা! মা হ'লে বুঝ্‌তিস্‌, কেন ব্যাকুল হই! ওরে অবুঝ ছেলে, সে যে আমায় মা বলে ডাকে! তাই ত' ভাবনা এত আমার—

মনীষাও মার সঙ্গে যোগ দেয়। বলে, সত্যই যত দিন যাচ্ছে, তুমি ততই বদ্ধ কুড়ে হ'য়ে উঠ্‌ছো দাদা! মার জন্য এতটুকু কষ্টও কি স্বীকার ক'রতে পারো না! যে লোকটা প্রতিদিন আসে, তার জন্যে চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক—কেন এলো না—শরীরও ত তাঁর খারাপ হ'তে পারে!

শেষ পর্য্যন্ত তুইও পিছু লাগ্‌লি মনীষা! অপ্রকাশিত বিরক্তির মূর্চ্ছনাটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো। একে মাকে নিয়ে

পারি না, তার উপর তুই—না, আমার গান শেখা আর হ'ল না দেখ্‌ছি!

বুড়ো বয়সে আবার গান শেখা যায় নাকি?

কি ব'ল্‌লি? মৃদঙ্গকুমার ক্রোধে ফুলে উঠ্‌লো।

এতটুকুও কিন্তু বাড়িয়ে বলিনি। যার গুরুভক্তি নেই—সে কি কোন কিছু ভাল ক'রে শিখ্‌তে পারে কোনদিন?

আমার গুরুভক্তিতে সন্দেহ? বটে—

মৃদঙ্গকুমার সক্রোধে বেরিয়ে প'ড়্‌লো পথে। কয়েক মিনিট পরে ঘুরে এসে ব'ল্‌লো, শান্ত হও মা—তিনি এই এলেন বলে।

মনীষা গম্ভীর হ'য়ে ওঠে। জিজ্ঞাসা করে—এতক্ষণ আসেননি কেন তবে?

পুঞ্জীভূত মনের ক্রোধটা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। বলে, জবাবদিহি আর দিতে পারিনা বাবু। দোহাই তোমাদের একটু চুপ করো—এখন রেওয়াজ একটু করে নিই। নইলে, এসেই সুরু ক'রে দেবেন, তৈরী হয়নি এখনও? সেও ত কম ঝামেলা নয়! সেতারের তারে কয়েকবার আঁচড় দিয়েই মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো মৃদঙ্গকুমার—আস্‌ছে রে আস্‌ছে! তুই বরং ততক্ষণ একটু জল চড়িয়ে দে। তোদের জন্যে এতখানি পথ ছুটে গেলাম আর এলাম—কত পরিশ্রম হ'ল ব'ল্‌তো? এবার বড়দা' ব'লে একটু আদর যত্ন কর্।

দিনে ক'বার চা খাবে শুনি?

এই ত মুস্‌কিল! একটু নরম সুরে মৃদঙ্গকুমার ব'ল্‌লো, বেচারী দাদা খাটবে, আর তার জন্যে বুঝি এতটুকু কষ্ট স্বীকার করা চলে না? একটু গরম জল পেটে না গেলে কাজে যে আমি মন বসাতে পারি না!—বার বার কি একটি কথা ব'ল্‌তে ভাল লাগে কারও? নে, নে চট্‌পট্‌—মরমীপ্রকাশদা' এসে প'ড়্‌লো ব'লে।

না, না—ওসব বাজে ওজর আমার কাছে চ'ল্‌বে না। মিথ্যে কথা ব'লে মা'র মন গলাতে পারো—আমাকে ঠকাতে পার্‌বে না। সত্যি ক'রে বলতো—গিয়েছিলে, না একটু ঘুরে ফিরে এসে অম্লান বদনে মিথ্যা কথাগুলো সত্যের ভানে চালিয়ে দিলে—এই এলো ব'লে!

ক্রোধে লাল হয়ে উঠ্‌লো মৃদঙ্গকুমার। জোরে সেতারখানা নামিয়ে রেখে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—না, না, কিছুতেই হবে না।

অনুসূয়াদেবী ছুটে এলেন পাশের ঘর থেকে। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, কি হল? কি হবে না?

উঠে দাঁড়ালো মৃদঙ্গকুমার! হবেনা—কিছুতেই হবে না। না—না—না—

না—না ক'র্‌ছিস্ কেন? অনুসূয়াদেবীর কণ্ঠে বিস্ময়ভরা সুর।

ব'ল্‌ছি ত' হবে না—গান শেখা হবে না কিছুতেই।

ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত সদর্পে পদচারণা সুরু ক'রে মৃদঙ্গকুমার।

খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে মনীষা। বলে—কথাটা কিন্তু এতটুকুও মিথ্যে নয়! গান তোমার শেখা হবে না।

কি ব'ল্‌লি? হবে না? তবে রে—

সক্রোধে নিজের আসনে ফিরে এসে ব'স্‌লো মৃদঙ্গকুমার। পুনরায় তুলে নিল সেতারখানা।

অনুসূয়াদেবী হতবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি জন্য যে কলহ, আর কিই বা যে তার প্রয়োজন—সঠিক বুঝে উঠতে না পেরে তিনি জিজ্ঞাসা ক'রে উঠ্‌লেন—হ্যাঁরে, তোদের হল কি?

হ'বে আর কি! গর্জ্জে উঠ্‌লো মৃদঙ্গকুমার। তোমার মেয়ের সঙ্গে আর পারি না। যত সব জঞ্জাল—বার বার বলি, দূর করো মা—দূর করো…কিন্তু—

কিন্তু কি কুমার সাহেব? সহাস্যে সামনে এসে দাঁড়ালো মরমী-প্রকাশ।

মৃদঙ্গকুমারের উত্তপ্ত মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে বরফ জলে পরিণত হ'ল। ব'ল্লো—এই দেখুন না, আপনি অকারণ দেরী ক'র্লেন, মার আমার চিন্তার শেষ থাকে না, মনীষাও দেবে সেই সঙ্গে যোগ। ফলে—

হেসে ওঠে মরমীপ্রকাশ—ছুটতে হবে তোমাকে। ঠিক সত্য কিনা?

তা কেন—তা কেন? আম্‌তা আম্‌তা ক'রে মাথায় হাত বোলায় মৃদঙ্গকুমার। বলে—একবার কেন, হাজার বার আপনার বাড়ী যেতে রাজী আছি আমি, কিন্তু—

মনীষা সহাস্যে পাশে এসে দাঁড়ালো। মৃদঙ্গকুমারের টেবিলের উপর বিরাট একটা কাপ সশব্দে নামিয়ে রেখে ব'লে উঠ্‌লো—আর কেন? মনটা এবার তাজা ক'রে ফেলো।

মৃদঙ্গকুমার একটি মুহূর্ত্তও অপব্যয় ক'র্লো না। সঙ্গে সঙ্গে কাপে একবার চুমুক দিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—আঃ! সত্যই তোর মত দরদী বোন জগতে কারও নেই মনীষা! বুঝ্‌লি নে, তাইতো তোর সঙ্গে অকারণে ঝগ্‌ড়া করি। কিন্তু মরমীপ্রকাশদার কই? তুই কি রকম ভদ্রলোক বল্‌তো!

ভদ্র বা অভদ্র সে আমি বুঝ্‌বো—তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?

বা—রে! আমি খাবো—আর সামনে একজন চুপচাপ বসে থাকবেন—

হ্যাঁ, থাক্‌বেন! আল্‌বাত্‌ থাক্‌বেন। একবার সকালে চা নষ্ট ক'রেছি, আবার করি! এত দায় আমার পড়ে নি। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে মরমীপ্রকাশের হাতে লুকানো কাপ্‌টা তুলে দিয়ে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ ক'রে ব'স্‌লো মনীষা, যার দায় সেই করুক। আমার ত' গুরু নন্—গানও আমি শিখিনা।

সহাস্যে কাপে চুমুক দিয়ে মরমীপ্রকাশ ব'লে, গান! আজকাল কি কুমারসাহেব গানও শিখ্‌ছেন নাকি?

ফিরে দাঁড়ালো মনীষা। ব'ল্‌লো, জানেন না—উনি এখন রীতিমত গান চর্চ্চা ক'র্‌ছেন!

জোর দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো মৃদঙ্গকুমার—মিথ্যে কথা।

কখনও না। মা এখনও সাক্ষী র'য়েছেন। আজকাল উনি একাধারে যেমন গাইয়ে, তেমনি বাজিয়ে, অর্থাৎ—নিজের মনেই নিজে গান গান্, অবশ্য সে সুরের লয় বা তান, উনি একা ছাড়া জগতের আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ শুনতে পায় না বা সে সৌভাগ্যও কারও হয়নি!

এতক্ষণে নিজের ভুলটা বুঝ্‌তে পার্‌লো মৃদঙ্গকুমার। মৃদু হাস্যে অনুযোগ ক'রলো, না হয় একটু ভুলই ব'লে ফেলেছি। তার জন্যে এত ব্যঙ্গ ক'রেই বা লাভ কি? শেখাও ত গাওয়ার সামিল! কি বলেন মরমীপ্রকাশদা'?

তা বটে—উচ্চ হাসিতে ফেটে প'ড়্‌লো মনীষা। তবু একটা নোতুন অভিধান রচনা ত ক'রলে! শেখা আর গাওয়া— বাজানো আর নাচা উভয়ার্থে উভয়ই সমান। কি বলেন প্রকাশদা?

মরমীপ্রকাশ নিজেকে গম্ভীর ক'রে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা ক'র্‌লো, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরে, নিজেও হাসিতে ফেটে প'ড়্‌লো ঠিক তারই সুরে সুর মিলিয়ে।

সে হাসিতে যোগ দিলেন অনুসূয়াদেবী—মৃদঙ্গকুমার নিজেও। শেষে, জের একটু সামলে, ব'লে উঠ্‌লো, দোহাই বাপু,- ভুল হ'য়ে গেছে। তা হ'লে এবার আরম্ভ করা যাক্ মরমীপ্রকাশদা'?

পরিবেশের সেই হাল্‌কা হাসি, পরমুহূর্ত্তেই গম্ভীর রূপ ধারণ করে। মরমীপ্রকাশ তুলে নেয় সেতারখানা—কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে ওঠে ভেসে সুরের ঝঙ্কার।...

ধীর ও গম্ভীর হ'য়ে ওঠে মনীষা। চেপে ব'সে সে পাশের চেয়ারটায়। কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে চপলতায় ছিল সে চঞ্চল,—সে মানুষ যেন ম'রে পরিণত হ'ল নোতুন মানুষে। সুরের মূর্চ্ছনায়—গভীর তন্ময়তায় ডুবে গেল সে ধীরে ধীরে।

সুর থেমে যায়। উঠে দাঁড়াল মৃদঙ্গকুমার। কিন্তু ধীর ও স্থির মনীষা ব'সে থাকে তেমনি নিশ্চিন্ত—নীরবে।

সহজ হাস্যে পাশে এসে দাঁড়ালো মরমীপ্রকাশ। মৃদু কণ্ঠে ডাক্‌লো—মনীষা!

চম্‌কে ওঠে মনীষা। অর্থশূন্য অচঞ্চল তার দৃষ্টি। ধ্যান ও গম্ভীর তার চোখের কালো দুটো তারা। কিসের ধ্যানে যে সে নিমগ্ন, কে জানে!...

* * * * *

মরমীপ্রকাশ ফিরে পেয়েছে তার জীবনের শান্তি—স্তিমিত হৃদয়খানা তার ফিরে পেয়েছে নিজেকে। যে সহানুভূতি ও প্রেরণার অভাবে, হৃদয়টা তার চির রিক্ততার বোঝা ব'য়ে বেড়িয়েছিল এতদিন, যার অভাবে, জীবনটা রূপায়িত হ'য়েছিল তপ্ত মরুতে—সেই হৃদয়, আজ তার পরিপূর্ণ। মনীষার সাহচর্য্য, মনীষার সহানুভূতি, মনীষার ভাষা, প্রাণে যোগালো তার নোতুন ইন্ধন। ফিরে পেল সে হৃদয়ে নিত্য নব সৃষ্টির প্রেরণা।

আজ মরমীপ্রকাশ যে সুরের জাল বুনে, তা শুনে তন্ময় হয় সাধারণ মানুষ। তারা স্পষ্টতর ক'রে অনুভব করে হৃদয়ের স্পন্দন। ভুলে যায় তারা—নিজেরই অস্তিত্ব।

মনীষা—সেই চির চঞ্চল মনীষা, আজ স্থির ও ধীর। তার জীবনের উচ্ছ্বাস, আজ গতিশীলা—প্রবাহমানা। রূপকের আবর্ত্তে আজ আর সে মাথা খুঁড়ে মরে না। সে পেয়েছে পথের সন্ধান। তাই তার তর্জ্জন নেই—গর্জ্জন নেই, সে ব'য়ে চলে নীরবে স্রোতস্বতীর মত কুলু কুলু রবে।

নীরবে ব'সে ব'সে শোনে মরমীপ্রকাশ, মৃদু-মধুর সেই গুঞ্জন। দেখে, জাগ্রত যৌবনের মহিমামণ্ডিত রূপ। হৃদয় তার দুলে ওঠে পুলকে। শিরা-উপশিরায় ব'য়ে যায়, সেই নির্ঝরিণীর শীতল পরশ। ভুলে যায় সে নিজেকে…

মনীষার এ পরিবেশ যে ভাল লাগে না, তা নয়—কিন্তু সে জাগ্রতা নারী। হৃদয় তার বেদনায় ভরপুর। তাই কৌশলে, মাঝে মাঝে নিয়ে আসে অনিতাকে। স্মরণ করিয়ে দেয়—ওগো পুরুষ, তুমি গৃহী। ভুলে যেওনা তোমার ধর্ম্ম, তোমার কর্ত্তব্যের সেই গুরু দায়িত্বের মর্ম্মকথা। তারই ফাঁকে মৃদু অনুযোগ ক'রে, অনিতামাকে আমার সঙ্গে ক'রে কেন তুমি নিয়ে আসো না বলতো ?

মরমীপ্রকাশ মৃদু হাসে। বলে, মা যে তোমার ছেলেমানুষ! খেলাঘর সাজাতেই ব্যস্ত অহরহ। আস্‌তে কি চায় সহজে ?

আদরে অনিতার কচি মুখখানা তুলে, সযত্নে আঁচলে মুছে দিয়ে বলে, মুখখানা ঠিক যেন তোমারই প্রতিচ্ছবি! কি সুন্দর, কি কোমল—এ রূপ বলতো! মনে কি হয় জানো ?

উত্তর খুঁজে পায় না মরমীপ্রকাশ। নির্ব্বাক্ তৃপ্তিভরা দৃষ্টিতে মনীষার মুখের দিকে থাকে সে তাকিয়ে।

মৃদু হাসে মনীষা। বলে, এ ছবিখানা যেন হৃদয়ে ধ'রে রাখি যুগ যুগ-একান্ত গোপনে।

মরমীপ্রকাশও হাসিতে যোগ দেয়। বলে, রাখো না!

ইচ্ছা হ'লেই কি রাখা যায়! হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করে, অনিতা মা, থাকবে আমার কাছে ?

অনিতা মাথা দোলায়, হ্যাঁ। তারও বেশ ভাল লাগে মনীষাকে। কত আদর, কত যত্নই না করে সে এই স্বল্প সময়টুকুর ব্যবধানে। তা'

ছাড়া দেয় কত খেল্‌না,—কত রং বে রংয়ের পুতুল! জীবনে তার আজ এর বেশী প্রয়োজন ত কিছু নেই!

তবে আসোনা কেন মা? সহাস্যে প্রশ্ন করে মনীষা।

ঠোঁট ফুলিয়ে অভিযোগ তোলে অনিতা, বারে—বাবাই ত আনে না!

ধরা পড়ে যায় মরমীপ্রকাশ। উত্তরে মৃদু হাসে, প্রতিবাদ করে না।

মনীষা বলে, প্রতিদিন সঙ্গে ক'রে আন্‌তে হবে ব'লে দিচ্ছি কিন্তু! —বুঝ্‌লে?

মরমীপ্রকাশ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। বলে, বেশ তাই হবে। কিন্তু ওর মা প্রতিদিন কি ছাড়্‌তে রাজী হবে?

মনীষা হাসে। বলে, সে ভার আমার, তোমার নয় গো গোঁসাই ঠাকুর।

গোঁসাই? এ নোতুন পদবী আবার সংযোগ হ'ল কবে থেকে? সহাস্যে প্রশ্ন ক'র্‌লো মরমীপ্রকাশ।

গোঁসাই নয় ত কি! হাসে মনীষা। বলে, অমন আত্মভোলা মানুষ দেখা যায় কি সহসা?···

* * * *

পুরুষের জীবনে নেই চঞ্চল আবেগ, নেই তার মধুর মূর্চ্ছনা। তাই নারীর সেই মোহিনী রূপ বারে বারে তাকে করে আকৃষ্ট। তার সেই মোহ মাদকতার উগ্র সুরাপানের তৃষায়—সারাটা জীবন শুধু ঘুরপাক খেয়ে যে আবর্ত্তের সৃষ্টি করে—তারই ঘূর্ণীচক্রে হয় তার সলিল সমাধি। পুরুষের পুরুষত্বের ঘটে অপমৃত্যু। বেঁচে থাকে শুধু দেহ ও মনের ক্ষুধা।

সে মোহটুকু যেদিন যায় টুটে, সেদিন স্থায়ীত্ব লাভ করে ভ্রান্তির অনুশোচনা। প্রতিটি পলে দগ্ধ হয় সে। আর বুক ভেদ ক'রে নেমে আসে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস।

তবুও জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে সেই ভাঙা-গড়ার মোহ। সেই হ'ল তার পারাপারের একমাত্র খেয়া।···

মরমীপ্রকাশ আজ জীবন-প্রাচুর্য্যে ভরপুর। অভাব যেটুকু ছিল, সেটুকু পূর্ণ ক'রে দিয়েছে মনীষা। তবুও তার তৃপ্তি নেই। হৃদয়ে জেগেছে ভয়—যদি হারাই, হারাই তারে, হারাই—

তাই জীবনে তার, জাগলো নোতুন পিপাসা। নোতুন হাহাকার। পরিপূর্ণভাবে সেই কেন্দ্র-বিন্দুটিকে, একান্তে—নিবিড়তরক'রে জীবনে না পেলে জীবন-সাধনা তার পূর্ণ হ'তে পারে কি, কোনদিন ?

চাই—হ্যাঁ, চাই! তাকেই চাই। জীবনে জাগ্‌লো নোতুন বাসনা। হৃদয়কে রাঙিয়ে তোলার জাগ্‌লো উন্মত্ত কামনা। মরমীপ্রকাশের জীবনের কেন্দ্র বিন্দু আজ মনীষা। তাকে নিবিড়তর ক'রে না পেলে, শান্তি সে পাবে না জীবনে, না—না সত্যই অসম্ভব। চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো মরমীপ্রকাশ।

হৃদয়ের গোপন বাসনা তা'র আত্মপ্রকাশের বেদনায় হ'ল ভরপূর। সে খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌লো—এমন একটি নির্জ্জনতম স্থান, যেখানে থাক্‌বে শুধু সে আর মনীষা। যেখানে নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে খুল্‌তে পার্‌বে তার রুদ্ধ মনের দুয়ার।

মনীষারও চঞ্চল প্রকৃতিতে প'ড়ছে ভাটা। অহরহ সে অনিতাকে নিয়েই ব্যস্ত। তার সাজ-পোষাক,—আহার-বিহারের তত্ত্বাবধানেই সারাটিক্ষণ কাটিয়ে যখন সে কাছে এসে দাঁড়ায়, তখন হয় তার ফিরে যাওয়ার সময়। খুশী হয় মরমীপ্রকাশ। কিন্তু উপায় কি! মেয়েটাও যে হ'য়েছে তার একান্ত অনুরক্ত। অথচ তাকে সঙ্গে না নিয়ে এলেও শান্তি নেই উভয়ের। একজন ব'সে ব'সে কাঁদবে সারাক্ষণ—আর একজন মুখ ভার ক'রে ব'সে থাক্‌বে নীরবে। হৃদয় খুলে, তেমনি প্রাণ মাতানো সুরে কইবে না প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটিও বেশী কথা। দ্বন্দ্ব উভয়

স্থলে। অথচ তার হৃদয়ের ব্যথা যে কত গভীর—সে কথা তলিয়ে বোঝার শক্তি বোধ হয় নেই, এ জগতে কারও। দুঃখ ত বাসা বাঁধে সেখানেই।··

* * * * *

আজকাল মরমীপ্রকাশ নির্দ্ধারিত সময়ের বহু পূর্ব্বেই দেয় হাজিরা। মনীষাও তৈরী হ'য়ে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে হাতে তার তুলে দেয়, গরম একটি কাপ চা আর নোন্‌তা কিছু খাবার। সেটা মরমীপ্রকাশের একান্ত মুখরোচক খাদ্য। তারপর গল্প-গুজবে জমিয়ে তোলে সে আসর।

মৃদঙ্গকুমারের সাধনায় নামে বিঘ্ন। মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হয় ক্ষণিক; তার বেশী গ্লানি তার থাকে না মনের পর্দ্দায়। কারণ সে নিজেও যে গল্প-প্রিয় মানুষ। তাই—নীরবে ক্ষতিটাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে যোগ দেয়, সেই গল্পের আসরে।

যখন গল্প জমে উঠে—মনীষা অনিতাকে নিয়ে উঠে যায় নিজের ঘরে। ধীরে ধীরে তার হাতের কাজগুলো শেষ ক'রে নেয় একে একে। তারপর ফিরে আসে সে আসরে। সঙ্গে আসে বেয়ারা—চায়ের কাপগুলো সব সামনে দেয় এগিয়ে।

ঝিমানো আসর আবার তাজা হ'য়ে ওঠে। নোতুন উত্তেজনায় যখন হয় সকলে ভরপুর—তখনই মনীষা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—কই দাদা, তোমাদের বাজ্‌নার আসর ত আজ ব'স্‌লো না! অথচ প্রকাশদা চলে গেলেই দোষ দেবে আমায়। তখন বুঝি নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা মনে পড়ে না?

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মৃদঙ্গকুমার বলে, বেলা অনেক হ'য়ে গেছে। —আজ থাক্, কাল বরং প্রথমেই আরম্ভ করা যাবে কি বলেন মরমীপ্রকাশদা'?

হ্যাঁ—হ্যাঁ। প্রতিদিন এক ঘেয়ে কোন জিনিষই ভাল নয়—কালই দেখা যাবে। মরমীপ্রকাশের কণ্ঠেও ভেসে ওঠে সেই অলস অবসাদের সুর।

মনীষা কিন্তু নির্ম্মম। কোন কাজে অবহেলা তার সহ্য হয় না। বলে—বাজে পরচর্চ্চায় সময়টা অপব্যয় না ক'রে একটু কাজেও ত লাগানো যেতে পারে!

পরচর্চ্চা! মানে? গর্জ্জে ওঠে মৃদঙ্গকুমার।

হাসে মনীষা। বলে—জীবনের আত্মনেপদীর রাজত্বে, দেখা যায় যত কিছু, সবই পরস্মৈপদী—তা ছাড়া আসর ত জমে না! কাজেই যাই চর্চ্চা করো না কেন—সেলি, বায়রণ, কীট্‌স থেকে আরম্ভ করে হোমার, সেকস্পীয়র এমন কি পাড়ার যদো, মধো, সবই পরস্মৈপাদী। তারাই আভরণ—তারাই অলঙ্কার। তারা এলে তবে নিজের রূপ খোলে—সুতরাং কথাগুলো একটুও বাড়িয়ে বলা হয় নি—বুঝ্‌লে!

মৃদঙ্গকুমার পরাজয় স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হয়। এটা তাঁর চিরদিনের রীতি। সেই ছোট বেলা থেকে আজ পর্য্যন্ত কখনও কথায় জয় ক'র্‌তে পারেনি এই মেয়েটীকে। এটা তার জীবনের দুঃখের এবং গর্ব্বের বস্তুও বটে অনেকখানি!

সপ্রতিভ হ'য়ে ওঠে মরমীপ্রকাশ। সে ত জানে দাদা তার উপলক্ষ্য, আসলে তার এই সাময়িক অবসাদে, চাঞ্চল্যের জোয়ার বহানোই হ'ল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই হাসি মুখে তুলে নিল সেতারখানা।

তারের বুকে ভাসে সুর। ঘরখানা ভরে যায় তার মূর্চ্ছনায়। বিমোহিত হ'য়ে শোনে অনুসূয়াদেবী, শোনে মনীষা, আর শিশু অনিতা!···

* * * *

বিমর্ষ মুখে, কক্ষের মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌লো মরমীপ্রকাশ। মাথার চুলগুলো তার উস্কখুস্ক। মুখখানা বেজায় গম্ভীর। তার দিকে তাকিয়েই মনীষা চম্‌কে উঠে। জিজ্ঞাসা ক'রে, শরীর তোমার খারাপ নাকি প্রকাশদা?

ম্লান একটু হাস্‌লো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লো—না ভালই আছি!

তবে? তখনও মনীষার শঙ্কা দূর হয়নি।

মরমীপ্রকাশ পালঙ্কের উপর চেপে স্থির হ'য়ে বস্‌লো কয়েক সেকেণ্ড। তারপর সখেদে ব'লে উঠ্‌লো, কাল রাতে ফিরে দেখি, সেতারখানার তারগুলো ছিঁড়ে রেখেছে অনিতা! রাগের মাথায় মার্‌লাম মেয়েটাকে খুব, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে এমন অনুশোচনা জাগ্‌লো যে, সারা রাত্রির মধ্যে একটি মুহূর্ত্তও নিশ্চিন্তে চোখের পাতা বন্ধ ক'র্‌তে পা'র্‌লাম না। সকালে উঠে শুন্‌লাম মেয়েটার নাকি জ্বরও হ'য়েছে একটু!

ওকে সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন?

ওর মা'র কি ভীষণ রাগ! বলে, না হয় তার একটা ছিঁড়েই ফেলেছে। তাই বলে অমন ক'রে শাসন আবার ক'রে কোন মানুষ? আর দোষই বা ওর কি? আমিই ত সরিয়ে রাখ্‌তে ব'লে ছিলাম! আমাকেই ত দোষী সাব্যস্ত ক'রে মনের রাগটা সুদে আসলে মিটিয়ে নিতে পার্‌'তে! একটু থেমে ব'ল্‌লো মরমীপ্রকাশ বুঝি এবং বুঝলামও। কিন্তু তখন ত রাগটা সামলাতে পারিনি! আর সত্যিকার দোষটা যে কার—সঠিক বলাও সম্ভবপর নয়। কারণ আমার চেয়ে যত্ন ওই ক'রে বেশী। আবার দেখ্‌তে পাই, মেয়েটার বয়স যতই বাড়্‌ছে, ওটার প্রতি লোভও তার বাড়্‌ছে দিনের পর দিন। মাঝে মাঝে শুন্‌তে পাই টুং টাং শব্দ। অথচ মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা কর্‌'লে অপরাধীর মত মাথা নীচু ক'রে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকে—

হেসে ওঠে মনীষা। বলে, দোষ আর ওর কি বলো? শিল্পীর মেয়ে—শিল্পের প্রতি ঝোঁক থাকাটাই স্বাভাবিক। নাও, এখন স্থির হ'য়ে একটু বসো—চায়ের ব্যবস্থা করি ততক্ষণ।

মাসীমাকে ত দেখ্‌ছি নে? প্রশ্ন তুল্‌লো মরমীপ্রকাশ।

ঘরের বাইরে থেকে উত্তর ভেসে এলো—গঙ্গা-স্নানে গিয়েছেন। এই ফিরে এলেন ব'লে—

*　　*　　*　　*

মনীষার পরিবর্ত্তে বেয়ারাই চা ও নোনতা খাবার পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল।

বহুক্ষণ সেগুলো শেষ হ'য়ে গিয়েছে। একা একা মরমীপ্রকাশের ভাল লাগ্‌ছিল না মোটেই। অথচ যার শুভ দর্শনের আশায় সারা দিনটা কাটে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষায়—সেই রইলো দূরে বসে, মিছে একটা কাজের অছিলায়। হায়রে বিধাতার নির্ম্মম হস্ত লিপি! যার জন্ম হৃদয় কাঁদে—সেই দেয় না সাড়া। নীরবে মরমীপ্রকাশ ফেলে দীর্ঘশ্বাস।

হাসি মুখে মনীষা আরও এক কাপ চা নিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। সঙ্গে আছে অনিতা।

বিস্মিত হ'ল মরমীপ্রকাশ। কিন্তু মনীষা এক গাল হাসি হেসে ব'ল্‌লো—তখন ঠাণ্ডা চা খেয়ে নিশ্চয় তৃপ্তি পাওনি ত!

একটু গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল মরমীপ্রকাশ—বুঝ্‌লে কেমন ক'রে?

পুনরায় মৃদু হাস্‌লো মনীষা। ব'ল্‌লো—ব'ল্‌বে আর কে? মনই বল্‌ছিল বার বার। তাই তাড়াতাড়ি নোতুন ক'রে তৈরী ক'রে নিয়ে এলাম আরও একটা কাপ।

চা'টা মররীপ্রকাশের হাতে তুলে দিয়ে, সস্নেহে অনিতার মাথার চুলগুলো ঠিকমত বিন্যস্ত ক'র্‌তে কর্‌তে ব'ল্‌লো মনীষা,—আচ্ছা কঠিন প্রাণ বটে তোমার!

সবিস্ময়ে মুখ তুলে তাকালো মরমীপ্রকাশ।

মনীষা তেমনি নিজের মনেই ব'লে চল্‌লো, এমন তুল্‌ তুলে মেয়ের গায়ে হাত তুল্‌তে পার্‌লে তুমি? প্রাণে একটুও বাজ্‌লো না তোমার?

রাগ না চণ্ডাল! মৃদু অনুযোগ ক'র্‌লো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লো—তাই ত সারারাত অনুশোচনায় চোখের পাতাগুলো বুজোতে পারিনি একটিবারও। সত্য ব'ল্‌ছি—বিশ্বাস করো, মেয়েটার ঘুমন্ত মুখ্‌খানা বারবার নাড়া-চাড়া ক'রে ভেবেছি—দোষ ত ওকে দেওয়া চলে না! দোষ আমার নিজেরই। কেন না, যে বস্তুটা আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, তার যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতে শিখিনি আমি! যদি একটু কষ্ট ক'রে তুলে রেখে যেতাম—তা'হলে এই অঘটনটা ত ঘোট্‌তো না কোনদিন! কিন্তু—

মুখ তুলে তাকালো মনীষা।

মরমীপ্রকাশ ব'ল্‌লো—ওর মা কিন্তু আমার হৃদয়ের এই অনুশোচনার বেদনাটাকে এতটুকুও সম্মান দিল না। ব্যঙ্গ ক'রে উঠ্‌লো—ঘুমন্ত মেয়েকে আর সোহাগ দেখিয়ে লাভ কি?

একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'ল্‌লো মরমীপ্রকাশ, লাভ? সত্যই হয়ত নেই—অনুশোচনাই সার, কিন্তু আমিও ত বাপ! সন্তানকে অহেতুক পীড়া দিয়ে কি সত্যই তৃপ্তি পেতে পারি কোনদিন? মা কি নিজেও সন্তানকে শাসন করে না?

উত্তরে মৃদু হাস্‌লো মনীষা। ব'ল্‌লো—করে বৈকি, কিন্তু এমন নির্ম্মম শাসন ক'রেছে কি কেউ কোনকালে? আজও ওর পিঠ্‌টায় কি রকম কাল্‌চে একটা দাগ প'ড়ে আছে দেখতো!

লজ্জায় অধোবদন হ'য়ে বসে থাকে মরমীপ্রকাশ।

মনীষা বলে, এমন সরল ও অকপট মেয়েকে শাসন করা সত্যই তোমার উচিত হয়নি প্রকাশদা'।

সে কথা ত আমিও অস্বীকার ক'রছি না !

মনীষা সে কথায় কান না দিয়ে আপন মনে ব'লে চ'ল্‌লো—ওকে ব'ল্‌লাম—কেন ও নীরস যন্ত্রটায় হাত দিয়েছিলি মা ? তাই তো বাবা মেরেছে !

ও ব'ল্‌লে—বাবা বাজায়, তাই দেখে একটু হাত দিয়েছিলাম মাসীমা। হেসে উঠে ব'ল্‌লো মনীষা, বোধ হয় ওর মা'ই ওকথা ব'ল্‌তে শিখিয়ে দিয়েছে। তা সম্পর্কটা দাঁড়ালো মন্দ নয়। আমার মা তোমার মাসীমা, আবার আমি ওর মাসীমা ! হেসে উঠ্‌লো মনীষা। ব'ল্‌লো—ব'ল্‌লাম্, জানো ত' মা, ওটা খেলার জিনিষ নয় ! ও চুপ ক'রে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।···জিজ্ঞাসা করলাম, তোমারও বুঝি ওরকম বাজাতে সখ্ যায় ? হাসিমুখে মাথা দুলিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—তাইতো গিয়েছিলাম--কিন্তু তারটা কট্ ক'রে কেটে গেল। ভয়ে ঘর থেকে পালিয়ে এলাম। কিন্তু মা দেখে ফেল্‌লো। ব'ল্‌লে—কি ক'রলি মুখ্‌পুড়ী ? তাঁর এত সাধের জিনিষটা নষ্ট ক'রে দিলি ? আজ বরাতে তোর দুঃখ আছে নিশ্চয় !

মরমীপ্রকাশ বিস্ময়প্রকাশ ক'রলো—বলো কি মনীষা ? এত কথা ও শিখে ফেলেছে এরই মধ্যে !

মনীষা হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—না। ওর কথাগুলো ও ব'লেছে, বাকীটুকু ব'লেছে ওর মা।

তার মানে ?

তোমাদের বাসায় আমি এখুনি ত গিয়েছিলাম। তাই ত ফিরতে একটু দেরী হ'য়ে গেল। সত্যই বড় ভাল লাগ্‌লো আমার বৌদিকে ! অমন মানুষকে ছেড়ে আস্‌তে মনটা আপনা থেকেই যেন ব্যথায় ভরপুর হ'য়ে ওঠে। একটু হেসে ব'ল্‌লো—আমি নিজেই ওকে কোলে তুলে নিয়ে এলাম। আস্‌তে কি চায় সহসা ? বলে—না যাবো না মাসীমা,

বাবা আছে! ব'ল্লাম, তাতে কি হয়েছে? আমি ত' আছি তোমার সঙ্গে! একটু হেসে ব'ল্লো—একরকম জোর ক'রেই টেনে এনেছি বলা চলে। সত্যি বাপু—তুমি বাপ ত' নও, যেন বুনো একটা—

শেষ ক'র্লো না মনীষা। নিজের রসিকতায় নিজেই খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে ব'ল্লো—দেশ-বিদেশের লোককে বাজনা শিখিয়ে বেড়াও, আর এই কচি মেয়েটাকে বুঝি শেখাতে পারো না এতটুকু!

মরমীপ্রকাশ অনিতাকে কোলের কাছে টেনে নেয়। মৃদু হাস্তে বলে, বয়স হ'লেই শিখবে!

ছাই শিখ্বে। কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ ক'র্লো মনীষা। ব'ল্লো, আর দরদ দেখিয়ে লাভ নেই। হাসি-খুশী ভরা মেয়ের চেহারাটা ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। কোলে তুলে নিয়ে তার গণ্ডে গভীর আবেগে একটা চুমু খেয়ে ব'ল্লো—নেই বা শেখালো বাবা – আমি তোমায় শিখিয়ে দেবো! কি বলো? গ্রীবা হেলিয়ে মরমীপ্রকাশের মুখের দিকে একটিবার তাকিয়ে সহাস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মনীষা। ব'ল্লো—বাইরে গাড়ীর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেখে আসি—মা বোধ হয় ফিরে এলো এবার।···

মনীষার বাবা, অদ্বৈতকুমার বিলেত ফের্তা মানুষ। যাকে বলে একেবারে খাস্ সিভিলিয়ান। তাঁর আদব-কায়দা, চাল-চলনের মধ্যে কোথাও এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে না। সকাল সাড়ে ন'টায় অফিস বেরিয়ে যান, ফেরেন সেই সন্ধ্যা ছ'টায়। অবশিষ্ট সময়ের অনেকখানিই তাঁর অফিসের নথিপত্রের মধ্যে অতিবাহিত হয়। তার ফাঁকে যেটুকু অবসর পান, তার মধ্যে হাসি ও গল্পে মুখর হ'য়ে ওঠেন তিনি। অবশ্য সাজ-সজ্জায় বিদেশী অনুকরণে সজ্জিত হ'লেও খাঁটি এদেশী মানুষ যে তিনি সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না কারও।

তিনি স্বাধীনতা প্রিয়। নিজের স্বাধীনতা অপহৃত হোক্, এ জিনিষটা যেরূপ তিনি মনে-প্রাণে পছন্দ করেন না, অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের পক্ষপাতীও ছিলেন না কোন সময়ে। ফলে এ বাড়ীর সবাই স্বাধীন। চলাফেরা করে সব নিজেরই খুশী মত।

সকাল ও সন্ধ্যায় তিনি নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। অবসর সময় যখন পান তখন এ বাড়ীতে আসে না মরমীপ্রকাশ। এরই ফাঁকে উভয়ের মধ্যে আলাপ ও আলোচনা চলে রীতিমত। অতীতে তিনিও এই চারুকলার প্রতি ছিলেন গভীর অনুরাগী; কিন্তু সে সুযোগ লাভের পরিপূর্ণ অবকাশ পাননি সেদিন তিনি। এজন্য যে জীবনে তাঁর একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হ'য়েছে তা নয়, তবে আক্ষেপও যে একেবারে ছিল না এ কথা জোর দিয়ে বলা চলে না। তাঁর বিশ্বাস জীবনে অনুরাগের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশী। কারণ সেই অন্তরে যোগায় প্রেরণা। অবশ্য সকল পরিকল্পনাই যে জীবনে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ ক'র্‌বে সেরূপ নিশ্চয়তার শুভমুহূর্ত্তও জীবনে আসে না—তবুও অন্তরে আশা পোষণ ত ক'র্‌তেই হবে—এটাই এ জগতের নিয়ম! ফলে, যেটুকু লাভ করা যায়, সেটুকু নিয়েই তুষ্ট থাক্‌তে হয়—তার বেশী চাইলেও পাওয়া যায়না কোনদিন! সুতরাং যা পেলাম না বা পাওয়া গেল না, তার জন্য মিথ্যা হা-হুতাশ ক'রে লাভ কি?—তবে চেষ্টা ক'রে চ'ল্‌তেই হবে—এর নামই ত জীবন!

তিনি বোঝেন—শুধু তাই নয়, মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধিও করেন—সর্ব্বগুণের সমন্বয় ছাড়া একটি পরিপূর্ণ চরিত্র গঠিত হওয়া সম্ভব নয়, অথচ একটা জীবনেও সকল কিছুর রূপ দেওয়া সম্ভব হ'য়ে ওঠে না! কারণ প্রতিটি জিনিষের জন্যই ত চাই সাধনা! সেই বিশাল অবসর মানুষের জীবনের ইতিহাসে বড় একটা দেখা গিয়েছে কি কোনদিন?

যে সকল ইচ্ছা মনের গহন কোণে পরিকল্পনা রূপ পরিগ্রহে বিকাশ লাভের আশায় উন্মুখ হ'য়েছিল—সে সকল বস্তুর বাস্তব রূপ দেওয়ার অবকাশ হয়ত জীবনে আসেনি, কিন্তু যারা মনের ফসলরূপ পরিগ্রহে নেমে এলো এ পৃথিবীর বুকে, তাদের মধ্যে যদি সেই আশা পূর্ণতর রূপে আত্মপ্রকাশ ক'র্‌তে উদ্যত হয়, সে পথে বাধার সৃষ্টি করা উচিত কি কোনদিন? তাই তিনি ছেলেমেয়ের ইচ্ছায় বাধা দেওয়াটাকে একটা গুরুতর অপরাধ বলেই স্থির ক'রে নিয়েছিলেন। এমন কি, নিজের স্ত্রী অনুসূয়াদেবীর স্বাধীন মতামতকে উপেক্ষা করেননি কোন-দিন। তিনি বোঝেন, প্রতিটি রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের নিজস্ব স্বাধীন সত্তা ও তার স্বকীয় ইচ্ছা ব'লে বস্তু একটা আছে। তাকে বাধা দিলে, যে রূপ প্রকাশ পায়, সেটা সামাজিক জীবনের সহজাত ইতিহাসের ধারা ব'লে স্বীকৃত হ'লেও—সে বস্তুটা তার মনের সত্যকার পরিচয় ব'লে স্বীকৃতি লাভ ক'র্‌তে পারে না। বরং সেটা তার ক্ষুব্ধ মনের বিকৃত রূপ। সামাজিক মানুষ সেই বিকৃত-রূপকেই স্মৃতিচিহ্ন-রূপে পূজা দিয়ে চলেছে দিনের পর দিন। তার যতই ঐতিহ্য ও জমজমাট ভাব থাক্‌ না কেন, সেটা হ'ল জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনার ইতিহাস যা সহজাত পরিবেশের রুদ্ধ-গণ্ডীর সাহচর্য্যে মানুষের অজ্ঞাতসারে সংস্কাররূপে বাসা বাঁধে রক্ত-মাংসের প্রতিটি পেশী ও শিরা-উপশিরায়। ফলে আত্মবিক্রীত হয় মানুষের সেই স্বাধীন সত্বাবোধ—বিকৃত হয় তার মন ও জীবনের সহজ ও সরল রূপ। মনুষ্যত্বের হয় সমাধি, বেঁচে থাকে শুধু নিয়মের সুদৃঢ় শৃঙ্খল। তার রূঢ়তাকে সংযমের পীঠভূমিতে বসিয়ে তারা আত্মশাসনের রূক্ষ কষাঘাতে জীবনের সাবলীল গতিধারাকে করে বিকৃত। তাই তার সৃষ্টি হয় অসম্পূর্ণ।...সেই জের ব'য়ে চ'লেছে পৃথিবী যুগের পর যুগ। তাই শিব গ'ড়্‌তে মানুষ গড়ে বাঁদর, মনুষ্যত্বের পূজার নামে পশুত্বকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়ে জীবন সাধনার নামে জীবন নিয়ে খেলে ছিনিমিনি খেলা।

অদ্বৈতকুমার যুগ-ধর্ম্মের আবর্ত্তে নিজের জীবনকে পিষ্ট ক'রেছেন, তার বিষের জ্বালা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধিও ক'রেছেন। তাই প্রকৃতির আত্ম-প্রতিষ্ঠাকে জীবনের স্বধর্ম্ম ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে পেরেছেন সহজেই। কথায় কথায় সেদিন হাসিমুখে মরমীপ্রকাশকে ব'ল্লেন—দেখ মরমীপ্রকাশ, আমরা নিজেদের মানুষ ব'লে বড়াই করি, গর্ব্বও অনুভব করি—কিন্তু সেই গর্ব্বটা এতই অন্তঃসারশূন্য যে, যাচাইয়ের মুখে তার কোন বাস্তব মূল্যই খুঁজে পাওয়া যায় না এ জগতে।

সবিস্ময়ে মরমীপ্রকাশ বলে—কথাটা আপনার ঠিক বুঝে উঠ্তে পার্লাম না মেশোম'শায়!

অদ্বৈতকুমার মৃদু হাস্লেন। ব'ল্লেন—একটু চেষ্টা ক'র্লে তুমি নিজেও বুঝ্তে পার্বে মরমীপ্রকাশ। দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন হবে না।

মরমীপ্রকাশ নিরুত্তরে থাকে বসে। সত্যই সে রূপ দেখার সৌভাগ্য তার জীবনে আসেনি—সুতরাং উত্তর সে আজ দেবে কি?

কয়েক মিনিট নীরবতার মধ্যে অতিবাহিত হওয়ার পর অদ্বৈতকুমার নিজেই মুখর হ'য়ে উঠ্লেন—চুপ ক'রে বসে বসে কি ভাব্ছো মরমী-প্রকাশ—কথাটা তোমার বিশ্বাস হ'ল না বুঝি?

হাস্লো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্লো, অবিশ্বাস করিনে মেশো'মশায়, তবে ও জিনিষটাকে তলিয়ে দেখার অবসর ত পাইনি কোনদিন—তাই সহসা উত্তর দেওয়াটা যেন বেশ একটু কঠিন ব'লেই মনে হচ্ছে!

কেন? দেখোনি প্রকৃতির রূপ? কোনদিন কি বনে-জঙ্গলে ঘুরে-ফিরে বেড়াওনি একা একা।

মাঝে মাঝে দু' একবার গিয়েছি বই কি।

সেখানে কি দেখেছ মরমীপ্রকাশ? সহজ হাস্যে প্রশ্ন তুল্লেন অদ্বৈতকুমার।

গাছ পালা—ঝোপ্ঝাড়্—

শুধু এইটুকুই দেখেছো? তার বেশী কি কিছু তোমার চোখে পড়েনি?

কয়েক সেকেণ্ড মৌন থেকে কি যেন গভীর ক'রে ভেবে নিল মরমীপ্রকাশ। ব'ল্লো—হ্যাঁ, দেখেছি—প্রকৃতির সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য আর তার স্তব্ধ পরিবেশ! যা বার বার দেখেও অতৃপ্তির দোলা জাগেনা মনের কোণে।

তৃপ্তির সঙ্গে একটু হাস্‌লেন অদ্বৈতকুমার। ব'ল্‌লেন—বুঝ্‌লে মরমীপ্রকাশ, সেটাই হল প্রকৃতির সহজাত আত্মপ্রকাশ। তাই সে সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হল মানুষ, ক্ষণিক ভুলেও গেল সে নিজেকে। কিন্তু ঠিক তেমনি ক'রে বহু সাধ্য সাধনাতেও সাজানো হ'ল না তার জীবন প্রাঙ্গন··· এইখানেই তার চরম পরাজয়! একটু থেমে ব'ল্‌লেন, মানুষকে প্রতি মুহূর্ত্তে ইঙ্গিত দিয়ে চলেছে সে যুগের পর যুগ—ওরে, নিজ প্রকৃতির সহজাত বিকাশধারা আর কৃত্রিমতা, দুটো এক নয়! তাই তাকে বাঁধাও যায় না, ধ'রে রাখাও যায় না। সে নিজের প্রয়োজনে—নিজেই আত্মপ্রকাশ করে; আবার প্রয়োজনের শেষে নিজেই যায় মিলিয়ে। শেষে জোরে হেসে উঠে ব'ল্‌লেন—প্রকৃতিকে উপেক্ষা ক'রেই আজ আমরা নিজেদের বিকৃত ক'রেছি মরমীপ্রকাশ! তাই কৃত্রিমতার আয়োজন ও প্রয়োজন জীবনে আজ এত বেশী। তার সেই বিকৃত রূপকে আয়ত্তাধীনে আনার চেষ্টায় যে নিয়মরূপী শৃঙ্খলের প্রয়োজন দেখাদিয়েছিল—আজ তারই ভারে জর্জ্জরিত হ'য়ে উঠেছে প্রতিটি মানুষের জীবন। তাই শান্তি নেই কোথাও। পেয়েও মূল্য দিই না, অথচ অপচয়ের ভঙ্গুর আনন্দটাই হয় জীবন সর্ব্বস্ব, বুঝ্‌লে মরমীপ্রকাশ—তাই জীবনের হাহাকার শুধু বাড়ে—জ্বালা তার বিদূরিত হয়না কোনকালে!···

* * * *

অদ্বৈতকুমার প্রকৃতির পূজারী। প্রকৃতির সহজ আত্মবিকাশের পথেই মানুষ তিনি। তাই মনের রূপ অজানা ছিল না তাঁর কাছে। যদিও সারাটি দিন তিনি নিজের কাজেই থাকেন ব্যস্ত—তবুও প্রয়োজনের প্রতিটি মুহূর্তে অবাধে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেন আত্মীয়-পরিজনবর্গের হাল্কা সেই সহজ পরিবেশের আবর্ত্তে। তাঁদের আলাপ-আলোচনায় প্রথম সূত্রটি ধ'রেই তিনি উপলব্ধি করেন—কোথায় তাদের অন্তর-বেদনা, কোথায় প্রাণের সেই সহজাত স্ফুরণধারা হারিয়ে ফেলেছে তার নিজস্ব গতিবেগ। অথচ নীরব শ্রোতার স্থান অধিকার ক'রে নিঃশব্দে শুধু শুনে যান, আর লক্ষ্যও ক'রে চলেন সেই গতিপথ। তবুও একান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে মুখ ফুটে কোন প্রতিবাদ করেন নি কোনদিন।

কারণ তিনি জানেন—প্রতিবন্ধকতাই জীবনে আনে চরম বিপর্য্যয়। সেই রুদ্ধ বেদনার ক্ষতই জীবনে বিপ্লবের ইন্ধন জুগিয়ে চলে দিনের পর দিন।

মনীষার জীবনে এসেছে পরিবর্ত্তন। তার চিন্তাধারায় ঘটেছে রূপান্তর। অনুসূয়াদেবী, মা—তাঁর স্নেহান্ধ দৃষ্টিপথে সে রূপটা অপ্রকাশিত নয়—তবুও স্নেহ-দুর্ব্বলতায় সে চঞ্চলতা ধরা পড়েও প'ড়্লোনা। কিন্তু অদ্বৈতকুমারের দৃষ্টিপথকে সহজে অতিক্রম ক'র্তে পারলো না সেই চপলতা। তিনি আশু বিপদের কথাটা স্মরণ ক'রে শঙ্কিত হ'লেন, কিন্তু বিচলিত হ'লেন না এতটুকু। কারণ ওটা প্রকৃতির রীতি, জীবন-পথে ওর নিত্য আনাগোনা। ওকে কি এড়িয়ে চলা যায়—না সম্ভব কোনকালে!

মৃদঙ্গকুমার খেয়ালী মানুষ। তার দুদিনের সখ, আতিশয্যের বাহুল্যে ভরপুর। তাই সে ইচ্ছা ও ধৈর্য্যের দ্বন্দ্বে পরাজিত হয় বার বার। এবারও হ'ল তাই। তার প্রিয় সেই সেতারখানা টাঙানো রইলো দেওয়ালে। নোতুন ক'রে পেয়ে ব'সলো তাকে শীকারের নেশা,

আর বাগান পার্টির নিত্য নোতুন হৈ-চৈ। তারই আবর্ত্তে ডুবে রইলো সে নিশ্চিন্ত আরামে।

অন্ত সময় হ'লে মরমীপ্রকাশ ক্ষুব্ধ হ'তো মনে-প্রাণে। হয়ত বা সে সংসর্গ পরিত্যাগ ক'রে ফিরে যেতো তার নিজস্ব সাধনার মাঝে। কিন্তু যে আত্মীয়তার সেতু গ'ড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে—তার বাঁধনই তাকে আকৃষ্ট ক'রলো নিবিড়তর ক'রে। তাই মৃদঙ্গকুমারের এই অবহেলাকে হাসিমুখে উড়িয়ে দিল সহজে। আজ মনীষার প্রীতি ও মাসীমার স্নেহই হ'ল তার জীবনের একমাত্র আকর্ষণ। তাই গমনা-গমনের সূত্রটা তার ছিন্ন হ'ল না—বরং সেই সম্পর্কটাই ঘনিষ্ঠতর হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো দিনের পর দিন। সেই উপলক্ষ্যেই সকাল ও সন্ধ্যা, মরমীপ্রকাশের কাটে মৃদঙ্গকুমারের বৈঠকখানায়—গল্প, তাস ও চায়ের আড্ডায়। মাঝে মাঝে অন্তঃপুরেও পড়ে ডাক। সেখানের স্নেহ, যত্ন ও আদরের মধ্যে নিশ্চিন্তে কেটে চলে তার দিন।···

* * * *

দিন যত যায়, মরমীপ্রকাশের প্রাণের সুপ্ত আশা ও ভাষা, ততই মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—অথচ সহজ আত্মবিকাশের পথ সে খুঁজে পায় না সহসা। নিবিড়তর ক'রে মেলামেশার সুযোগ ও সুবিধা এসেছে তার জীবনে, তবুও প্রাণের দ্বার মুক্ত ক'র্‌তে পারে না! একটা অজানা লজ্জা পথ রোধ ক'রে দাঁড়ায়। আত্মসম্মান জ্ঞানটা প্রকটতর হ'য়ে ওঠে। প্রাণের রুদ্ধ ভাষা, নিজের আবর্ত্তে নিজেই ঘুরপাক খেয়ে মরে।

চির চঞ্চলা মনীষার জীবনেও লেগেছে জোয়ার। দেখেছে সে তার পূর্ণতার রূপ, কিন্তু নেমেছে একটা গাম্ভীর্য্যের ছায়া। তার হাস্য-লাস্য ও গানের মধ্যে নেই উচ্ছ্বাস-মুখর সেই তর্জন ও গর্জনের লঘু মূর্চ্ছনা। প্রাণপূর্ণা স্রোতস্বতীর মত আজ সে শান্ত ও ধীর। নিরবধি-বুকে

তার ব'য়ে চলেছে চিরন্তনীর সেই কুলু কুলু রব। যে বোঝে সেই ভাষা, সেই পায় তৃপ্তি। যে বোঝে না, সে আঁৎকে ওঠে একটা অজানা আশঙ্কায়! ভাবে—একি পরিবর্ত্তন! মুখর প্রাণের ভাষা তার সহসা রুদ্ধ হ'ল কেন?

অনুসূয়াদেবী বিস্মিত হন। জিজ্ঞাসা করেন—তোর হ'ল কি মনীষা?

মনীষা হাসে। বলে—কিছু ত হয় নি মা!

তবে?

ও কিছু না। চোখে মুখে তার ভাসে এক সুগভীর তৃপ্তির ছায়া। চিত্ত আজ এক অনাবিল আনন্দের প্রাচুর্য্যে হ'য়েছে ভরপূর। তাই সে নীরব। তাতেই তার তৃপ্তি!…

মনীষার প্রকৃতিগত তৃষিত নারী-হৃদয়, পরিপূর্ণ হ'ল অনিতার সংস্পর্শে এসে। সে পেয়েছে তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ সুযোগ। তার সুপ্ত মাতৃত্ব, নিজ সত্ত্বা উপলব্ধির পেয়েছে অবসর। তাই অনিতাই হ'ল তার জীবনের একমাত্র আকর্ষণীয় বস্তু। এর বেশী আশা যে তার মনের কোণে লুকিয়ে নেই তা নয়, কিন্তু এর বেশী স্বপ্ন দেখার ভরসাও সে রাখে না জীবনে! কারণ, যা পাওয়া যাবে না, তাকে নিবিড়তর ক'রে কল্পনায় হয়ত ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতির সুখ-তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব—কিন্তু বাস্তবের রূঢ় আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ সেই আশাহতের বিকৃত বেদনার রূপ ত কম রুক্ষ নয়! সেই দুর্ব্বিসহ ব্যথা ও হুতাশনের তীব্র জ্বালা সহ্য করার মত শক্তি বা ধৈর্য্য তার নেই। তাই যেটুকু সে জীবনে পেয়েছে সেটুকুও ত নেহাৎ কম নয়! কয়জনই বা সেই সৌভাগ্যলাভের অধিকারী হ'য়েছে এ সংসারে?

অন্তর দিয়ে সত্যই সে ভালবাসে মরমীপ্রকাশকে। তার প্রতিদানও সে পেয়েছে নীরবে। নাই বা হ'ল সে মুখর, নাই বা লাভ হ'ল তার মধুর উষ্ণ সুখ পরশ। মনের এই যে অনাবিল আনন্দ, নিবিড়তম

অনুভূতির এই যে স্নিগ্ধ পরশ—এর বেশী কি কিছু স্থায়িত্বলাভ ক'রে মানুষের জীবনে ?…

স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার উন্মাদনাই অন্তরে দেয় সৃষ্টির প্রেরণা! সেই প্রেরণায় নারী বাঁধতে চায় সংসার। তাই পেটে ধ'রে, বুকে পেয়ে তার এত তৃপ্তি। কিন্তু যেখানে সে সৌভাগ্যলাভের আশা নেই—অথচ সেই কামনায় হৃদয় হ'য়েছে উদ্বেলিত—সেখানে না পাওয়ার সেই জ্বালায় প্রতিটি পলে জ্বলে মরা অপেক্ষা প্রিয়তমের রক্তমাংসের দান—সেই ছোট্ট প্রতিবিম্বটিকে নিবিড়তর ক'রে বুকে পাওয়ার সৌভাগ্যকে পরমপুরুষের আশীর্ব্বাদ ব'লে মেনে নেয় নারী। তাই নিজের হাতে পালন ক'রে পায় সে আনন্দ—পায় তৃপ্তি। বার বার কোলে, পিঠে, বুকে তুলে, ভরিয়ে নেয় সেই বুভুক্ষিত অন্তরের জাগ্রত অনন্ত ক্ষুধা।

মনীষা জানে, ভাল ক'রেই জানে, মরমীপ্রকাশকে একান্তে, আপন ক'রে পাওয়া এ জীবনে সম্ভব হবে না কখনও। সে বিবাহিত। সে সংসারী।… যে প্রলোভনে মানুষ গড়ে এই সংসার, সেই পবিত্র পীঠভূমিকে নিজ সুখ-শান্তির কামনায় নিজের হাতে ত ভেঙে চুরমার ক'রে দিতে পারে না অবহেলে। সেও যে ভালবাসে মরমীপ্রকাশকে…তার সুখেই ত সে সুখী! তার তৃপ্তিতেই ত অন্তর তার তৃপ্ত! তার আনন্দ বিধানই ত তার জীবনের একমাত্র কামনা!

নিজেকে রিক্ত করার ব্যথা অনেক, কিন্তু সেই ব্যথাই ত তার জীবনের সমস্ত সঞ্চয়—সারা জীবনের চলার পাথেয়। প্রেম! সে ত আলো! নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়াই তার রীতি। সেটাই তার ধর্ম্ম! নিজেকে দহন ক'রেই তার সুখ—তার তৃপ্তি—তার আনন্দ! স্বেচ্ছায় তাই নিজেকে হারায় মানুষ, জাগ্রত সেই

স্মৃতির সৌধ-মালায়। ব্যথার ঠাঁই নেই সেখানে—বরং আছে অনাবিল আনন্দের সুপ্রচুর অবকাশ!...

মানুষের জীবন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতম। আশা আর নিরাশার বেদনায় ভরপুর। মনটা তার সেতারের তারের চেয়েও সূক্ষ্মতম। কখন যে সে সুরের মূর্চ্ছনায় ভরপূর হ'য়ে ওঠে, আবার কখনই বা সে সামান্য একটু লঘু পরশে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়—তার হদিশ সে নিজেই পায় না খুঁজে। তাই তার জীবনের রূপ কখনও দুঃসহ বেদনাময়, আবার কখনও বা আনন্দে ভরপুর। তাই জীবনে স্থায়িত্ব লাভের একমাত্র অধিকারী হ'ল পূত ওই প্রেম আর তার জাগ্রত স্মৃতি-সৌধ! রুদ্র জীবন-প্রান্তরে উঠ্‌বে ঝড়, ঘটবে বহু পরিবর্ত্তন—কিন্তু তার সমস্ত গতিবেগকে উপেক্ষা ক'রে বেঁচে থাক্‌বে একমাত্র পূত ওই প্রেম। ধমনীর প্রতিটি রক্তকণিকার সঙ্গে মিশে থাকবে অঙ্গাঙ্গিভাবে। বিচ্ছেদ তার ঘট্‌বে না কোনদিন। সে যে অক্ষয়, অমর, চির-জ্যোতির্ম্ময়!

মনীষা একথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রেছে বলেই ত আজ সে এত নির্ব্বিকার। জীবন তার ভরপূর প্রাণের স্পন্দনে...।

* * * *

অনিতা তার গর্ভে রক্ত-মাংসের পিণ্ড-রূপে জন্ম নেয়নি সত্য, কিন্তু সে যে তার প্রেমাস্পদের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার নিগূঢ় প্রতিমূর্ত্তি সে। তাকে বুকে তুলে নিয়ে—আশা তার পেয়েছে রূপ, ভাষা তার হ'য়েছে চঞ্চল। আজ সে তারই মাঝে নিজেকে বিলিয়ে, একান্তে বেঁচে থাক্‌তে চায় নীরবে।

অনিতা শিশু। তাকে উপেক্ষা ক'রেছিল মরমীপ্রকাশ। কিন্তু মনীষা! তার সেই শিশু-মনের বাসনাকে রূপ দিল নিজ অন্তর রসে পরিপূর্ণ ক'রে।

আজও তার ভাষা, স্পষ্ট হ'য়ে ফোটেনি, কিন্তু তার সেই ভাঙা ভাষায় সে দিল সুরের ঝঙ্কার। মুগ্ধ হ'ল সকলে। কেবল জানলো না মরমীপ্রকাশ ··।

প্রিয়জনের কাছে কোন কিছুই গোপন করা চলে না। তার বহিঃপ্রকাশ নইলে মনটা তৃপ্তি পায় না বিন্দুমাত্র। একটা অকারণ চঞ্চলতায় সে নিজেই অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে বার বার। তাই মনীষা মৃদঙ্গকুমারকে ধরে ব'স্‌লো—বন্ধু-বান্ধব নিয়ে অনেক ত হৈ-চৈ ক'রছো, চলনা একদিন আমরাও এই ক'জন মিলে একটু আমোদ-আহ্লাদ ক'রে ফিরে আসি ঘণ্টা কয়েকের জন্যে!

মৃদঙ্গকুমার রাজি হ'ল সঙ্গে সঙ্গে। কারণ এটাই ত সে চায়। উৎসাহিত কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো—বেশ ত! আগামী ছুটির দিনে আয়োজনটা পাকা-পাকি ক'রে তোলা যাক্! আমার বন্ধুর একটা বাগান বাড়ী আছে। সেখানেই ব্যবস্থা করা যাবে। সঙ্গে মা, বাবা, অনিতা, তুই, আর মরমীপ্রকাশদা ত থা'ক্‌বেই—মাঝপথে থেমে গেল মৃদঙ্গকুমার।

সহাস্যে প্রশ্ন তুল্‌লো মনীষা—সঙ্গে আরও কেউ যাবে নাকি? কণ্ঠস্বরে তোমার মনে হচ্ছে যেন আরও কেউ আছে—

মনীষাকে শেষ ক'রতে দিল না মৃদঙ্গকুমার। সহাস্যে ব'লে উঠ্‌লো, হ্যাঁ—যাদের বাগান, তাদেরও ত দু' একজনকে ব'ল্‌তেই হবে! আর কিছু না হোক্—অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে—

হেসে উঠলো মনীষা। ব'ল্‌লো—ক্ষতি কি? কিন্তু বেশী ভীড় বাড়ালে চল্‌বে না তাও ব'লে রাখ্‌ছি আগে থেকে···।

* * * *

সহর থেকে মাইল দ'শেক দূরে, নির্জ্জন এক বাগান বাড়ীতে আয়োজন হ'ল একটু গান বাজনার। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে রইলেন, মৃদঙ্গকুমারের ভাবী

বধু, নমিতাদেবী আর তাঁর এক দূর সম্পর্কের দাদা, বিলেত ফেরতা ব্যারিস্টার অজিতসুন্দর। বাগান বাড়ীর মালিক সুজিতপ্রসাদ, রমেন্দ্রসুন্দর ও মনীন্দ্রপ্রসাদ আর মহিলাদের মধ্যে র'য়েছেন মনীষার বন্ধু রমলাদেবী, অমিতাদেবী ও সুজিতাসুন্দরী। নমিতাদেবীর বান্ধবীও আছেন দু'জন, রেবা ও রেখা। এঁরা সহরেই মানুষ—শিক্ষিতা ও নৃত্য-শিল্পী।

আয়োজনটা একেবারে ঘরোয়া। মনীষা ও অনুসূয়াদেবীর ইচ্ছাও ছিল তাই। মৃদঙ্গকুমার, পূর্ব্বেই রওনা হ'য়ে গেছে। পরের গাড়ীতে চ'লেছেন, অদ্বৈতকুমার, অনুসূয়াদেবী, মনীষা ও অনিতা। তার পিছনের গাড়ীতে চ'লেছে একা মরমীপ্রকাশ ও বাদ্য-যন্ত্র সমূহ।

বাগান বাড়ীর কাছাকাছি অদ্বৈতকুমারবাবুর গাড়ীর টায়ার ফেটে গেল। চাকা বদল না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা ক'রতে হ'ল সেখানে। ইতিমধ্যে মরমীপ্রকাশের গাড়ীটা এসে পৌঁছে গেল। মরমীপ্রকাশ গাড়ী থেকে নেমে ব'ল্‌লো, বেলা বাড়্‌ছে, আপনারা বরং এগাড়ীতেই এগিয়ে যান—আমি বরং গাড়ীটা সারিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের পিছু পিছু।

কথাটা মনে লেগে গেল অদ্বৈতকুমারবাবুর। ব'ল্‌লেন—বেশ, সেই ভাল। তুমিই বরং ওটা নিয়ে এসো। এঁদের ত এগিয়ে যেতেই হবে। ঘরের লোক ছাড়া বাইরেরও কয়েকজন নিমন্ত্রিত র'য়েছেন।

অনুসূয়াদেবীও রাজি হ'লেন। কিন্তু এত লোক যাওয়ার মত স্থান সঙ্কুলান হ'ল না। অবশেষে, অদ্বৈতকুমারবাবু, অনুসূয়াদেবী ও অনিতা চলে গেল সেই মোটরে। মনীষা একটু কষ্ট স্বীকার ক'র্‌লে হয়ত চলেও যেতে পার্‌তো, কিন্তু মরমীপ্রকাশকে একা ফেলে যেতে মন তার রাজী হ'ল না। তার উপর কখন যে গাড়ীটা ঠিক হ'বে তারও ত কোন স্থিরতা নেই। ব'ল্‌লো—তোমরা এগিয়ে যাও—আমি বরং পরের গাড়ীতেই যাচ্ছি।

গাড়ী চলে গেল। এপাশে ড্রাইভার চাকা লাগানোর কাজে দিল মন। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে তারাও উভয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লো সেই কাজ। সহসা মনীষা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো, আরও তোমার কত সময় লাগ্‌বে ড্রাইভার ?

আপনমনে কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ড্রাইভার ব'ল্‌লো—এ টায়ারটাও একটু জখম হ'য়েছে দেখ্‌ছি ! তাই ঠিক ক'রে নিচ্ছি একসঙ্গে—যাতে সহসা পাঙ্‌চার না হয়। আপনারা এই রোদে মিথ্যে না দাঁড়িয়ে দূরের ওই ছায়াটায় গিয়ে বসুন না ততক্ষণ ! হ'য়ে গেলেই আমি ডেকে নেবো আপনাদের।

মনীষা অমনি ব'লে উঠ্‌লো, সেই ভালো ! চলো, ওই ছায়াটায় গিয়ে বসা যাক্ ততক্ষণ।

মরমীপ্রকাশ তন্ময় হ'য়ে দেখ্‌ছিল তার কাজ। ব'ল্‌লো, হ্যাঁ—তাই চলো ! কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলো ঠিক সেইখানেই।

একটু দূরে এগিয়ে থম্‌কে দাঁড়ালো মনীষা। ব'ল্‌লো, দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

হ্যাঁ, যাই। সচকিত হ'য়ে এগিয়ে এলো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লো—একাজগুলোও দেখ্‌তে বেশ ভাল লাগে।

মনীষা হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—তেল কালি মেখে একটু পরখ ক'রে দেখ্‌বে নাকি—কেমন লাগে ?

হেসে উঠ্‌লো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লো—তা' যা ব'লেছো। দূর থেকে সব কিছুই দেখ্‌তে ভাল লাগে, কিন্তু ভেতরে যে থাকে সেই বিরক্তি প্রকাশ করে। বলে, দূর ছাই ! এর চেয়ে ওটাই বুঝি ভাল।

মনীষা যোগ দিল—ঠিকই ব'লেছো। দোষ কাকে দেবে বলো—প্রকৃতির রীতিই ত এই !...

* * * *

ছায়ায় ব'স্‌লো মনীষা। ভেসে আস্‌ছে ফুর্‌ফুরে হাওয়া। তার শীতল পরশে দেহ মনের বাঁধন যেন শিথিল্‌ হ'য়ে আসে আপনা থেকেই।

মরমীপ্রকাশও তার পাশে গিয়ে ব'স্‌লো। দৃষ্টি তার ভেসে আছে দূরের ওই দিক্‌চক্রবালের দিকে। যেখানে গ্রাম, ঘরবাড়ী, গাছপালা, মানুষ ও পোষা জীবজন্তুগুলোও হ'য়ে গেছে এক, মিশে গেছে একেবারে সুনীল ওই আকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে।

দূরে একটা পাখী আপন মনে গেয়ে চলেছে—নাম না জানা একটানা একটা গান। কয়েকটা সাদা বক, মনের আনন্দে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে জমির উঁচু আল্‌গুলোর আশে পাশে। বহু দূর থেকে ভেসে আস্‌ছে রাখাল ছেলের বাঁশীর ভাঙা মধুর মৃদু সুর। মরমীপ্রকাশ তন্ময় হ'য়ে দেখে প্রকৃতির নির্ম্মল সৌন্দর্য্য আর শোনে ভেসে আসা সেই কাঁচা হাতের মিঠে মধুর সুর।

সহসা একটা নিঃশ্বাসের মৃদু উষ্ণ পরশে সচকিত হ'য়ে পাশের দিকে ফিরে তাকালো মরমীপ্রকাশ। দেখ্‌লো নিশ্চিন্ত আরামে তৃণশয্যার উপর দেহখানা এলিয়ে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে শুয়ে আছে মনীষা। আর তার মাথার কয়েকটা কালো চুল উড়ে উড়ে খেলা ক'র্‌ছে কপালের ওপর। নিঃশব্দে বহুক্ষণ তাকিয়ে দেখ্‌লে সে রূপ। তবুও যেন তৃষা তার মেটে না! মনে হ'ল যুগ যুগ ধরে যেন দেখে সেই রূপ।

কয়েক মিনিট কেটে গেল নীরবে। মরমীপ্রকাশ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পার্‌লো না তবুও। বুকের মধ্যের বিরাট সেই শূন্যতা নোতুন ক'রে, নোতুন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হ'ল আচম্বিতে। শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে প'ড়লো তার রিক্ততার হাহাকার। সে হারালো নিজেকে।

বুকের সেই জ্বালাটা চকিতে ভরিয়ে নেওয়ার আশায় ব্যাকুল হ'ল তার মন। ভুলে গেল সে হিতাহিত জ্ঞান। মনীষাকে দৃঢ় ভাবে আকর্ষণ ক'রে তুলে নিল বুকে।···

এতখানির জন্য প্রস্তুত ছিল না মনীষা। প্রথম কয়েক সেকেণ্ড সে স্তব্ধবাক্ হ'য়ে আত্মসমর্পণ ক'র্লেও পরমুহূর্ত্তে ফিরে পেল সে আপন সত্তা। চোখ মেলে তাকালো সে মরমীপ্রকাশের মুখের দিকে। নিজেকে মুক্ত ক'রে নিল সঙ্গে সঙ্গে। ব'ল্লো—একি তুমি ক'র্লে প্রকাশদা'!

মরমীপ্রকাশ তখনও দিশেহারা। চোখে-মুখে তার বিপুল উত্তেজনা। বুকের মধ্যে চলেছে এক বিরাট আলোড়ন। কণ্ঠ তার রুদ্ধ হ'য়েছে গভীর আবেগে। ভাঙা ভাঙা স্বরে কি যেন সে ব'ল্তে চেষ্টা ক'র্লো কিন্তু—'বিশ্বাস করো মনীষা' এর বেশী একটি কথাও ব'ল্তে পার্লো না—শুধু চোখে-মুখে তার ভেসে রইলো কাতর মিনতির গভীর একটা ছায়া।

ধীর ও স্থির হ'য়ে একটু দূরে সরে ব'স্লো মনীষা। কয়েক সেকেণ্ড চুপ চাপ্ বসে থেকে ব'ল্লো—ভুলে যেয়ো না প্রকাশদা'—তুমি যে সংসারী!

পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু উঠে দাঁড়ালো মনীষা। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চ'ল্লো সে মোটর গাড়ীর দিকে।

মরমীপ্রকাশ সহসা উত্তর খুঁজে পেল না। লজ্জায় মাথানত ক'রে সেখানে বসে রইলো নীরবে।...

* * * *

ড্রাইভারের ডাকে চমক ভাঙলো মরমীপ্রকাশের। এতক্ষণ বসে বসে, আত্মগ্লানির মধ্যে ডুবে ছিল সে। দুর্ব্বলতা-হ্যাঁ, চকিতের এই দুর্ব্বলতায়—সে হারালো জীবনের যত কিছু সঞ্চয়। হারালো অটুট্ সেই গভীর বিশ্বাস।...হ্যাঁ, সত্যই সে হারিয়েছে নিজের শক্তি ও সাহস। আর কোন্ মুখে পুনরায় সম্মুখবর্ত্তী হবে সে মনীষার!

তার চেয়েও বেশী মর্ম্মাহত হ'বেন মাসীমা। যিনি তাকে ভালবাসেন ঠিক নিজের সন্তানের মত। নির্ভর ক'রেন সকলের চেয়েও

একটু বেশী। যদি এই কথাটা তাঁর কানে গিয়ে ওঠে, তিনিই বা ভাব্‌বেন কি? জবাব দিহির পথই বা তার খোলা রইলো আজ কোথায়?

ভয়ে, লজ্জায়, অনুশোচনায় মুখখানা শুকিয়ে বিবর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো মরমীপ্রকাশের। প্রশস্ত ললাটখানা তার বিন্দু-বিন্দু ঘামে সিক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। কিছুতেই স্থির ক'র্‌তে পারে না তার কর্ত্তব্য এখন কি? সে কি মনীষার সঙ্গে যাবে—না ঘরে ফিরে যাবে এখান থেকেই—

ড্রাইভার একটু উচ্চ কণ্ঠে পুনরায় ডেকে উঠ্‌লো—দাদাবাবু গাড়ী ঠিক হ'য়ে গেছে, দিদিমণি ডাক্‌ছেন আপনাকে।

দিদিমণি—কথাটা তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্র সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লো—মরমীপ্রকাশ। যদি রাগ ক'রে মনীষা—যদি আর মুখ তুলে কথা না বলে কোনদিন! তা'হলে—না—না ভাব্‌তে পারে না মরমীপ্রকাশ! একি অঘটন আজ ঘটে গেল তার জীবনে! কোন কথাই ত তার বলা হয়নি আজও! তবুও কি সে নিষ্ঠুর ভাবে ঠেলে দেবে দূরে—চিরদিনের মত! ভালবাসার কি তবে কোন মূল্য নেই!

অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে কে যেন ব'লে উঠ্‌লো, মূল্য একটা আছে বইকি—কিন্তু তার উপযুক্ত মূল্য দেওয়ার শক্তিও ত থাকা চাই!

মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবে মরমীপ্রকাশ—সত্যই সেই শক্তি সে ফেলেছে হারিয়ে। তাই—যদি মূল্য সে তার ফিরে না পায়—তার জন্য হয়ত শুধু আক্ষেপই র'য়ে যাবে, কাউকে বলার কিছুই থাক্‌বে না কোন দিন!...

বার বার ডাকেও উত্তর দেয় না মরমীপ্রকাশ। ড্রাইভারের মনে কেমন যেন একটা সন্দেহের উদ্রেক হয়। মনীষাকে বলে—বাবু ত সাড়া দিচ্ছে না দিদিমণি! শরীর হঠাৎ খারাপ হয়নি ত?

মনীষা বুঝ্‌তে পারে মরমীপ্রকাশের মনে জেগেছে অনুশোচনার তীব্র দাবানল। তাই সে মুষ্‌ড়ে পড়েছে একেবারে। হয়ত মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় ভুল একটা ক'রে ব'সেছে জীবনে—তাই বলে ত তাকে অপরাধী ব'লে আজ দূরে ঠেলে দেওয়া যায় না! তার উপর সে ত আজ একা অপরাধী নয়। সেও ত মনে প্রাণে ভালবাসে তাকে!

স্থির হ'য়ে বসে থাক্‌তে পার্‌লো না মনীষা। ধীরে ধীরে ফিরে এলো। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—বার বার ডাকে সাড়া দিচ্ছো না কেন? শরীরটা কি তবে সত্যই ভাল ঠেক্‌ছে না?

মরমীপ্রকাশ মুখ তুলেই পরমুহূর্ত্তে নামিয়ে নিল চোখের পাতাদুটো। আজ মনীষার মুখের দিকে তাকানোর সাহসটুকুও তার নেই—সত্যই আজ অপরাধী সে। শুধু মনীষার কাছে নয়, নিজের কাছে, নিজের বিবেকের কাছে। সে যে এত বড় দুর্ব্বল, এ কথাটা তার জানা ছিল না ইতিপূর্ব্বে।

মনীষা একেবারে পাশে এসে দাঁড়ালো। হাতখানা তার নিঃশব্দে নিজের হাতে তুলে নিয়ে ব'ল্‌লো—চলো।

বাধা দিল না মরমীপ্রকাশ। এগিয়ে চল্‌লো সে ধীরে ধীরে মোটর গাড়ীর দিকে···।

*　　*　　*　　*

গাড়ী ছুট্‌লো। শীতল হাওয়া ভেসে আস্‌ছে—তবুও মরমীপ্রকাশ বসে বসে ঘাম্‌ছে। পাশে বসে মনীষা। তার সেই চঞ্চল মুখর প্রকৃতিও আজ যেন স্তব্ধ হ'য়ে পড়েছে। বেশ একটু গম্ভীর হ'য়েই বসে আছে সে।

গাড়ী থাম্‌লো। বাগানের গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল বেয়ারা উমেশ, সঙ্গে তার অনিতা। মনীষাকে দেখে, সে উল্লাসিত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লো—মাসীমা—

কি মা! গাড়ী থেকে নেমে মনীষা সাদরে কোলে তুলে নিল অনিতাকে। চকিতে মিলিয়ে গেল তার কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের এই অনাড়ম্বর আড়ষ্ঠতা। সহজ হাস্যে মুখরিত হ'য়ে আবেগে গণ্ডে তার বসিয়ে দিল ছোট্ট একটি চুমো। পরক্ষণে স্নিগ্ধ ও শান্ত দৃষ্টিতে ফিরে তাকালো উমেশের দিকে। ব'ল্‌লো, দাদাবাবুর যন্ত্রগুলো খুব সাবধানে গুছিয়ে রেখেছো ত?

নোতুন কথা আমায় তুমি কি ব'ল্‌বে দিদিমণি? নিজের কাজে মন দিল উমেশ।

মরমীপ্রকাশ এতক্ষণ সভয়ে বসে ছিল গাড়ীর ভেতর। মনীষার হাসি-খুশী ভরা মুখখানা দেখে মনে শক্তি ফিরে পেলেও সঙ্কোচ তার কাট্‌লো না এতটুকু। উমেশ ব'লে উঠ্‌লো, গাড়ীতে আর বসে কেন দাদাবাবু—নেমে এসো তাড়াতাড়ি।

হ্যাঁ, যাই! সচকিত হ'য়ে পাশের দরজা দিয়ে রুমালে কপালখানা মুছ্‌তে মুছ্‌তে নিঃশব্দে নেমে দাঁড়ালো মরমীপ্রকাশ।

অনুসূয়াদেবী ছুটে এলেন। ব'ল্‌লেন, খুব কষ্ট হ'ল তো? একি! মুখখানা যে শুকিয়ে একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেছে। চলো বাবা চলো, বিশ্রাম নেবে চলো।

মনীষা অকারণে পিছন ফিরে একটিবার মরমীপ্রকাশের মুখের দিকে তাকালো। তার পর একটু ফিক্ ক'রে হেসে অনিতাকে নিয়ে, ফিরে গেল সে মেয়েদের আসরে—যেখানে তাঁরা পৌঁছেই একটা আস্তানা গড়ে তুলেছে নিজেদের খুশীমত···।

মৃদঙ্গকুমারের এই বাগানপার্টি ও গান বাজনার আয়োজনের পিছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র লুকানো ছিল। অজিতসুন্দরের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরমুহূর্ত্ত থেকেই তার প্রতি শুধু সে আকৃষ্ট হয়নি, তার সঙ্গে একটা আত্মীয়তা পাতানোর গোপন ইচ্ছাও তার মনে প্রবলতর হ'য়ে

উঠেছিল। অথচ সে উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান অন্তরায় ছিল মনীষা। সে আধুনিক শিক্ষা ও দীক্ষার মধ্যে মানুষ হ'লেও এদেশের সহজাত ধারাকে সে অতিক্রম ক'রে উঠ্‌তে পারেনি। তাই সে যাকে নির্ভর-যোগ্য বলে মনে করে, তারই সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে, অপরের দিকে ভুলেও ফিরে তাকায় না একটিবার। এটাই তার চরিত্রের সব চেয়ে দুর্ব্বলতম বৈশিষ্ট।

এই প্রসঙ্গ তুলে মৃদঙ্গকুমার তাকে বহুবার উত্যক্ত ক'রেছে, কিন্তু নির্ব্বিকার মনীষা। উত্তরে মৃদু হাস্যে জবাব দিয়েছে, কি আর ক'রি বলো—এটা যে আমার জন্মগত সংস্কার! না ম'লে কি এর রূপ পরিবর্ত্তন হবে কোনকালে?

মৃদঙ্গকুমার মনীষাকে ভাল ক'রে চেনে বলেই—একান্ত গোপনে এই আয়োজন তাকে ক'র্‌তে হয়েছে সমাধা। এমন কি অনুসূয়াদেবীও জানেন না তার অন্তরের এই গোপন বাসনা।

অজিতসুন্দরের টাকা আছে, রূপ আছে, পাণ্ডিত্য আছে। একটা পুরুষের জীবনে এতগুলো গুণের সমন্বয় দেখা যায় না বড় একটা। তাই মৃদঙ্গকুমারের আশা ছিল, পরিচয়ের এই যোগ-সূত্রটা যদি কোন রকমে একটিবার যোগ সাধন করা সম্ভবপর হয়—তাহ'লে বাজীমাৎ সে ক'র্‌বে অনায়াসে।

তাই উদ্যোগ-পর্ব্বটা ঘরোয়া নামের অঙ্গীভূত হ'লেও বাহুল্য ও প্রাচুর্য্যের সমাবেশে নাটকীয় এক অপূর্ব্ব-পরিবেশের সৃষ্টি ক'রেছিল সে নিঃসন্দেহে বলা চলে।

নাচ ও গানের ব্যবস্থা ত ছিলই—উপরন্তু মরমীপ্রকাশের উপস্থিতিতে যন্ত্র-সঙ্গীতের ব্যবস্থাটাও পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লো। কয়েকজন নিমন্ত্রিত মহিলার পরিবর্ত্তে বহু চেনা-অচেনা আগতের ভীড়ে আসরটা রীতিমত জম্‌জমাট ব'লেই প্রতীয়মান হ'ল। রং বে-রংএর শাড়ী ও মধুর

কলহাস্তে সেই দীর্ঘ ও প্রশস্ত হল ঘরটা গম্ গম্ ক'র্‌তে সুরু ক'র্‌লো নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্বে। আসর জমানোর জন্য অতিরিক্ত সাধ্য-সাধনার প্রয়োজন দেখা দিল না কারও।

মরমীপ্রকাশ বসেছিল একটু দূরে। মাথার ওপর একটা পাখা অনবরত ঘুর্‌ছে বন্ বন্ ক'রে। তবুও সে ঘামছে। একটা অকারণ আড়ষ্টতায় মুখের সহজাত লাবণ্যের মাঝে একটা কাঠিন্যের ছায়া স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছে।

অনুসূয়াদেবী ভয়ে সন্ত্রস্ত। পরের ছেলে, একরূপ জোর ক'রেই তাকে টেনে আনা হ'য়েছে এই ভীড়ের মাঝখানে। হয়ত শরীরটা তার সত্যই ভাল ঠেক্‌ছে না। অনুরোধ এড়াতে না পেরেই এতখানি পথ ছুটে আস্‌তে বাধ্য হ'য়েছে সে। তাই নিজেরই অজ্ঞাতে সহানুভূতিপূর্ণ সমবেদনার ছোট্ট একটা স্বর ওঠে ভেসে—আহা বেচারা!

মনীষাও যেন আজ ভীড় থেকে একটু দূরে সরে থাক্‌তে চায়। মৃদঙ্গকুমার কয়েকবার অজিতসুন্দরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ক'রেছে, কিন্তু সে অনুরোধ সে রাখে নি। বিরক্তিভরে উত্তর দিয়েছে —আলাপের সময় ত ব'য়ে যায় নি। তা'ছাড়া তুমি ত জানো বেশী মাখামাখি পছন্দ করিনে আমি।

মৃদঙ্গকুমার চেনে মনীষাকে। তাই বেশী পীড়াপীড়ি ক'র্‌লো না বরং গানের মজ্‌লিস্‌টা যাতে জমে ওঠে, সেই দিকেই দিল সে মন।

গান অনেকেই গাইলো। শেষে মনীষার প'ড়্‌লো ডাক্। মনীষা স্নিগ্ধ হাস্যে মিনতিভরা কণ্ঠে জানালো—আপনাদের আনন্দ দানে বঞ্চিত হ'য়ে সত্যই লজ্জা অনুভব ক'র্‌ছি। শরীরটা আজ ভাল ঠেক্‌ছে না, তবে আপনাদের অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌তে না পার্‌লেও একেবারে উপেক্ষা

ক'র্‌তে চাইনে। অনিতা মা—চলো। সেই ছোট মেয়েটির হাত ধ'রে এগিয়ে এলো সে সভার মাঝখানে। আসনে ব'সে ব'ল্‌লো—এত লোকের সাম্‌নে গান করা ওর অভ্যাস নেই, তবুও মনে হয় এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌বে ও সহজে!

পাশেই বসেছিল মরমীপ্রকাশ। তখনও সে নিজেকে সবল ক'রে তুল্‌তে পারেনি। তাই পাশে বসেও মনীষার মুখের দিকে তাকানোর সাহস তার হ'ল না। মনীষা আড়চোখে একবার তাকিয়েই বুঝে নিল তার অসহায় অবস্থার কথা। সহানুভূতি যে তার জাগ্‌লো না তা নয়, তবুও একটা বন্য আনন্দ অনুভব ক'র্‌লো সে মনে মনে। পুরুষকে এম্‌নি ভাবে জব্দ ক'র্‌তে না পার্‌লে কি তৃপ্তি পাওয়া যায় কোনদিন? হাসির বেগটা অতিকষ্টে সংযত ক'রে নিয়ে ব'ল্‌লো—সেতারখানা তোমার এগিয়ে দাও ত!

মরমীপ্রকাশ একটু ভরসা পেল, কিন্তু সম্পূর্ণ শঙ্কা তার মোচন হ'ল না। নিঃশব্দে সে এগিয়ে দিল সেতারখানা। পরক্ষণে মুখ তুলে অনুসূয়াদেবীর মুখের দিকেও তাকালো একটিবার। তাঁকেও রীতিমত গম্ভীর ও বিষণ্ণ ব'লে মনে হ'ল। ভয় ও লজ্জায় মরমীপ্রকাশ স্থাণুর মত ব'সে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, তার দুর্ব্বলতার সমস্ত কথাই হয়ত মনীষা ব'লে দিয়েছে তাঁকে…হায় ভগবান! যদি এই মুহূর্ত্তে নিঃশেষে একেবারে নিজেকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পার্‌তো! কিন্তু এটা যে রূঢ় বাস্তবের পীঠভূমি। না—না আত্ম-গোপনের কোন পথ আজ আর তার মুক্ত নেই…আর কি গর্ব্বভরা দৃষ্টিতে এঁদের সম্মুখীন হ'তে পার্‌বে সে কোনদিন! না—যে বিশ্বাস আজ সে হারালো, পুনরায় সরল সেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ফিরে পাবে কোনকালে!

সেতারখানা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা ও কচি কণ্ঠের সুর ধ্বনিত হ'ল—

আপন হৃদে আপনি যবে ছিলাম নিগমন,
কে তুমি গো পরম-পুরুষ দিলে দরশন !
পুলক-দোলা লাগ্‌লো বুকে,
হ'লাম বিভোর আপনি সুখে,
ভাস্‌লো তরী মনের খেয়ায়, জাগি সারাক্ষণ।
হৃদয়-পুরের রুদ্ধ দুয়ার
ভাঙ্‌লো আগল, এলো জোয়ার—
রিক্ত হ'ল আমার আমি—পূর্ণ হ'ল মন,
কে তুমি গো পরম-পুরুষ দিলে দরশন !

ভাঙা হ'লেও বড় মিঠে তার কণ্ঠস্বর। তার উপর লয় ও তালের জ্ঞানও তার পরিপূর্ণ। মনীষার অহেতুক ভয়টা মিথ্যায় পর্য্যবসিত হ'ল। গানখানা শেষ হওয়ার পরমুহূর্ত্তেই চারপাশ থেকে প্রশংসার উচ্ছ্বসিত কলকণ্ঠ মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো—মেয়েটি কে ?...বড় মিঠে কণ্ঠস্বর ত মেয়েটির !...ফুট্‌ফুটেও ত বেশ !

এতগুলো প্রশ্নের উত্তর একেবারে দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু সবিনয়ে মনীষা উত্তর দিল—আপনারা এক সঙ্গে এত জন হৈ চৈ ক'রে উঠ্‌লে ও যে ভয় পেয়ে যাবে ! নোতুন গান তা'হলে কি আর সহজে শোনানো যাবে আপনাদের ? একটু চুপ ক'রে বসুন ততক্ষণ।

আসর সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়্‌লো। মনীষা অনিতার কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি যেন ব'লে উঠ্‌লো। অম্‌নি নিঃশঙ্কচিত্তে অনিতা ধ'রলো—

বাজাও ভেরী, ও পূজারী—সেইত তোমার কাজ !
(তব) মনের কথা, বুকের ভাষা স্তব্ধ কেন আজ ?

সাজাও সাজি, সাজাও আজি, ও পূজারী—
বজ্র যদি হৃদয়ে হানে কভু হানুক শত বাজ!
হৃদয়-পুরের ভক্তি যত,
পুঞ্জীভূত সঞ্চিত
জাগাও তারে' জাগাও বারে—জাগাও তারে আজ।
চোখের জলের উষ্ণ ভাষা
পরশ তাহার নয় সহসা,
ও পূজারী, সেইত তোমার সাজ!
বাজাও আজি, বাজাও—ভেরী,
সুপ্ত এ যে নিঝুম পুরী,
রুদ্ররূপে সাজাও বারে, রুদ্র রণ-সাজ!

আসর জমে উঠ্‌লো রীতিমত। এর পরে আরও কয়েকবার শ্রোতৃবৃন্দ অনুরোধ জানালো—আরও একটা—আরও একটা!

মনীষা খুশী হ'ল মনে-প্রাণে, কিন্তু এইটুকু মেয়েকে এর বেশী পীড়ন করা শোভন ব'লে মনে হ'ল না। তাই নিরুত্তরে পূর্ব্বের মতই নিঃশব্দে অনিতাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। এর পর আরও দু'একজন গান গাইলো—কিন্তু ব্যর্থ হ'ল সে প্রচেষ্টা। সুরু হ'ল নাচ। হৈ চৈ ও বাড়্‌লো। কিন্তু সভার প্রাণ যেন নিঃশেষিত হ'য়ে গেছে! শ্রোতাদের মন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। তাই তৃপ্তি কেউ আর পেল না।

মৃদঙ্গকুমার মরমীপ্রকাশকে অনুরোধ জানালো—এবার কিন্তু আপনার পালা মরমীপ্রকাশদা'।

মরমীপ্রকাশ প'ড়্‌লো দ্বিধায়। একপাশে অনুরোধ, আর এক পাশে অসুস্থ মনের গভীর অনুশোচনা। কোনটাই উপেক্ষায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ব'ললো—বিশ্বাস করো কুমারসাহেব শরীরটা—

সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে অনুসূয়াদেবীও ব'লে উঠ্‌লেন—না, না, আজ থাক মৃদঙ্গ, সত্যই শরীরটা ওর ভাল দেখাচ্ছে না। অহেতুক পীড়নে লাভ নেই। তোমাদের খাবার তৈরী, বেলাও হ'য়েছে যথেষ্ট—একে একে সব উঠে পড়ো এবার—

* * * *

খাওয়া শেষ হ'লে, মৃদঙ্গকুমার তাঁদের সকলকে নিয়ে বড় হল ঘরটায় ঢুক্‌লো, খোস-গল্পের নোতুন একটা আসর জমানোর চেষ্টায়। এপাশে মনীষা অতিথি-অভ্যাগতদের আহারে পরিতুষ্ট ক'রে ফিরে এলো পাশের ছোট ঘরটায়। সামনের বারান্দায় আরাম কেদারাটায় শুয়ে অদ্বৈতকুমার। পাশে তাঁর অনিতা। গল্প ব'ল্‌ছেন তিনি—আর এক মনে সেগুলো গিলে চলেছে অনিতা। হাসি-খুশীতে ভরপুর তার মুখখানা।

অনুসূয়াদেবী নিবিষ্টচিত্তে ঘরের একটি কোণে ব'সে মরমীপ্রকাশকে আহার করাচ্ছিলেন। পাশে এসে দাঁড়ালো মনীষা। হাস্য-লাস্যে যেন সে মুখর প্রতিমা! কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়েই মরমীপ্রকাশের অন্তরাত্মা শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল। মুখের ওপর ভেসে উঠ্‌লো একটা অকারণ জড়তার ছায়া। কয়েক সেকেণ্ড সেখানে দাঁড়িয়ে মনীষা উপলব্ধি ক'র্‌লো মরমীপ্রকাশের উৎকণ্ঠা ও শঙ্কার কারণ। মৃদু হাস্‌লো তার মুখের দিকে চেয়ে। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু সে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো—তুমি খেয়েছো অনিতা-মা?

অদ্বৈতকুমার ব'ল্‌লেন—এবার আমরা খাবো। তোমার, ওপাশের কাজ শেষ হ'য়ে গেছে ত মা?

হ্যাঁ—চলো। অনিতার চিবুকখানা সাদরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মৃদু দোলা দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো, মার মুখখানা আমার শুকিয়ে গেছে একেবারে। চলো বাবা আর দেরী নয়, মা প্রকাশদাকে নিয়ে

ব্যস্ত। তা'ছাড়া আমরা না খেলে উনি ত' আবার জলস্পর্শ করবেন না কোনমতে।

হাসি মুখে অনিতাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলো মনীষা। পাতা আসনে চেপে ব'সে হাঁক্ দিয়ে উঠ্‌লো—কোথায় গেলে ঠাকুর—এবার আমাদের একটু ব্যবস্থা করো!

* * * *

মনীষার মনে কোনো গ্লানি জমাট বাঁধার অবকাশ পায়নি। কারণ সে যে মনে প্রাণে ভালবাসে মরমীপ্রকাশকে। তার ত্রুটি বিচ্যুতি বা সাময়িক দুর্ব্বলতাকে প্রাধান্য দেওয়ার মত সেই তীক্ষ্ণ অনুশীলনি সমালোচক মন আজ আর তার জাগ্রত নেই। সে যে দেহ, মনে মরমীপ্রকাশময়। তাই তার অপরাধ আজ আর অপরাধ শ্রেণী-ভুক্ত নয়! সহজ ও লঘু পরিহাসে তার গুরুত্বকে অতিক্রম ক'রে চলে সে।

মরমীপ্রকাশ নিজেকে অপরাধী ভেবে, তার গুরুত্বের বোঝায় নিজেই দীর্ণ হ'ল প্রতিটি পলে—অথচ মনীষার চাল-চলন ও আচরণের মধ্যে কোন সঙ্কোচ দেখা গেল না। সে পূর্ব্বের মতই সহজ ও সরল চিত্তে পাশে এসে দাঁড়ালো মরমীপ্রকাশের। তবুও কিন্তু মরমীপ্রকাশের মনের সংশয় দূর হয় না। ভাবে, মনীষা কোনদিনই হয়ত মনে প্রাণে তাকে ক্ষমা ক'র্‌তে পার্‌বে না—এ জীবনে! তাই সে ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রইলো নিশি-দিন।

সহসা অসুস্থ হ'য়ে প'ড়্‌লো সে! অনুসূয়াদেবী ও মনীষা, সে সংবাদ পাওয়া মাত্র ছুটলেন তার বাড়ী। মৃদঙ্গকুমারও হ'ল তাদের সহযাত্রী।

মীরা তাদের আদর যত্নে ব্যস্ত। অনুসূয়াদেবী মৃণালিনীর সঙ্গে ঘর-সংসারের আলাপ আলোচনায় নিযুক্ত। মৃদঙ্গকুমারের মনের স্থিরতা নেই আজ। আগামী সপ্তাহে জীবনে তার আস্‌বে নোতুনের

সংস্পর্শ। সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষায় চিত্ত তার হ'য়েছে ব্যাকুল। সেই আগত দিনের মধু মাদকতার স্বপ্নে ভরপূর তার হৃদয়। এ বদ্ধ ঘরের হাওয়া কি আজ ভাল লাগে কোনমতে! তাই বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ একটিবার দেখা ক'রেই ফিরে গেল সে। গাড়ী রেখে গেল; তাতেই ফিরে যাবেন অনুসূয়াদেবী ও মনীষা।

ঘরে আর কেউ নেই। মনীষা মরমীপ্রকাশের মাথার চুলগুলো ঠিক ক'রে দিতে ব্যস্ত। সহসা মরমীপ্রকাশ তার হাতখানা চেপে ধরে ভাঙা ভাঙা স্বরে ব'লে উঠ্লো—একটা কথার তুমি উত্তর দেবে মনীষা?

মনীষা মৃদু হাস্লো। ব'ল্লো, বলো!

তুমি কি সত্যই মনে-প্রাণে আমায় ক্ষমা ক'র্‌তে পেরেছো?

মনীষা উত্তর দিল না। তেমনি মৃদু হাস্যে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে, তার মাথার চুলগুলোর সঙ্গে আপন মনে খেলা ক'র্‌তে লাগলো নীরবে।

মরমীপ্রকাশ একটু পরে পুনরায় প্রশ্ন ক'র্‌লো—কই কোন উত্তর ত' দিলে না!

মনীষা পুনরায় হাস্লো। ব'ল্লো—তোমার 'পরে কি কোনদিন রাগ ক'র্‌তে পারি প্রকাশদা'!

মরমীপ্রকাশ চঞ্চল আবেগে তার হাতখানা বুকের ওপর টেনে নিল। কয়েক মিনিট নীরব থেকে পর ব'ল্লো, একটু ভাল ক'রে বুকটায় হাত বুলিয়ে দাও না মনীষা! বড় জ্বালায় জ্বলে ম'রেছি যে এ ক'টা দিন! দাও—একটু ভাল ক'রে! ..

* * * * *

সুদীর্ঘকাল একটানা পরিশ্রমে অদ্বৈতকুমারবাবুর শরীরটা ভেঙে পড়েছিল রীতিমত। চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ ব'লে কোন রকমে জোড়াতালি

দিয়ে চালিয়ে এসেছেন এতদিন। এবার কিন্তু একটু স্থায়ী 'বিশ্রাম গ্রহণ না ক'র্‌লে শরীর ও মনের স্বাভাবিক সুস্থতা একেবারে অচল অবস্থায় উপনীত হবে, এটাই হ'ল গৃহ চিকিৎসকের সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত।

কথাটা উপহাস্তে উড়িয়ে দে'বার চেষ্টা ক'র্‌লেন অদ্বৈতকুমারবাবু। কারণ যাঁরা সারা জীবন পরিশ্রম ক'রে এসেছে তাঁদের কাছে স্থায়ী বিশ্রামটা একটা নির্ম্মম অভিশাপ ব'লে প্রতীয়মান হওয়াই স্বাভাবিক! ব'ল্‌লেন—না না, তেমন কিছু হয়নি।

অনুসূয়াদেবী মনে-প্রাণে সে কথাটা বিশ্বাস না ক'র্‌লেও অনুভব ক'র্‌লেন, কেতাদুরস্থ লোকেদের পক্ষে একেবারে চুপ চাপ ব'সে থাকাটা সত্যই অসহনীয় ব্যাপার। তাঁদের একটা না একটা কিছু চাইই চাই। ব'ল্‌লেন, বেশ ত দিন কতক না হয় একটু হাওয়া বদল ক'রেই এসো না কেন!

অদ্বৈতকুমারবাবু উত্তরে একটু মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন—সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হ'য়ে এ কথাটা তোমার মুখে শোভা পায় না অনু। দূর থেকে লোকে আমাদের যাই ভাবুক না কেন, ভেতরের রূপ ত তোমার অজানা নেই কোন কিছু!

অনুসূয়াদেবী প্রতিবাদ ক'র্‌লেন—কথাটা সত্য, কিন্তু সংসারেরও ত একটা কর্ত্তব্য বলে বস্তু আছে!

একটু জোর দিয়ে হেসে উঠ্‌লেন, অদ্বৈতকুমারবাবু। ব'ল্‌লেন—আছে বই কি! কিন্তু তারও ত একটা সময় অসময় থাকা চাই!

মনীষা এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সেছিল পাশে। মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো,—তা হয় না! তোমাকে যেতেই হবে।

অদ্বৈতকুমারবাবু উত্তরে শুধু মৃদু হাসলেন।

মনীষা ব'ল্‌লো—ও হাসিতে আমি ভুল্‌ছিনে বাবা! আগে তুমি, তোমার সুস্থ শরীর ও মন,—তার পর টাকা। তা ছাড়া শরীরটাই যদি ভেঙে গেল, টাকা নিয়ে—আমাদের হবে কি? তোমাকে যেতেই হবে।

অদ্বৈতকুমারবাবু হার স্বীকার ক'র্‌লেন। ব'ল্‌লেন, বেশ তাই হবে মা! তার আগে মৃদুর বিয়েটা ঠিক হ'য়ে যাক্—

মনীষা চুপ ক'রে যায়। সত্যই কাজের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিশেষ ক'রে কন্যাপক্ষের একটা অকারণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি ক'রে লাভ ত কিছু হবেই না, অধিকন্তু দু'দিন পরে তারাই হবেন এ সংসারের নিকটতম আত্মীয়। দুঃখের না হোক, সুখের ত হবেন সহযাত্রী··· !

শুধু আয়োজন নয়—মিলোনান্ত-নাটকের যবনিকা একটু আড়ম্বর ও আতিশয্যের মধ্যেই সমাপ্ত হ'ল। প্রবল উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক'টা দিন কেটে গেল পরম নিশ্চিন্তে।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হ'ল—মরমীপ্রকাশ। কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'লেন অনুসূয়াদেবী। তাঁর জীবন-সাধনা—এতদিনে হ'ল পূর্ণ। অদ্বৈতকুমার-বাবুও হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন। যাদের কেন্দ্র ক'রে হ'য়েছিল এ সংসারের ভিদ্‌পত্তন, তাঁরা হ'য়েছেন সুখী, পেয়েছেন তৃপ্তি। যে বোঝার গুরু-ভার তিনি ব'য়ে এলেন এতদিন, সেই দায়িত্বের বন্ধন র'য়ে গেল ঠিক তেমনি—শুধু তার বাঁধনটা শিথিল হ'ল। তিনি পেলেন অবসর। ব'ল্‌লেন, তোমরা দু'জনে যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে কাজটা আমার তুলে দিলে, তার জন্য তোমাদের কি ব'লে যে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো—সে ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না আজও।

অনুসূয়াদেবী ব'ল্‌লেন—ও ত আর পর নয়—আমারই অপর এক ছেলে। তাকে মিছে কেন লজ্জা দাও বলতো? কোথায় গেল মনীষা?

ক'টা দিন খেটে খেটে ওর চেহারাটাও এমন বিশ্রী হ'য়ে গেছে যে নিজের চোখে না দেখ্‌লে সহসা বিশ্বাসই হয় না, আমাদের সেই মনীষা! এমন পাগল মেয়ে কি তুমি কোনদিন দেখেছো মরমীপ্রকাশ?

মনীষা দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। মরমীপ্রকাশ সহাস্যে তার দিকে আড় চোখে চেয়ে ব'ল্‌লো—না।

—তবু ভাল! হাসি মুখে পাশে এসে দাঁড়ালো মনীষা। ব'ল্‌লো—এবার তাহ'লে ঠিক ক'রে ফেলো বাবা—কোথায় আমাদের যাওয়া উচিত!

অদ্বৈতকুমারবাবু মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্‌লেন, পাগল মেয়ে কি তোমায় সাধে বলি মা! যাবো ব'ল্‌লেই কি যাওয়া যায়, না সম্ভব কোনদিন? আচ্ছা মরমীপ্রকাশ, তুমিই বলো ত—এই দুর্দ্দিনে, বাইরে কোথাও কি যাওয়া উচিত?

মরমীপ্রকাশের মন বলে না, কোন দিনই উচিত নয়…তা'হ'লে আমি বাঁচবো কেমন ক'রে? কিন্তু মনীষার মুখের দিকে তাকিয়েই তার বুকের ভাষা রুদ্ধ হ'য়ে ঠোঁটের পাতায় ভেসে উঠ্‌লো—না মেসো-ম'শাই—শরীরটা সত্যই আপনার ভেঙে পড়্‌ছে, দিনের পর দিন। মনীষার কথাই ঠিক—আপনার যাওয়াই উচিত!

মনীষা মুখর হ'য়ে ওঠে—দেখ্‌লে তো! প্রকাশদা'ও স্বীকার ক'র্‌ছে শরীরটা সত্যই দিনের পর দিন তোমার খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। এখন বলতো প্রকাশদা', কোথায় যাওয়া আমাদের উচিত?

মরমীপ্রকাশের চিত্ত বলে—না, এ স্থান ছেড়ে কোথাও তোমার যাওয়া উচিত হবে না—এমন কি একটি মুহূর্ত্তের জন্যও না! অথচ মনীষার আশা-ভরা দু'টো চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ ফুটে 'না' বলাও গেল না সহসা। নিজের অজ্ঞাতে যন্ত্র চালিতের মত ব'লে উঠ্‌লো—

একটু পশ্চিমেই ঘুরে আসুন ! সময়টাও ভাল। শীতও এবার পড়েছে একটু একটু।

মনীষা সেই সুরে সুর মিলিয়ে ব'লে—হ'ল ত! আমার কথাটা ত উড়িয়ে দিয়েছিলে একেবারে। একটু থেমে ব'ল্‌লো, প্রকাশদা' ঠিকই ব'লেছে—তোমার একটু ঘুরে আসা উচিত—না প্রকাশদা' ?

মরমীপ্রকাশের জিভ আড়ষ্ট হ'য়ে আসে, অথচ উত্তর না দিয়েও উপায় নেই। বলে—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

পরাজয় স্বীকার করেন অদ্বৈতকুমারবাবু। বলেন—বেশ, তোমরা সবাই যখন ব'ল্‌ছো—তখন তাই হ'বে !

* * *

অদ্বৈতকুমারবাবুর যাওয়া স্থির। এলাহাবাদে কিছুদিন কাটিয়ে হরিদ্বারে যাবেন। সেখান থেকে, যদি সময় হাতে থাকে মুশৌরী, নৈনীতাল ও দেরাদুন ঘুরে আস্‌বেন। সঙ্গে যাবে মনীষা।

সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছাটা অনুসূয়াদেবীর বলবতী হ'লেও তিনি সংসার ফেলে কোথাও একটি পা নড়্‌তে পার্‌ছেন না সহসা। বিশেষ ক'রে ঘরে এসেছে নোতুন-বৌ ! তাকে অদূর ভবিষ্যতের জন্য শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী ক'রে নিতে হ'বে। নইলে, তাঁর অবর্ত্তমানে হাতে গড়া এই সাধের সংসারের হাল যে কি দাঁড়াবে, সে দৃশ্য কল্পনার চোখে এঁকেই ভয়ে আঁৎকে ওঠেন তিনি। না—না—এ ঘর সংসার ছেড়ে কোথাও স্থির চিত্তে যাওয়া সম্ভব নয় কোনদিন! তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে বৌ নিয়ে অতীতের ক্ষয়িষ্ণু জীবনের অপূর্ণ আশা ও আকাঙ্খাকে ভরপূর ক'রে তোলায় দিলেন মন। যে স্বপ্ন একদিন তিনি দেখেছিলেন জীবনে, অথচ যে আশা সফল হওয়ার সুযোগ আসেনি সেদিন—সেই মনের মত ক'রে সাজানোর নেশায় তিনি হ'লেন মাতোয়ারা। স্বামীর

জন্য মনটা যে তাঁর কাঁদে না তা নয়, কিন্তু সৃষ্টির সার্থকতাই ত জীবনের একমাত্র কামনা। তার পরিপূর্ণ রূপ নিজের চোখে দেখ্‌তে না পেলে, চিত্ত কি তৃপ্তিলাভের অবসর পায় কোনকালে?

মনীষার ভাল মন্দ বোঝার বয়স হ'য়েছে। তার উপর সে শিক্ষিতা। বাস্তবের রূঢ় জীবনের সঙ্গে সংগ্রামের শক্তি ও সামর্থ সংগ্রহের অবকাশ যদি আজ তাকে না দেওয়া যায়, সেই বা ভাবীকালের জন্য নিজেকে তৈরী করার অবসর পাবে কেমন ক'রে? আজ না হয় সে অনূঢ়া, পরিপূর্ণ জীবনের রূপ উপলব্ধির অবসর তার আসেনি জীবনে, কিন্তু দু'দিন পরেও ত তাকে গৃহী হ'তে হ'বে! সন্তানের জননীও হ'তে হ'বে। সেদিনের জন্যও ত তাকে নির্ভরযোগ্য ক'রে তোলা উচিত!

আর শুধু উচিতই বা কেন—এটা জননীর করণীয় কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত একটা ধারাও ত বটে! তাই আজ তারই হাতে সমস্ত দায়িত্ব তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চাইলেন তিনি জীবনে।

মনীষাও খুশী হ'য়েছে—সে কাজের ভার পেয়ে। পিতা-অন্ত তার প্রাণ। তাঁকে একটু সেবা ও শুশ্রূষার সৌভাগ্য থেকে সে বঞ্চিত হ'বে কিসের প্রলোভনে!

মরণীপ্রকাশ তার জীবনে এনেছে বিপ্লব। তার সাহচর্য্যে অপূর্ণ জীবনে সে পেয়েছে পূর্ণতার সন্ধান। বিক্ষিপ্ত চঞ্চল জীবনে নেমেছে, পরিপূর্ণতার ছায়া। তাই চিত্ত তার স্থির ও গম্ভীর। নিজ সত্তার আত্মপ্রকাশে নিজেই হ'য়েছে বিমুগ্ধ। তাই তাঁর নেই ক্ষোভ, নেই দুঃখ,—নেই উপেক্ষিতের সেই দীর্ণ হাহাকার।

চাওয়া ও পাওয়া জীবনের নেশা—চলার পাথেয়। তাকে কেন্দ্র ক'রেই সৃষ্টির আবর্ত্ত যুগ যুগ ধ'রে নিজ রূপ বিকাশের পেয়েছে অবকাশ। তাই সে মরেও মরে না—পেয়েও তাই নেই তৃপ্তি। শুধু চাওয়াই তার ক্ষুধা—সেই অনন্ত বুভুক্ষাই তার জীবনের একমাত্র সঞ্চয়। সেই

সঞ্চয় যার হ'য়েছে নিঃশেষ, সেই মরেছে একেবারে। যার শেষ হয় না কোনদিন—সে অমর এ জগতে। পরাজয়ের গ্লানি যার মেনেছে তারই কাছে। জীবনে সেই হ'য়েছে জয়ী।

রক্তে-মাংসে গড়া মানুষের জীবনে এরই দোলা চলে অনিবার। তাই কেউ কাঁদে, কেউ হারায় নিজেকে—আবার কেউ হাসে—সারা জীবন ধরেই হাসে বারেবার। তাই প্রেম কারও জীবনে হয় কণ্টক, কারও বা হয় মৃদু-ফুল-হার। কেউ জ্বলে মরে সারা জীবন, কেউ বা তার সু-গন্ধে ভরপুর হ'য়ে, বিলিয়ে দেয় নিজের জীবন।

মনীষা ভালবেসেছে। তার প্রতিদানে সেই প্রীতির উপহারও সে পেয়েছে নীরবে। তাই তার হৃদয়ে আজ নেই ব্যাকুলতা, নেই হাহাকার—কিন্তু বিদায়ের দিনটা যতই নিকটবর্ত্তী হ'য়ে আসে, অন্তরটা তার ততই একটা অব্যক্ত বেদনায় মূহ্যমান হ'য়ে পড়ে। চোখের পাতায় ভেসে থাকা উজ্জ্বল দিবালোকও গভীর নিশিথের গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা ব'লে হয় প্রতীয়মান। চোখের কোণে নিজেরই অজ্ঞাতে জমে ওঠে—উষ্ণ অশ্রুর স্নিগ্ধ পরশ কণা।...

যাকে চোখে দেখে আনন্দের মূর্চ্ছনায় হৃদয় হয় উদ্বেলিত, যার সঙ্গে দু'টো কথা ক'য়ে অন্তর পায় তৃপ্তি, যার মলিন মুখের ছায়া, বুকে সৃষ্টি করে এক গভীর ক্ষতের বেদনা—তাকে ছেড়ে দূর-দূরান্তরে চলে যাওয়া কি এতই সহজ?

না—সহজ নয় ব'লেই ত হৃদয়ে জাগে এক অব্যক্ত বেদনা। রক্ত-মাংসের ক্ষুধা আর হৃদয়ের ক্ষুধা দুটো এক বস্তু নয়। এক নির্ম্মম আকর্ষণে বদ্ধ ক'রে পায় তৃপ্তি—অপর শুধু তার পরশ পেয়েই হয় আত্মবিভোর। তাই একজন জ্বলে মরে—অপরে সমাধিস্থ হ'য়ে, পান করে জীবন-সুধা। আত্ম-বলিদানের সুখে দিশেহারা হ'য়ে রচনা করে এক বিশাল সংসার। যেখানের বাঁধন শুধু প্রাণের পরশ - মমতাভরা

হৃদয়ের সরস মূর্চ্ছনা। তার বেশী আশা তার নেই—চায়ও না সে কোন দিন। সর্ব্ব জীবের মঙ্গল কামনাই হ'ল তার জীবনের একমাত্র সাধনা···।

* * * *

কোন্ পথ সে বেছে নেবে, এখনও স্থির ক'রে নিতে পারেনি মনীষা। অন্তরে তার এখনও চলেছে দ্বন্দ্ব। রক্ত-মাংসের বাঁধন অন্তরে জাগায় তার অনন্ত বাসনা। একান্ত আপন ক'রে না পেলে, বুকের হাহাকার কভু কি মেটে কোনকালে—! ছোট একটি সংসাররূপী জীবনের নিভৃত আসন একান্তে নিবিড়তর ক'রে না পাত্‌লে, এই জীবনের তৃষা কি নিবারিত হয় কোনদিন! তাই ত এত পেয়েও তার তৃপ্তি নেই। নিজের হাতে, মনের ছাঁচে, নোতুন ক'রে ঢেলে না সাজ্‌লে—না গ'ড়্‌লে—জীবন-পিপাসা কি কভু তৃপ্ত হয় কোন যুগে! তাই ত জীবনব্যাপী চলে দ্বন্দ্ব—জাগে তার দীর্ঘ হাহাকার। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে জ্বলেছে এই ধুনি,—এ জ্বল্‌বে, যুগ যুগ ধ'রে জ্বল্‌বে—এর শেষ হবে না কোনদিন···।

রক্তের ধারায় সংমিশ্রিত সেই মাতৃত্বের তৃষাটা তার অনিতার সংস্পর্শে এসে নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছিল এতদিন। তাই তাকে নিজের বুকের ভাষায় রাঙিয়ে তুল্‌তে চেয়েছিল মনীষা। সে সাধনা তার ব্যর্থ হয়নি। তার শিক্ষা-দীক্ষার যতটুকু সঞ্চয়, সবটুকুই সে উজাড় ক'রে দিয়েছে নীরবে।

অনিতাও তার ক'রেছে সদ্ব্যবহার। যতটুকু তার সাধ্য, সেও ক'রেছে গ্রহণ। তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে সে গায়—

পাগল ও তুই মনের খেয়া—
খোল্‌না ও তোর দ্বার।
(তোর) রুদ্ধ ভাষার, ক্ষুব্ধ তৃষা,
(আজ) প্রকাশ বিনা, জীবন অন্ধকার!

দেখ্‌না চেয়ে আকাশ পানে—
রঙিন সে যে, মেলিয়ে পাখা,
উড়্‌ছে যতেক পাখী—
চাওয়া পাওয়ার মতন তাদের চিত্ত সবুজ—
দুঃখ জীবনব্যাপী।
(ওরে) অভাব তাদের নাই তো কিছু—
বাঁধন তাদের নাইরে পিছু-
(তবু) জমাট বাঁধা তাযার ভারে,
চিত্ত হাহাকার।......

*　　　*　　　*　　　*

হ্যাঁ যেতেই হবে!—এ স্থান ত্যাগ ক'রে তাকে যেতেই হবে। মনীষা নিজেকে দৃঢ়তর ক'রে তোলার আপ্রাণ করে চেষ্টা। কিন্তু অন্তর-দ্বন্দ্বে ঘটে তার পরাজয়। জীবনে বৈরাগ্যের বাসনা—ত্যাগের পরাকাষ্ঠা, সবই অতৃপ্ত জীবন-তৃষার কাছে নতি স্বীকার করে। বলে, না—তা হয় না! না—না পার্‌বো না—পার্‌বো—না! নিজের হাতে নিজের হৃদয়কে এমন টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেল্‌তে পার্‌বো না—

নিজেরই অজ্ঞাতে চোখের কোল বেয়ে তার গড়িয়ে পড়ে কয়েক ফোটা অশ্রু। শয্যার কোলে আশ্রয় নিয়ে ফোঁপিয়ে ফোঁপিয়ে কাঁদেও কিছুক্ষণ।

বুকের গুরুভারের বোঝা লাঘব হয় খানিকটা। কিন্তু সেই শূন্যস্থানটা ভরিয়ে নেওয়ার আশায় সে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে পুনরায়। অনিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বারবার তার গণ্ডে খায় চুমো। অকারণ চঞ্চলতায় মুখর হ'য়ে আদর-যত্ন ও তার বেশ বিন্যাসে দেয় গভীর মনোযোগ।

·· না, না—সে সামাজিক মানুষ! তার বাঁধন, তার সংস্কার, যতই বেদনাদায়ক হোক্, তাকে লঙ্ঘন করার শক্তি তার নেই। জীবনের অসঙ্কোচ মুহূর্ত্তে যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দের বন্ধন পরস্পরকে অবিচ্ছিন্ন ক'রে তুলেছে নিজেরই অজ্ঞাতে, সেই বাঁধনটাকে আজ ছিন্ন ক'র্‌তেই হবে! এরই নাম সমাজ—এরই নাম সংসার। এরই খেলাঘরে মানুষ রচনা ক'রে চলে তার জীবন-নাটিকা।

এখানে দৈন্যতা আছে, নির্ম্মমতা আছে—বিভীষিকা আছে; আছে রুদ্র সংহার মুর্ত্তি—কিন্তু নেই প্রাণের পরশ—নেই হৃদয়ের সেই স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত বিকাশ ধারার সহজ অবকাশ। আছে সৃষ্টির প্রেরণা, কিন্তু নেই তার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ অবসর। তাই মানুষের মনুষত্বের ঘটেছে অপমৃত্যু—বেঁচে আছে শুধু শৃঙ্খলের দৃঢ় ওই বন্ধন, আর তার অসহনীয় বেদনাকে ভুলে থাকার ক্ষণিক সুখমোহের নেশা ও তৃষা। তাকেই আকণ্ঠ পান ক'রে মর্ম্মাহত মানুষ এগিয়ে চলেছে তার দীর্ঘ এই জীবন-পথ যুগের পর যুগ।

না—না—নিজেকে সবল ক'রে তুল্‌তেই হবে! এ দুর্ব্বলতাকে সে প্রশ্রয় দিতে পারে না কোনদিন! হ'লই বা সে অবিচার, হ'লই বা সে আত্মপ্রতারণা—তবুও তার মূল্য আছে। হ্যাঁ—মূল্য একটা আছে বইকি! নইলে আজও মানুষ হাসে কেমন ক'রে?

মন! সত্যই যদি সে কোনদিন বেঁচে থাক্‌তো—তাহ'লে স্বেচ্ছায় কি এ শৃঙ্খল প'র্‌তো নিজেরই গলায়? না, এই প্রতারণাকে ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি ব'লে, এমন শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা ক'র্‌তে পার্‌তো কোনদিন! না—সে মরে গেছে। বহুদিন পূর্ব্বেই সে গেছে মরে, তাই আজ সেই আদি যুগের সবল মন আর নেই—দেহই হ'ল তার জীবন সর্ব্বস্ব! বিলাস-ব্যসনই হ'ল তার একমাত্র পাথেয়।

তাই জীবনের রূপ আজ হ'য়েছে বিকৃত, কিন্তু ত্যাগের পরাকাষ্ঠা পেয়েছে নিজেকে প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ অবকাশ। সে জয় ক'রেছে মানুষের দেহ-মন। এমন কি সংস্কাররূপে শিরা উপশিরায় স্থায়ী আসন রচনা ক'রে পরিচালনা করে সে জীবন-ইতিহাস। তাই সুখ-দুঃখের অনুভূতিটা রূপায়িত হ'য়েছে তার রুচির জীবন্ত প্রতিচ্ছবিতে। বিপ্লবী মনটা চেনে সেই রূপ। জানে নিজস্ব দুর্ব্বলতার পরিচয়। তবুও সে অসহায়! পোষা পাখীর মত হতচেতন হ'য়ে শুধু ঝিমোয় দিনের পর দিন। তাই এই ব্যাভিচার ও অনাচারের রূপ আজ আর তার কাছে প্রকটতর হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করে না, বরং সেটাই তার চোখে জীবনের সহজাত ধারা ব'লে প্রতীয়মাণ হ'য়ে চলেছে যুগের পর যুগ এবং চল্‌বেও চিরদিন ; এটাই মানুষের রূঢ় জীবন-ইতিহাস··· !

মনীষার মনের দ্বন্দ্ব শেষ হয়নি আজও। কখনও সে আজন্ম সংস্কারের কাছে মাথা নত করে, কখনও বা তার বিপ্লবী মনটা এই স্থায়ী লোকাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার অবকাশ খুঁজে বেড়ায়। তাই সে কখনও স্থির, কখনও বা চঞ্চল—নিজস্ব চিন্তার আবেগ ও উত্তেজনার প্রাবল্যে।

কখনও সে মরমীপ্রকাশের কাছে দূরত্বের ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে—কখনও বা অনিতাকে নিয়ে মাতামাতি করে। আবার কখনও মনটা তার ডুকুরে কেঁদে ওঠে—এই যে আত্মপ্রতারণা—এর মূল্য কি সে ফিরে পাবে কোনদিন ? এই যে হৃদয় ও মনের সঙ্গে অকারণ জুয়াখেলার দ্বন্দ্ব, এর শেষ কি হবে না কোনকালে !

উত্তর খুঁজে পায় না মনীষা। হয়ত শেষ হ'বে ! একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে যাবে—যেদিন তার জীবনের শেষ চিহ্নটুকু মুছে যাবে ধরণীর ধুলির সঙ্গে একাকার হ'য়ে। তার পূর্ব্বে নয়—না, না—সম্ভবও নয় কোনদিন !

বাড়ীতে এসেছে বহু পরিচিত অপরিচিত আত্মীয়-স্বজন। তাঁদের সম্মুখীন হওয়ার ইচ্ছাটুকুও তার নিঃশেষ হ'য়ে গেছে একেবারে। অথচ অকারণ লজ্জায় তাকে জড়ীভূত হ'তে দেখা যায়নি এর পূর্ব্বে। কেমন যেন পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে তার জীবনে। আজ একা একা থাকতেই তার ভাল লাগে—এতেই সে পায় তৃপ্তি।

অনুসূয়াদেবী এর কারণ খুঁজে পান না। কিন্তু অদ্বৈতকুমারবাবু বোঝেন বিপ্লবের দানা অঙ্কুরিত হ'য়েছে কোথায়! তাই তিনিও আজ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত। এর শেষ পরিণতি যে কোথায়—কে জানে!

অনিতার শরীরটা সুস্থ নেই। তাই একাই এসেছিল মরমীপ্রকাশ। মনের সেই অকারণ শঙ্কা তার আর নেই। নিশ্চিন্তে দ্বার পর্য্যন্ত এসেই থম্‌কে দাঁড়ালো একটিবার। পরিচিত ও অপরিচিত কণ্ঠের সমন্বিত স্বর ভেসে আস্‌ছে ধীরে ধীরে। কি করা উচিত—দ্বিধা মিশ্রিত চিত্তে মরমীপ্রকাশ ভেবে নিল একটিবার। কারণ নোতুন আত্মীয়দের চোখে তার উপস্থিতিটা কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর ব'লে প্রতিপন্ন হ'য়েছে ইতিপূর্ব্বে। এর জন্য তাকে জবাবদিহি দিতে হয়নি সত্য—কিন্তু মাসীমাকে রীতিমত বিব্রত হ'তে হ'য়েছে, তাঁদের কুতূহলী দৃষ্টির সম্মুখীন হ'য়ে। তাই ত মনে তার জাগে সঙ্কোচ!

ঠিক সেই সময়েই মনীষার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—এ-ঘরে চলে এসো।

স্বস্তি ফিরে পেল মরমীপ্রকাশ। এইটুকুই যেন সে মনে-প্রাণে খুঁজে বেড়াচ্ছিল এতক্ষণ।

ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে পালঙ্কের উপর ব'স্‌লো মরমীপ্রকাশ। মনীষা উঠে দাঁড়ালো। ব'ল্‌লো—একটু বসো—চা নিয়ে আসি!

বাধা দিল মরমীপ্রকাশ—থাক্ না মনীষা। একটু পরেই না হয় হবে।

হাস্‌লো মনীষা! ব'ল্‌লো, তা' কি হয়! পরমুহূর্ত্তে মরমীপ্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—এখানেই না হয় স্পিরিট-ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে ক'রে দিই একটু!

হাস্‌লো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লো—মনের কথাটা তা হ'লে বুঝ্‌তে পেরে গেছ!

উত্তর দিল না মনীষা। হাস্‌লো একটুখানি।

কয়েক মিনিট পরে চায়ের কাপটা হাতে তুলে দিয়ে বেতের মোড়াটা টেনে নিয়ে, অসঙ্কোচে ব'স্‌লো ঠিক তার মাথার কাছ ঘেঁসে। ব'ল্‌লো—অনিতা মাকে নিয়ে এলে না যে—

শরীরটা ভাল নেই! তবুও ছাড়্‌তে কি চায়, অনেক বুজিয়ে রেখে এসেছি। ব'লেছি, কথা না শুন্‌লে তোমার মাসীমা রাগ্ ক'র্‌বেন ভীষণ।

একটু গভীর ক'রে কি যেন ভেবে নিয়ে ব'ল্‌লো মনীষা—নিয়ে এলেই পার্‌তে—আর কটা দিনই বা আছি এখানে!

মরমীপ্রকাশ উত্তর দিল না। চা শেষ ক'রে কাপটা নীচে নামিয়ে রাখ্‌তে গেল—বাধা দিয়ে উঠ্‌লো মনীষা—দাও, আমার হাতে দাও।

কাপটা নামিয়ে রেখে, মৃদুহাস্যে মনীষা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লো—হঠাৎ এতো গম্ভীর হ'য়ে গেলে যে?

সকরুণ-কণ্ঠে উত্তর দিল মরমীপ্রকাশ—কেন, তুমি কি তা জানো না?

ম্লান, মৃদু হাস্‌লো মনীষা। ব'ল্‌লো—আমার মনও কি যেতে চায় প্রকাশদা'! কিন্তু কি করি ব'লো—বাবার শরীরটা যে একেবারে

ভেঙে পড়েছে। তাঁর দিকেও ত ফিরে তাকানো উচিত একটিবার!

সবই বুঝি মনীষা! একটু থেমে বল্‌লো, কিন্তু আমার মন কি ব'ল্‌ছে জানো? তুমি যাচ্ছো—ইচ্ছা ক'রেই যাচ্ছো। হয়ত আর ফিরেও আস্‌বে না কোনদিন! মরমীপ্রকাশের চোখের পাতাগুলো সজল হ'য়ে উঠ্‌লো।

ছিঃ! তুমি কাঁদ্‌ছো!···মনীষা ভুলে গেল নিজেকে। মরমীপ্রকাশের কণ্ঠ-লগ্ন হ'য়ে সযত্নে আঁচল দিয়ে মুছে দিল তার চোখের পাতাগুলো। তারপর ধীরে ধীরে মাথাটা বুকের উপর রেখে নিজেও স্থির হ'য়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো—স্বেচ্ছায় কি আমারও যেতে ইচ্ছা ক'রে প্রকাশদা'! কিন্তু উপায় কি ব'লো—আমি যে নারী! চোখের পাতা তারও সিক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

বাইরে কার যেন পায়ের অস্পষ্ট খস্ খস্ একটা শব্দ শোনা গেল। সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লো মরমীপ্রকাশ। ধীর কণ্ঠে ডাক্‌লো, মনীষা!

কোন উত্তর নেই। যেন নিশ্চিন্তে মাথাখানা তার বুকের উপর রেখে ঘুমিয়ে প'ড়েছে মনীষা।

পুনরায় ডাক্‌লো মরমীপ্রকাশ—মনীষা!

বাইরের সেই শব্দটা আরও একটু যেন স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্‌লো। ভয় ও লজ্জায় মরমীপ্রকাশের হৃদয় কেঁপে উঠ্‌লো সঙ্গে সঙ্গে। মিনতি ভরা কণ্ঠে পুনরায় ডাক্‌লো—মনীষা!

চোখ মেলে তাকালো মনীষা। অস্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিল, কিছু ক ব'ল্‌ছো?

হ্যাঁ। কে যেন আস্‌ছে এই দিকে।

ভয় কিসের প্রকাশদা? ধীর অথচ শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল মনীষা। ব'ল্‌লো, অন্যায় ত কিছু করিনি!

মরমীপ্রকাশ উত্তর খুঁজে পেল না। ভয়ে মুখখানা তার বিশীর্ণ হ'য়ে ওঠে।

মনীষা কয়েক মিনিট পরে খাড়া হ'য়ে উঠে ব'স্‌লো। ব'ল্‌লো—বহু কষ্টে আত্মগোপন ক'রে ছিলাম প্রকাশদা', কিন্তু তোমার চোখের জল আমার সেই দৃঢ়তার সমস্ত বাঁধন ছিন্ন ক'রে দিয়ে গেল। কোন কথাই আজ আর লুকাবো না আমি। লজ্জাও নেই আমার। তুমি ছাড়া যে পৃথক সত্তা অনুভব করার শক্তি আমার নেই !

তবুও মরমীপ্রকাশের সঙ্কোচ পিষ্ট ভয়ার্ত্ত মুখটা আত্ম-সচেতনে পুষ্ট হ'য়ে ওঠে না।

মনীষা ব'লে চল্‌লো—বুঝ্‌লে প্রকাশদা'—তোমরা পুরুষ। তোমাদের জাতের কথাই আলাদা। আমরা কিন্তু নারী ! আমাদের দেহ ও মন দুটো পৃথক সত্তার অধিকারী নয়। তাই যখন আমরা মন দিই, দেহটাকে পৃথক ক'রে রাখ্‌তে পারি না।—একটু থেমে ব'ল্‌লো—অথচ আত্মদানে যখন বাধ্য হই, মনটা, দু'মাস কিংবা ছ'মাস পরে, নিজের অজ্ঞাতেই নিজেকে দেয় বিলিয়ে—কিন্তু মনের স্ফুরণ সেরূপ আর হয় না—পার্থক্য শুধু সেখানেই।

কথাটা আবেগের আতিশয্যে ব'লে ফেলেই লজ্জায় ম্লান হ'য়ে প'ড়্‌লো মনীষা। অন্তরাত্মা তার কাৎরে উঠ্‌লো—একি ক'র্‌লে মনীষা ! এমন অসঙ্কোচে নারী-প্রকৃতির সকল আবরণ উন্মুক্ত ক'রে দিলে !—তোমার আর নিজস্ব সঞ্চয় রইলো কি ! কিসের ভরসায় পুনরায় তুমি দাঁড়াবে পুরুষ-প্রকৃতির কাছে ! ছিঃ, ছিঃ—কাজটা ভাল করোনি মনীষা !

মনীষা আর ব'স্‌লো না। লজ্জায় ঘর থেকে একরকম ছুটেই বেরিয়ে গেল সে।

বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হ'য়ে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো

মরমীপ্রকাশ।…হয়ত আচরণটা তার অশোভন হ'ল—ব্যথাও হয় ত মনীষা পেল মনে-প্রাণে, তবুও আঘাত তাকে হানৃতেই হ'ল—হায়রে কাপুরুষ মন!…ভাবে মরমীপ্রকাশ, যেটুকু পাওয়ার তৃষার হৃদয় হ'য়েছিল ব্যাকুল, সেই অবসরটুকু যখন নিবিড় ভাবে এলো জীবনের দ্বারে তখন সে ভারের বোঝায় হ'ল রূপায়িত।—তাই দীর্ণ ব্যথাই হয় তোমার জীবনের চির সহচর।

* * * *

অনিতা সুস্থ হ'য়ে উঠেছে। মনীষা তাকে নিয়েই ব্যস্ত। একদিনও আর সে মরমীপ্রকাশের সম্মুখীন হয়নি। নিজের আচম্বিৎ আত্মপ্রকাশে নিজেই লজ্জা ও অনুশোচনায় মরমে মরে র'য়েছে সে। তাই কৃত্রিম এই আবরণের আভরণে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার অবকাশ, নিজেই নিয়েছে বেছে।

মরমীপ্রকাশ বার বার আসে, অকারণ উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে আসরটাকে জমিয়ে তোলার চেষ্টা করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুর-সাধনাও ক'রে, তবুও মনীষার কোন সাড়া নেই, কোন শব্দ নেই। সে যেন নিথর হ'য়ে পড়েছে—কোনরূপেই আর তাকে জাগানো যাবে না।

মরমীপ্রকাশের হৃদয়টা নিরাশার বেদনায় মুষ্‌ড়ে পড়ে। নিজেই নিজের প্রতি দোষারোপ ক'রে—হায়রে মূর্খ! যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার আশায় এতদিন হৃদয় তোমার ছিল ব্যাকুল—সেই অবসর যখন এলো দ্বারে, তখন নিজেই দিয়েছে দূ'রে ঠেলে—তাই আক্ষেপটাই হ'ল জীবনের শেষের সঞ্চয়! একেই অবলম্বন ক'রে পাড়ি দিতে হ'বে—বাকী এই খেয়া পথ। এছাড়া গতি নেই, মুক্তিও আস্‌বে নাকোন দিন!

* * * *

যাওয়ার দিন স্থির। রাত্রির-ট্রেনে রওনা হ'বেন অদ্বৈতকুমারবাবু ও মনীষা। মনটা সকলেরই ভার ভার। বিশেষ ক'রে অনুসূয়াদেবীর। তিনি মা—বোঝেন মনীষার এই যে জিদ, এটা একটা আবরণ—একটা উপলক্ষ্য। আসলে. সে নিজেই নিজেকে দিতে চলেছে চিরতরে বিসর্জ্জন।… মরমীপ্রকাশকে এর জন্য দায়ী করা যায় না। সত্যই সে সংযত ও সংযমী পুরুষ। কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি চোখে তাঁর পড়েনি কোনদিন। এই যে বিপর্য্যয়, এর জন্য একমাত্র ভাগ্য ছাড়া অন্য কাউকেই দায়ী ক'র্‌তে পারেন না তিনি।… তবুও তাঁর হৃদয়ে একটু ক্ষীণ আশার আলো জাগে, যদি দেশ বিদেশে ঘুরে মনটা তার হয় স্থির, জাগে যদি নোতুন কোন আশার সন্ধান!

রাত্রি ন'টায় ট্রেন। মরমীপ্রকাশও সঙ্গে গেল তাদের তুলে দিতে। মৃদঙ্গকুমার ও অনুসূয়াদেবী বসে র'য়েছেন অদ্বৈতকুমারবাবুর পাশে। নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে পাইপ টেনে চলেছেন তিনি। অনুসূয়াদেবী বার বার উপদেশ দিচ্ছেন, যদিও সঙ্গে তোমার মনীষা রইলো, ভয়ের তেমন কিছু নেই, তবুও মনে একটু শঙ্কা জাগে বইকি! ও ত গৃহী নয়, যখন যা প্রয়োজন চেয়ে নেবে। বিশেষ ক'রে ওর প্রতি একটু লক্ষ্যও রাখ্‌বে। শরীরটা ওর ভেঙে প'ড়্‌ছে দিনের পর দিন—তাই বাধা দিলাম না, বরং দু' মাস ঘুরেই আসুক বাইরে থেকে।

মৃদঙ্গকুমার মৃদু প্রতিবাদ ক'রে উঠ্‌লো—কি যে বলো মা! আমি ত দেখ্‌ছি দিন দিন ও মেদ-বহুল হ'য়ে উঠ্‌ছে। এর আগে ওকি ছিল বলতো? হাওয়ায় যেন দোলে—

পাশেই দাঁড়িয়েছিল মরমীপ্রকাশ। অনুসূয়াদেবীর কথাটাকে সমর্থন ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—সত্যই শরীরটা ওর ভেঙে প'ড়েছে অনেকখানি।

গম্ভীর মনীষা এতক্ষণে মৌনতা ভেঙে প্রথম কথা কইলো—আমার কিছুই হয় নি। তোমাদের মাথাব্যথার কোন প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গটাকে

এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মরমীপ্রকাশকে ব'ল্‌লো—সেতারখানা আমার কোথায় তুলে রাখ্‌লে—প'ড়্‌ছে না ত চোখে?

মরমীপ্রকাশের ব্যথিত শুদ্ধ হৃদয় মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাস্যে উত্তর দিল, ওপরে। তোমার মাথার ওপরেই রেখেছি!

ঠিক ক'রে বেঁধে দিয়েছো ত?

হ্যাঁ! পৌঁছেই কিন্তু চিঠি দেবে—বুঝ্‌লে!

দেবো। অনিতা-মাকে কেন সঙ্গে নিয়ে এলে না একটিবার!

আস্‌তে সে চেয়েছিল—রাত হ'য়ে যাবে, ঠাণ্ডা লেগে যদি আবার পাল্‌টে পড়ে! তাই—

চকিতে মনীষার সুপ্ত মাতৃ-হৃদয় সজাগ হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ল্‌লো, ভালই ক'রেছো। টেনে একটু হেসে পুনরায় ব'ল্‌লো—দু'দিনের জন্যে চ'লেছি, তাতেই তোমাদের মুখ এত ভার! আর যদি চিরদিনের জন্যে চলে যাই—

মরমীপ্রকাশ তীব্র প্রতিবাদ ক'রে উঠ্‌লো—ছিঃ মনীষা। ওকথা কি মুখে আন্‌তে আছে!

মনীষার সঙ্গে চোখাচোখি হ'য়ে গেল মরমীপ্রকাশের। লক্ষ্য ক'র্‌লো মনীষা, অশ্রুভারে সিক্ত হ'য়ে উঠেছে তার চোখের পাতাগুলো। কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে ভেবে নিল, সে ত নিজেও কাঁদ্‌ছে—আর ওকে বৃথা কাঁদিয়ে লাভ কি! কিন্তু সহসা উত্তর খুঁজে পেল না। নিজেকে সংযত করার উদ্দেশ্যেই মুখ ফিরিয়ে নিল ফাঁকা জান্‌লাটার দিকে।

দ্বিতীয় ঘন্টি বেজে উঠ্‌লো। অদ্বৈতকুমারবাবু ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন, সময় এবার হ'য়ে এলো! তোমরা এবার সব একে একে নেমে যাও। মৃদঙ্গ,—ঘরে নোতুন-বৌ আর তোমার মা রইলো। বুঝে-সুজে একটু চলো—বুঝ্‌লে! বেশী দিন তোমাদের ছেড়ে থাকা আমার অভ্যাস নেই—দু' একমাস পরেই হয়ত ফিরে আস্‌বো। মরমীপ্রকাশ, তুমিও একটু

দেখাশুনা ক'রো—মাঝে মাঝে চিঠি পত্তর দিও। একটু থেমে ব'ল্লেন, অনিতা দিদিকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। সহসা অসুস্থ হ'য়ে প'ড়্লো—ওর মা'র কথা ভেবেই কথাটা আর পাড়্তে সাহসী হ'লাম না। ও কাছে থাক্লে মনীষা খুশী হ'তো—সঙ্গীও পেতো একজন। বোঝ ত নোতুন জায়গায় সাথী মেলা ভার!

ও ত যেতে চেয়েছিল বরং বাধা দিয়েছি আমি নিজেই। ভয়েই নিয়ে আসিনি—যদি বেঁকে ব'সে! উত্তরে মৃদু হাস্লো মরমী-প্রকাশ।

মনীষা মুখ ফিরিয়ে ব'ল্লো, ভালই ক'রেছো। বেচারা অহেতুক দুঃখ পেতো আর চোখের জলে ভাস্তো—

গাড়ী থেকে নেমে এলেন অনুসূয়াদেবী ও মৃদঙ্গকুমার। মরমী-প্রকাশ পূর্ব্বেই নেমে এসে মনীষার আসনের পাশে ছিল দাঁড়িয়ে। সিগ্‌ন্যাল পোষ্টের লাল আলো নীল হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ঘণ্টি বেজে উঠ্‌লো।

গাড়ী ভোঁ দিয়েই চ'ল্‌তে সুরু ক'র্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চ'ল্‌লো মরমীপ্রকাশ। জান্‌লার ফাঁকে মুখখানা বাড়িয়ে দিয়েছে মনীষা। উভয়ের চোখে জল, অথচ ভাষা তাদের নিঃস্পন্দ ও নীরব।···

গাড়ীটার গতি একটু বাড়্‌লো। মরমীপ্রকাশ আর নিজেকে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লো না। মৌনতা ভেঙে শুধু ব'লে উঠ্‌লো—সত্যই তুমি চলে যেতে পার্‌লে মনীষা! পার্‌লে—

মনীষা উত্তরের ভাষা খুঁজে পেল না। শুধু গণ্ড বেয়ে তার গড়িয়ে প'ড়্‌লো ফোঁটা কয় অশ্রু। আলো-আঁধারে স্পষ্ট ক'রে দেখা না গেলেও মরমীপ্রকাশ স্পষ্টই অনুভব ক'র্‌লো, আজ হৃদয়ে হাহাকার তার একার নয়, সেই ব্যথার অনলে জ্বল্‌ছে মনীষা নিজেও।

গাড়ীটা প্ল্যাট্‌ফর্মের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছালো। তবুও গাড়ীর গতির সঙ্গে তাল রেখে ছুটে চলেছে মরমীপ্রকাশ। শুষ্ক বিবর্ণ পাণ্ডুর তার মুখ, উদ্‌ভ্রান্ত চোখের তারা দু'টো। মনীষার ভয় হ'ল হোঁচট্‌ খেয়ে হয়ত এখুনি গড়িয়ে যাবে চাকার তলায়। চাপা কণ্ঠে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—সংযত হও প্রকাশদা'—একটা অনুরোধ আমার রাখো!

সম্বিৎ ফিরে পেল মরমীপ্রকাশ। সত্যই একি ক'রে চ'লেছে সে। মুহূর্ত্তের ব্যবধানে তার ত আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না এ জগতে। থম্‌কে দাঁড়িয়ে প'ড়্‌লো মরমীপ্রকাশ। গাড়ীটা নির্ম্মমের মত চ'লেছে এগিয়ে। তার ঘস্‌ ঘস্‌ শব্দ বুকের প্রতিটি পাঁজর নির্ম্মমভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিতে লাগলো তবুও—স্থির·দৃষ্টে দাঁড়িয়ে রইলো প্রকাশ।

মনীষাও তেমনি করুণ দৃষ্টে তার দিকে ছিল তাকিয়ে। জলভরা চোখের পাতা দু'টো তার আবেগে টল্‌মল্‌ ক'র্‌ছে—স্পষ্টই দেখ্‌তে পেল মরমীপ্রকাশ। মনে হ'ল গাড়ীর গতিবেগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেহটাও যেন তার ঝুঁকে পড়েছে বাইরের দিকে। ভয়ে শিউরে উঠ্‌লো মরমীপ্রকাশ। তবে কি স্বেচ্ছায় সে দেবে আত্মবিসর্জন?

সম্বিৎ ফিরে পেল সে পর মুহূর্ত্তেই! কিন্তু দূরের সেই জমাটবাঁধা অন্ধকারে—ঢাকা পড়ে গেল গাড়ী, পড়ে গেল মনীষা। শুধু পরিচিত অস্পষ্ট সেই কণ্ঠস্বরটা কুণ্ডলি পাকিয়ে ভেসে এলো—আমার মানস কন্যা অনিতা, তাকে মানুষ ক'রে তুলো—

মরমীপ্রকাশ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পার্‌লো না, অসহায়ের মত থপ্‌ ক'রে ব'সে প'ড়্‌লো—প্ল্যাট্‌ফর্মের ওপরে। ছুটে এলো মৃদঙ্গ-কুমার—হ'ল কি প্রকাশদা'? তোমার আবার কি হ'ল!

নিজেকে সাম্‌লে নিয়েছে মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লো—ও কিছু না কুমারসাহেব—মাথাটা ঘুরে গেল আপনি·· ।

*　　*　　*　　*

গাড়ী ছুট্‌ছে। মনীষার কোন খেয়াল নেই, অতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখ্‌ছে সে মরমীপ্রকাশকে। যতই ব্যবধান বাড়্‌ছে, দৃষ্টিশক্তি যতই ক্ষীণতর হ'য়ে আস্‌ছে, ততই দেহটাকে দিচ্ছে সে বাড়িয়ে। প্রথমে মাথা, তারপর গলা—তারপর দেহের অর্দ্ধাঙ্গ। শেষ পরিণামের কথা চিন্তা ক'রে ব্যাকুল হ'য়ে পাশে ছুটে এলেন অদ্বৈতকুমারবাবু। চেপে ধ'র্‌লেন তার হাতখানা। চাপা কণ্ঠে ডাক্‌লেন—মনীষা!

মনীষার জ্ঞান নেই—এলিয়ে ঝুল্‌ছে তার দেহের অর্দ্ধেক অংশটা। সযত্নে ভেতরে টেনে নিয়ে শুইয়ে দিলেন অদ্বৈতকুমারবাবু। চোখে, মুখে দিলেন জলের ছিটে। রুমালখানা দিয়ে হাওয়া ক'র্‌তে লাগ্‌লেন তার মাথার ওপর।

কেটে গেল কয়েক মিনিট। চোখ মিলে তাকালো মনীষা। অদ্বৈত-কুমারবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই লজ্জায় ম্লান হ'য়ে উঠে বস্‌লো মনীষা।

বাধা দিলেন অদ্বৈতকুমারবাবু। ব'ল্‌লেন—না, আরও একটু বিশ্রাম নাও মা!

মনীষা মুখ তুলে তাকালো না। মৃদুকণ্ঠে ব'ল্‌লো—মাথাটা হঠাৎ একটু ঘুরে গিয়েছিল বাবা! কয়লার গুঁড়োগুলো চোখের পাতায় উড়ে এসে পড়্‌লো—নিজেকে ঠিক সাম্‌লাতে পার্‌লাম না—

ম্লান একটু হাস্‌লেন অদ্বৈতকুমারবাবু। ব'ল্‌লেন, ও কিছু না মা। মানুষের শরীর কি সব সময় ঠিক থাকে? তার জন্যে তোমার এত লজ্জা কিসের বলতো?

শেষ পর্য্যন্ত তিনিও নিজেকে চেপে রাখ্‌তে পার্‌লেন না। বুক ভেদ ক'রে নেমে এলো চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস! মনটা তাঁর হাহাকার ক'রে উঠ্‌লো—ওরে পাগোল মেয়ে, বেদনা কি তোর একার। বাপের হৃদয়টাও যে পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়—তাকিয়ে কি দেখেছিস্ একটিবার!

—কত দুঃখে, কত বেদনায় যে তাকে নির্ম্মম হ'তে হয়, তা এক অন্তরযামী ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কেউ জানে কি কোনকালে! হায়রে—রূঢ় বাস্তব জগত!...

*   *   *   *

মরমীপ্রকাশ ষ্টেশন থেকে ফিরে এলো বটে কিন্তু পৃথিবীর আলো-বাতাসটুকুও যেন তার কাছে অসহনীয় বোধ হ'তে লাগ্‌লো। একটানা বিরাট শূন্যতার বেদনায় বুকখানা তার জীর্ণ হ'তে লাগলো প্রতিটি পলে। কোন কিছুরই অভাব নেই তার, তবুও একটা অস্বস্তির বোঝায় অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে দেহ-মন। অকারণে বার বার বুক ভেদ ক'রে নেমে আসে তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

স্পষ্টই সে অনুভব ক'রে—মনীষা আর কোনদিনই ফিরে আসবে না তার জীবনে। শুধু, বেঁচে থাক্‌বে তার স্মৃতি। তার বেশী আশা করা বৃথা। ওই বেদনাটুকুই হবে তার জীবনের শেষ অবলম্বন। হবে, যাত্রা পথের শেষের পাথেয়!

কয়েকদিনের মধ্যেই নিজেকে খাড়া ক'রে তুল্‌লো মরমীপ্রকাশ। ফিরে এলো সে তার পুরাণো জীবনে। কোলে তুলে নিল তার দাদুর প্রিয় সেই বেহালাখানা। পাশে রইলো অনিতা, মনীষার মানস কন্যা। হ্যাঁ, আজ তাকেই গড়ে তুল্‌তে হবে। সেই গুরুভারটুকুই অর্পণ ক'রে গেছে সে নীরবে। তার বেশী যে তার কামনা ছিল না তা নয়, কিন্তু মুখ ফুটে সে চায়নি কোনদিন। সুতরাং এর মূল্য তাকে দিতেই হবে, এমন কি নিজের জীবনের বিনিময়েও।

মীরার সঙ্গে শেষ হ'য়ে গেছে তার সকল বোঝা পড়া। কথা সে কইলো না—চাইলোও না কোন কিছু।...কিন্তু কর্ত্তব্য তার, তাকে ক'রে যেতেই হবে। ত্রুটি সে রাখ্‌বে না জীবনে। দাদু তার চেয়েছিলেন, তাকে সুখী ক'রতে—তাই মনের মত বেছে নিয়ে এসেছিলেন একটি

নির্ব্বাক মোমের পুতুল। তার রূপ ও গুণের শেষ নেই—কিন্তু ভাষা ও প্রাণের আবেগ তার শূণ্য ব'লেই, জীবনটার রূপ আজ হ'ল এমনই বিকৃত। এলো চরম বিপর্য্যয়।

মরমীপ্রকাশ ভাবে, জীবনটাই দুর্ঘটনাময়! বিপর্য্যয় তার পাথেয়—আশা তার সেতু। সেই চলার পথে যা আসে—যা পাওয়া যায় সবই সত্য। তার জন্য মিথ্যা আক্ষেপ ক'রে কোন লাভ নেই বরং সেই দরদী অমর ও হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মা, পরপারে গিয়ে যাতে নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন—তৃপ্তি পেতে পারেন, সেই ব্যবস্থাই আজ ক'রে যেতে হবে তাকে। যেন তিনি উপলব্ধি ক'রতে পারেন—মরমীপ্রকাশ, তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষার করেনি অপমান। নিজেকে সে ক্ষয় ক'রেছে প্রতিটি পলে, তবুও নিরপরাধা নির্ব্বাক ওই মেয়েটিকে কোনদিন করেনি অবহেলা। তাকে এর বেশী সুখী সে ক'রতে পারেনি সত্য, কিন্তু তার কাছে সব কিছুই ত সঁপে দিয়েছিল সে নীরবে! সে যদি স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ না করে—তার জন্য ত দায়ী তাকে করা চলে না! সেই বেদনার ভার লাঘব ক'রতে গিয়েই ত জীবনে তার এলো নোতুন দুর্ভোগ—এলো বেদনার নোতুন কষাঘাত! এ-ভারের বোঝা কি আর সে কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌বে কোনদিন? ·· সহসা কে যেন তার চিন্তার স্রোতে ঘূর্ণী সৃষ্টি ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—না—না সে বোঝার বেদনা—আলো—একটা সুদীপ্ত উজ্জ্বল আলোর ঝলক। যার প্রভায় হৃদয় তার হ'ল রাঙা—পেল জাগ্রত জীবনের মধুর সুখ-পরশ, তাকে কি ভোলা যায় কোনদিন? না—যায় না—যাবেও না! নিজের অজ্ঞাতে বুক ভেদ ক'রে নেমে এলো একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস! সচকিত হ'য়ে মরমীপ্রকাশ তুলে নিল বেহালাখানা। সেই প্রাণীহীন তারের বুকে পর-মুহূর্ত্তেই জেগে উঠ্‌লো হৃদয়-রঙে রাঙা সেই সুরের মূর্চ্ছনা।

মীরা বুঝ্‌লো না কিছু। শুধু দেখ্‌লো গম্ভীর তার স্বামী। বিশীর্ণ তার মুখের ছায়াখানা। ভয় একটু সে পেল বইকি! অন্তরটা তারও

হ'ল দ্রবীভূত। ছুটে এলো সে পাশে। সুশীতল স্নেহ-পরশে তার দেহ-মনকে রাঙা ক'রে তোলার চেষ্টাও ক'র্লো আপ্রাণ। কিন্তু বুকের তার সেই জমাট বাঁধা রুদ্ধ ভাষা মুখর হ'য়ে ঠোঁটের পাতায় করে না আত্মপ্রকাশ। গোপনে সে ফেলে কয়েক ফোটা অশ্রু। তবুও স্বামীর বুকের সেই রুদ্ধ বেদনাটা, সামান্য এতটুকু সহানুভূতির অভাবে দীর্ণ হ'তে থাকে প্রতিটি মুহূর্তে।

মরমীপ্রকাশ সহসা আর ঘরের বাইরে যায় না। কথাও কয় না বড় একটা। নিঃশব্দে খায়, বিশ্রাম নেয়। তারপর ফিরে যায় তার সাধনা-মন্দিরে। প্রাণের সুরে সুর মিলিয়ে কখনও বাজায় বেহালা, কখনও সেতার, কখনও বা অনিতাকে শিক্ষা দেয়—এখন ভৈরবী বাজানোর সময়, বাজিয়ে দেখাও ত মা একটু। অনিতা বাজায়···মরমীপ্রকাশও যোগ দেয় তার সঙ্গে। একটু থেমে বলে—সূর্য্য উঠ্লো এবার। এখন যে সুর রূপ পাবে তার নাম টোরি—তার পর ন'টায় বাজ্বে জোন-পুরী—ভৈরবী।

অনিতা একমনে বাপের সঙ্গে ব'সে ব'সে বাজায়। মাঝে মাঝে উঠে যায়,—মনীষামাসীমার অনুকরণে নিজের হাতে চা তৈরী ক'রে নিয়ে আসে। বলে—খাও বাবা!

মরমীপ্রকাশ হাসে। বলে, আমার মনের কথা কেমন ক'রে তুমি এখুনিই বুঝ্তে শিখ্লে মা?

অনিতা হাসে। বলে—বারে! মাসীমা যে দিতো এমনি সময়ে! কত—দিন দেখেছি আমি।

মরমীপ্রকাশ উত্তর খুঁজে পায় না। ভাবে—হ্যাঁ, সত্যই যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, সেই একা বোঝে প্রাণের তৃষা কোথায়! কিসের পরশে পুনরায় তাজা হ'য়ে উঠ্বে প্রাণ! আজ সে কাছে নেই, তবুও প্রতিটি মুহূর্তে চোখের তারায় ভেসে ওঠে সেই স্মৃতি!

সন্ধ্যায় প্রতিদিনই একবার অনুসূয়াদেবীর বাসা থেকে ঘুরে আসে মরমীপ্রকাশ। বেশীক্ষণ থাকে না সেখানে। মনটা আকুলি-বিকুলি ক'রে ওঠে। অথচ দিনে একটিবার সেখানে পা না দিলে মনটাও স্থির থাকে না কোনমতে।

সঙ্গে যায় অনিতা। খোঁজ-খবর নেওয়া শেষ হ'লেই উঠে পড়ে মরমীপ্রকাশ।

অনুসূয়াদেবী বোঝেন সব—কিন্তু উপায় কি! সমাধানের সমস্ত পথই যে আজ রুদ্ধ। ভাবেন, আহা! বাছার প্রাণের সে স্পন্দন আর নেই। দিনের পর দিন একটা নির্লিপ্ততার ছায়ায় মুহ্যমান হ'য়ে পড়েছে—সে।·· পরমুহূর্ত্তেই চোখে পড়ে যায় অদ্বৈতবাবুর লেখা—চিঠির গোটা গোটা সেই হরপ্‌গুলো।···ইচ্ছে ছিল, দু' মাস একটু ঘুরে শরীরটা ভাল ক'রে ফিরে যাবো তোমাদের কাছে—কিন্তু এ-জীবনে সে অবকাশ আর আস্‌বে কিনা সন্দেহ! মনীষার মুখের দিকে তাকানোই যায় না। মুখে তার সে লাবণ্যের ছটা নেই—বাসি-ফুলের মত ধীরে ধীরে গেছে শুকিয়ে। প্রাণের স্পন্দনে মুখর সেই প্রতিমা যেন প'ড়েছে ঘুমিয়ে—মুখে তার নেমেছে ঘন গম্ভীর কাল একটা ছায়া। নির্জ্জনে নির্ব্বাক হ'য়ে বসে সে যে কি ভাবে—কে জানে!

মরমীপ্রকাশের হাতে বাঁধা সেতারখানা সে দিন নাড়ে, পরিষ্কার করে—কিন্তু বাজায় না। মনে হয়, তার প্রাণে জেগেছে একটা শঙ্কা! যদি ওর তারগুলো যায় ছিঁড়ে, তা হ'লে সে বাঁচবে কিসের অবলম্বনে। তাই দেখেও দেখিনে, অথচ চোখের জল সামলাতে নিজেই অ-দেখার ভাণে এড়িয়ে চলি সে দৃশ্যটা।

সেদিন লক্ষ্ণৌ থেকে নোতুন একটা সেতার আনিয়ে দিলাম। মুখে তার ফুট্‌লো ক্ষণিক ম্লান একটু হাসি। বাজালোও কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে গেল সে তার পুরাণো যন্ত্রখানার কাছে। ভাবলাম, বাজাবে বুঝি

কিছুক্ষণ! কিন্তু কি দেখলাম জানো? সেখানা বুকে চেপে কাঁদতে লাগ্‌লো সে ফু পিয়ে ফুঁপিয়ে।

আমি বাপ, আত্ম-প্রকাশ ক'র্‌তে পারি না—তাই তাকে তার হৃদয়ের শোক প্রকাশের অবসর দিয়ে ঘুরে এলাম বাইরে। কিন্তু শান্তি পেলাম না মনে। একটা অব্যক্ত বেদনায় হৃদয়খানা আমার হাহাকার ক'র্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু উপায় কি! কি যে কর্ত্তব্য—তাও ভেবে স্থির ক'রে উঠ্‌তে পারিনি!

আজীবন আমি স্বাধীনতার পূজারী। কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী ছিলাম না—আজও নই। যদি ও শিশু হ'তো, হয়ত কোলে-পিঠে নিয়ে একটু ভুলোতে চেষ্টা ক'র্‌তাম, কিন্তু আজ সে বয়স ওর গেছে পেরিয়ে। মনটা আত্ম-প্রতিষ্ঠার পেয়েছে অবকাশ—তাই অসহায়ের মত নিরুপায়ে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু বারবার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করি।—হয়ত এটুকু ছাড়া দ্বিতীয় পথ আর নেই খোলা এজগতে।

অনিতাদিদির চিঠি দু'খানা পেলাম। একখানা দিয়েছে মনীষাকে, আরেকখানা আমাকে। শিশু বোঝে না, তাই যা মনে এসেছে তাই লিখেছে। মনে হল একথা বোধহয় মরমীপ্রকাশ কিংবা বৌমা উভয়ের কেউ জানে না ঘুণাক্ষরে। লিখেছে,—'মাসীমা, আজ দু'মাস হ'ল তুমি চলে গেছো—তবুও মনটা আমার সকল সময়ে কেমন কেমন করে। তোমার কথা যখনই মনে পড়ে, চোখের পাতাগুলো ঝাপ্‌সা হ'য়ে ওঠে। বাবা পাশে থাক্‌লে কোলে তুলে নেয়। মা কিন্তু খোকনকে নিয়ে ব্যস্ত সকল সময়ে। দেখেও দেখেনা ফিরে চেয়ে। জানো মাসীমা, বাবা আমায় একটু বেশী আদর-যত্ন ক'রে ব'লে, মা বার বার খোঁটা দেয়—বাপের আদুরে মেয়ে। অবশ্য বাবা একটু বেশী আদর করে বইকি! যা চাই তাই কিনে দেয়।

নোতুন সুর একটা শিখ্লাম। বাবা আজকাল বড় একটা কোথাও যায় না—শুধু সেতার, না হয় বেহালা নিয়ে নিজের ঘরে থাকে ব'সে। জানো মাসীমা, বাবা আর তেমন হাসে না, কথাও কয় না—কারও সঙ্গে। শুধু যা কিছু বলে আমাকে। তুমি কেমন আছো? চিঠি দাও না কেন? সত্যি ব'ল্‌ছি, তোমার জন্যে মনটা এত কেমন কেমন করে—তা বোঝাবো কেমন ক'রে?—দাদির কাছে গিয়েছিলাম, তিনি ভালই আছেন। বাবা রোজ সন্ধ্যায় ওখানে যায়। আমিও সঙ্গে থাকি। দু'দশ মিনিট পরে ফিরে আসি। তারপর বাবা আর আমি সেতার নিয়ে বসি। বাবা বোঝায়—এটা মুলতান, ওটা পূরবী, এটা ধানেশ্রী, ওটা ইমন্‌, এটা পুরীয়া, ওটা বাগেশ্রী! সবই শ্রী, কিন্তু মাথায় আমার ঢোকে না কিছুই। আজ দশ দিন ধ'রে রেওয়াজ ক'রে একটুখানি বুঝ্‌তে পেরেছি, কাকে বলে মুলতান—কাকে বলে পূরবী। শিখে নেবো ধীরে ধীরে। বাবাও ব'লে তাই!'

আর আমাকে কি লিখেছে জানো? লিখেছে—'দাদু, তোমাদের জন্যে সত্যি ব'ল্‌ছি বড্ডো মন কেমন করে। বাবা ব'লেছে ভাল ক'রে বাজাতে শিখ্‌লে তোমাদের কাছে নিয়ে যাবে। কথাটা সত্যি ত! বাবাকে এতটুকুও বিশ্বাস আমার হয় না দাদু! সকল সময়ে, কেমন যেন গম্ভীর হ'য়ে থাকে। কথা কয় না বড় একটা। কি যে ভাবে, কে জানে? যখন আর চুপচাপ ব'সে থাক্‌তে পারি না, ডাক দিয়ে উঠি—বাবা—ও বাবা, শুন্‌ছো। বহুক্ষণ ডাকা-ডাকির পর, কখনও উত্তর দেয়—কখনও বা দেয়ই না! সত্যি ব'ল্‌ছি দাদু, বাবার উপর কি রাগই না ধরে। কিন্তু হাসি মুখে যখন কোলে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি ব'ল্‌ছিলে মা, তখন কিন্তু ভুলে যাই সব। ভুলেই যাই, কি চেয়েছিলাম ব'ল্‌তে! হার মেনে যাই! সত্যই খোকনের চেয়ে

আমাকেই বাবা ভালবাসে বেশী। কিন্তু ব'ল্তো দাদু, সব ভুলে যাই কেন? ছোট ব'লে—না? তোমাদের মত বড় হ'লে ভুল্‌বো না কোনদিন—না?'

মনীষাও ছোট বেলায় ছিল ঠিক এই ধরণের। ওদের প্রাণের স্বচ্ছ এই কথা গুলো শুন্‌তে ভারি ভাল লাগে! ···ওর এই প্রাণ খোলা ভাষায় স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌ছি, দুটো জীবনে লেগেছে আগুন। তাদের কেন্দ্র ক'রে আছে যারা, তারাও পুড়্‌বে—হয়ত বিধাতার ইচ্ছাই তাই!

দুঃখ—দুঃখ ক'রে আমরা চীৎকার করি। অথচ সে কুরূপা কি সুরূপা—তার সঠিক পরিচয়ের ধার আমরা ধারি না। কিন্তু যেদিন তার সেই রুদ্র-রূপের সঙ্গে ঘটে নিবিড়তর পরিচয়, সেদিন শুধু বিস্মিত হই না—হতবাকও হই। ভাবি, কেন এমন হ'ল! এ কামনা ত ছিল না অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে!—তবুও ত আসে!···

নির্জ্জনে ব'সে আজ এ কথাটাই বার বার ভেবেছি মনে-প্রাণে। কিন্তু কোন হদিসই খুঁজে পায়নি। শুধু মনে হ'য়েছে, হয়তো চাইলে পাওয়া যায় না—আবার না চাইলেও, সে আস্‌বেই—এটাই জগতের রীতি!

কত বার ভেবেছি—অহেতুক দীর্ঘশ্বাস আর ফেল্‌বো না—বুকের পাঁজরাগুলো ঝাঁঝ্‌রা হ'য়ে যায়! তবুও পড়ে। অকারণেই আসে সে নেমে। বুঝ্‌লে—অনু! ওটা জোয়ার—ওর গতিবেগকে রুদ্ধ করা যায় না কোনদিন···"

চিন্তাধারার আবর্ত্তে অনুসূয়াদেবী নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, নিজেরই অজ্ঞাতে।

স্তব্ধতা ভেঙে মরমীপ্রকাশ ব'লে ওঠে—তা হ'লে, আজ উঠি মাসীমা!

সচকিত হ'য়ে ওঠেন অনুসূয়াদেবী। বলেন, একটু বসো। আর কিছু না হোক, এককাপ চা অন্ততঃ খেয়ে যাও!

আজ জীবনে আছে মাত্র সামাজিকতা, কিন্তু নেই হৃদয়ের অভিন্নতার সেই সুর। তাই সে বেসুরো হ'য়েই বাজে। এ কথা, বোঝে উভয়েই! তবুও জীবন-পথের যাত্রী যারা, চ'ল্‌তে তাদের হবেই! এটাই হ'ল রূঢ় বাস্তবের নির্ম্মম পরিচয়।

মরমীপ্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুসূয়াদেবীর দুঃখ যে জাগে না তা নয়, কিন্তু যখনই মনীষার মুখের ছায়াটা চোখের সামনে ওঠে ভেসে, তখনই তিনি হ'য়ে ওঠেন গম্ভীর। নিজেকে সংযত করার উদ্দেশ্যে যে কোন একটা অছিলায় নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যান দূরে।

মরমীপ্রকাশ বোঝে সব। তবুও আসে। যেখানে একদিন প্রাণ তার পেয়েছিল সূক্ষ্ম স্পন্দনের নিবিড় অনুভূতি, পেয়েছিল নিজেকে প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ অবসর—আজ সেই স্মৃতিটা যতই বেদনাদায়ক হ'ক্, তার সেই আকর্ষণের মোহটাকে হৃদয় থেকে একেবারে উপ্‌ড়ে ফেলার শক্তি তার নেই। তাই নিজেকে অবাঞ্ছিত জেনেও আসে বার-বার। রিক্ত-হৃদয়টাকে পুনরায় রাঙিয়ে তুল্‌তে চায়—সেই হারানো স্মৃতির মাদকতায়—যা তাকে ভুলিয়েছিল একদিন, আজও ভুলিয়ে রাখে, অন্ততঃ কয়েকটা মুহূর্ত্তের জন্য।...

* * * *

মনের সাথী তার আজ কেউ নেই। সেই বেদনায় মরমীপ্রকাশ জ্বলে মরে প্রতিটি মুহূর্ত্তে। অনিতা শিশু। হয়ত বোঝে না কিছুই, তবুও সে তারই আসে-পাশে ঘোরে। কারণে, অকারণে—বাবা, বাবা ব'লে তার সেই স্তিমিত হৃদয়কে রাঙিয়ে রাখার চেষ্টা করে। আপন-হারা মনটা মাঝে মাঝে তার করুণ ডাকে প্রকৃতিস্থ হয়। স্নেহ নির্ঝরিণীর

শীতল পরশে বুকের জালাটা শান্তও হ'য়ে আসে। তুলে নেয় বেহালাটা। রিক্ত হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীর স্বরে সুর মিলিয়ে তারের বুকে দেয় দোলা। মুর্চ্ছনায় ভরে যায় সারা ঘর।

বিস্মিত হয় অনিতা। খুশিভরা মুখে বলে, এমনি ক'রে—কবে আমি বাজাতে শিখ্‌বো, বাবা!

চকিতে শঙ্কায় ভরে যায় অন্তরখানা। অন্তরাত্মা চীৎকার ক'রে যেন ব'ল্‌তে চায়, না—না—না—এটা সার্থকতা নয় মা—এটা শূন্য বুকের দীর্ঘ হাহাকার—জীবনের রূঢ় অভিশাপ। এ রঙে রাঙা হ'তে চাস্‌নে মা! এর ব্যথা যেরূপ গভীর, এর দাহনশক্তিও তেমনি অনন্ত ও অসীম। না—না—না, তুই সুখী হ'—অন্তরে শান্তি পা'—শুধু এইটুকুই আমার জীবনের শেষ কামনা!·· কিন্তু—সচকিত হ'য়ে ওঠে মরমীপ্রকাশ। ভাবে, যে শিশু সে কি বুঝ্‌বে এর মর্ম্ম—না উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌বে এই রিক্ততার বেদনা! না—বুঝ্‌বে না সে কিছুই! তাই শুধু ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান শুষ্ক একটু হাসি হেসে জবাব দেয়—বড় হ'লেই বাজাতে শিখ্‌বে মা! ঠিক এমনটি না হ'লেও এর চেয়ে মধুর সুর তুমি বাজাতে পার্‌বে বইকি একদিন!—সে বিশ্বাস আমার আছে।

অনিতা পুনরায় প্রশ্ন তোলে, কবে বাবা?

পুনরায় ম্লান একটু হাসে মরমীপ্রকাশ। বলে—বড় হও আগে—

* * * * *

কথা ছিল অদ্বৈতকুমারবাবু ছ'মাস পরে ফিরে আস্‌বেন কিন্তু প্রায় দেড় বছর অতীত হ'তে চ'ল্‌লো—তবুও ফেরার নাম করেন না তিনি। স্বাস্থ্য তাঁর ভালই আছে—কর্ম্মশক্তিও তাঁর অটুট; তবুও তিনি চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ ক'রেছেন। মৃদঙ্গকুমারের কাছে এটা একটু বাড়াবাড়ি ঠেক্‌লেও অনুসূয়াদেবী নীরব। কারণটা তাঁর কাছে স্পষ্ট।

কিন্তু মৃদঙ্গকুমারের কাছে সব কিছুই কুহেলিকাপূর্ণ। যদিও তার জীবনে এসেছে সফলতা, হ'য়েছে যে সুখী—তবুও জীবনধারার রূপ পরিবর্ত্তনে হ'য়েছে সে বাধ্য। তার অনাবিল সেই আরাম ও অফুরন্ত বিলাসের হাট ভেঙে গেছে আচম্বিতে। ক্ষুব্ধ সে হ'য়েছে মনে-প্রাণে—কিন্তু পুঞ্জীভূত মনের ক্ষোভ প্রকাশ সে করেনি, ভেবে নিয়েছে যে বস্তুটা একজনের খেয়াল, অপরের কাছে সেটাই হয় বোঝা। ওকে এড়িয়ে চলাই ভাল। কারণ ও বস্তুটাকে প্রাধান্য দিলে বোঝাই শুধু বাড়ে—সমস্যার সমাধান হয়না কিছুতেই।...

* * * * *

দুপুরে ডাক-পিয়ন একখানা চিঠি দিয়ে গেল। লিখেছেন অদ্বৈতকুমারবাবু—"ইচ্ছা ছিল, তোমাদের কাছে ফিরে যাবো। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা বোধ হয় সেরূপ নয়। জীবনে জঞ্জাল ব'লতে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। এদের নিয়েই আমার সংসার।...আজ জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে, নিজের কথা বড় একটা ভাববার অবসর আর পাইনে। তবে তোমাদের জন্য মাঝে মাঝে চিন্তা হয় বইকি। একদিন শালগ্রাম শিলাও অগ্নি সম্মুখে রেখে—যে জীবনের সমুদয় ভার নিজের কাঁধে স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলাম—সে দায়িত্বের বোঝা যতই গুরুভার হোক্ —তাকে বহন ক'রতেই হ'বে—সেটাই জীবনের ধর্ম্ম! জানিনে এর মূল্য কতটুকু—সত্য কিংবা মিথ্যা—তবে এটাই সামাজিক জীবনের সংস্কার।...তার যে মূল্য দেয়—তার কাছে এ বস্তুটা মূল্যবান্, আর যে দেয় না—তার কাছে মূল্যহীন—কুসংস্কারের নামান্তর মাত্র।

যাক্ ও সব কথা—ওটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ঘরোয়া ব্যাপার। দীর্ঘদিন পাশাপাশি বাস ক'রে এ বিশ্বাসটুকু যদি সঞ্চয় ক'রতে না পেরে থাকি, তাহ'লে বুঝতে হবে সারা জীবনের সাধনাটাই ব্যর্থ হ'য়ে গেছে।

অতীন্দ্র সেন, সলিসিটর জেনারেল—দূর সম্পর্কে তোমাদের কোন এক আত্মীয় হবেন। তাঁর একটি ছেলে সবে মার্কিন মুলুক থেকে ফিরে এসেছে। কৃষি-বিদ্যা বিশারদের বিশেষণে বিশেষ ভাবে ভূষিত। সেদিন অতীন্দ্রবাবুর সঙ্গে পার্কে ব'সে আলাপ হ'ল। কথায় কথায় তিনি ব'ল্লেন, তাঁর ছেলের জন্য একটি মনোমত পাত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মনে হ'ল মনীষার কথা। ভাব্লাম, একটিবার চেষ্টা ক'রে দেখ্তে আপত্তি কি?

পরদিন ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হ'ল। বেশ ভদ্র, অন্ততঃ সাজ-পোষাকে, আদব-কায়দায়। স্পষ্টই জানাল সে সংসারের জালে আবদ্ধ হ'তে চাইনে, কারণ জীবনে আমার 'এম্বিষণ' অনেক। ইচ্ছা আছে, একবার ইউ, কে, যাবো—কিন্তু বাবার সে ভার বহনের শক্তি আজ আর নেই। তাই একটা চাকুরী নিয়েছি বর্ত্তমানে। তাতে দিন চ'লে যাচ্ছে বেশ, কিন্তু মনের গোপন বাসনাটা পরিপূরণের সামর্থ কুলায় না। তাই স্থির ক'রেছি—যদি তেমন কোন ধনীর—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই মাঝ-পথে থেমে গেল সে। মনে মনে কথাটা সম্পুর্ণ ক'রে নিলাম আমি নিজেই। তবুও বাপের মন প্রলুব্ধ হ'ল। বিশেষ ক'রে ধনীর সন্তান। দু'বেলা খাওয়া-পরা ও মাথা গোঁজার স্থানটুকুর ত অভাব হবে না কোনদিন। তার ওপর সলিসিটর জেনারেল ম'শায়ের টাকা সঞ্চয় নেই, একথা হলপ্ ক'রে ব'ল্লেও কি সহসা বিশ্বাস করা চলে? তাই ব'ল্লাম, কত টাকার প্রয়োজন?

উত্তরে সে ব'ল্লো—হাজার দশ নগদ, তারপর—আপনি সাজিয়ে দেবেন আপনার মেয়েকে।

ছেলেটিকে পচ্ছন্দ হ'য়েছিল আমার। তাই স্থির ক'রে ফেল্লাম, জীবনের সব সঞ্চয়টুকু শেষ ক'রেও এঁরই সঙ্গে মনীষার দেবো বিয়ে। রাজিও হ'য়ে প'ড়্লাম। লেন্-দেন্ প্রায় শেষ—হঠাৎ মনে হ'ল, মেয়ের

আমার বয়স হ'য়েছে—তারও ত একটা ব্যক্তিগত মতামত থাকা উচিত! কোন কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রেই পাকাপাকি কোন কিছু করা উচিত হবে কি!

তাই একটা অসমাপ্তির জের টেনে ফিরে এলাম বাসায়। ভেবেছিলাম, মনীষা মত দেবে নিশ্চয়। তার আচরণে একটা পরিবর্ত্তনের আভাষ লক্ষ্য ক'রেছিলাম কয়েক মাস থেকে। চঞ্চল স্বভাব যেন তার পুনরায় আপন স্বরূপেই আত্মবিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। প্রাণ-খোলা হাসিও সে হাসে পূর্ব্বের মত। এই বয়োবৃদ্ধ বাপের সুখ ও সুবিধার জন্য সকল সময়েই থাকে ব্যস্ত। ভেবেছিলাম, ভালই হ'ল! মনের উপর থেকে অহেতুক বোঝার সেই ভারটা নেমে গিয়েছে তার।

কিন্তু—কথাটা পেড়েই মর্ম্মাহত হ'লাম। বুঝ্লাম, ভুল বুঝেছি আমি! সে কি উত্তর দিলে—শুন্‌বে?

ব'ল্‌লে—তুমি ত সবই জানো বাবা! আর কেন মিছে দুঃখ দাও!

বোঝাবার চেষ্টা ক'রলাম, এরূপ দুর্ঘটনা প্রতি মানুষের জীবনেই এসে থাকে না, কিন্তু—সেটাই ত জীবনের সব কিছু নয়!

মনীষা ধীর ও শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল—কিন্তু মন?

দু'দিন পরে সেও স্থির হ'য়ে যায় মা!

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে মুখ তুলে তাকালো মনীষা। ব'ল্‌লো—দেহ ও মনের পৃথক সত্তা-বোধ যাদের নেই, তারাই স্থির হ'তে পারে—কিন্তু যাদের মন সত্যকার সজাগ, তারা ত আত্মপ্রতারণা ক'র্‌তে পারে না বাবা! মন যদি সাড়া না দেয়, দেহের সুখ-সুবিধাটা কি তৃপ্তিসাধন ক'র্‌তে পারে কোনকালে? না প্রাণের স্পন্দনে জীবনের সেই সাবলীল স্বচ্ছ রূপ বিকাশলাভ করে কোনদিন?

আমি বাপ—তবুও হার আমায় মান্‌তেই হ'ল। মুখ তুলে জবাব দেওয়ার ভাষা খুঁজে পেলাম না—আজও পাইনি। কোনদিন যে পাবো

সে ভরসাও আমার নেই। কথাটা খুবই খাঁটি। এতদিন এ প্রশ্নটাকে এড়িয়ে আমরা দেহের সুখ-সুবিধাটাকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। তার পিছনে যে একটা সজাগ মনের বাস আছে, সে কথাটা কোনদিনই ভেবে দেখার অবসর আমরা পাইনি। তাই স্থির ক'রেছি—ওর জীবনের গতি-পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি আর ক'রবো না কোনদিন। হয়ত ভাব্‌বে—ওটা আমার পিতৃ-হৃদয়ের সহজাত দুর্ব্বলতা। কিন্তু যদি একটু তলিয়ে দেখো—তুমি নিজেও বুঝ্‌তে সমর্থ হবে, এই যে অনাচার ও অত্যাচার চ'লেছে যুগের পর যুগ—এর পরিণাম শুভ হয়নি কোনকালে!– তাই যার আছে প্রচুর, সেও সুখী হ'তে পার্‌লো না সর্ব্বান্তঃকরণে, আর নেই যার—তার চিরদিনের সেই হাহাকারও ঘুচ লোনা কোন সময়ে।

বয়সটা বাড়্‌ছে। প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার বাসনাটা যেন দিনের পর দিন প্রকটতর হ'য়ে উঠ্‌ছে। যদিও বহু দূরে বসবাস ক'র্‌ছি, তবুও মনটা আমার তোমাদেরই আসে-পাশে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে সকল সময়। মনের কোণে যে কত দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা বাসা বাঁধ্‌ছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই উন্মুখ হ'য়ে ব'সে থাকি তোমাদের বার্ত্তাবহ ওই ছোট একটি চিঠির আশায়!···

মৃদঙ্গ আমার প্রতি হয়ত একটু ক্ষুব্ধ হ'য়ে থাক্‌বে! হওয়াটাই স্বাভাবিক। সেটা তার দোষ নয়—দোষ মানুষের প্রকৃতির। তবুও তাকে জানিয়ে দিও, সন্তান সে একা শুধু আমার নয় মনীষাও আমার সন্তান। প্রকৃতির রীতি অনুসারে সে পেয়েছে পুরুষ-প্রকৃতি। তার জন্য প'ড়ে র'য়েছে এই বিশাল পৃথিবী। তার হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনাকে সে কামনা ও বাসনার ছাঁচে ঢালাই ক'রে নেবে—কিন্তু মনীষা—আমার অবরুদ্ধ প্রকৃতির মূক প্রতিচ্ছায়া। তার গতি-পথকে গণ্ডী দিয়ে আমরা রুদ্ধ ক'রে রেখেছি চিরদিনের মত। সেই হৃদয়ের অপ্রকাশিত ব্যথা ও বেদনার কথা আর কেউ না বুঝুক,

আমি ত বুঝি! আমি যে তার জন্মদাতা পিতা। আমার জীবন-প্রকৃতির রুদ্ধ বেদনার প্রতিমূর্ত্তি সে। তাকে কি ত্যাগ ক'র্‌তে পারি সহসা! অবশ্য অন্ধ স্নেহ ও মমতার একটা আকর্ষণ আছে। তাকে উপেক্ষা করাও কঠিন। তাই কাছে যারা নেই—তাদের কথা বারবার স্মরণও ক'র্‌তে বাধ্য হই। কিন্তু যে বেদনাকে আমি চিনেছি ও মর্ম্ম দিয়ে উপলব্ধি ক'রেছি, তা'কে পদদলিত ক'রে নিজেকে পীড়ন ক'র্‌তে প্রস্তুত আমি নই। এটাই আমার শেষ কথা।..প্রীতি ও শুভেচ্ছা তোমাদের চলার পথ বন্ধন-মুক্ত করুক—এটুকুই আজ সর্ব্ব-শক্তিময়ের কাছে আমার শেষ কামনা। ইতি—

আঃ অদ্বৈতকুমার—

অনুসূয়াদেবী পুত্র-গতা প্রাণ। তার সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার ব্যূহ-চক্রে আত্মনিমগ্না তিনি। তাই চিঠিখানা পেয়ে খুশী হ'তে পারেন নি তিনি, বরং মনে মনে একটু ক্ষুব্ধই হ'য়েছিলেন। যদিও মনীষা তাঁর নিজস্ব গর্ভজাত, তার ব্যথা ও বেদনায় অন্তরাত্মা কাঁদেও বার বার, তবুও হৃদয়ের চিরন্তনী এক সূক্ষ্ম সেই মমত্বের আকর্ষণে মৃদঙ্গকুমারের ভবিষ্যৎ সুখ-সাধনের চিন্তায় তিনি আত্মবিভোর হ'য়ে থাকেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।...

* * * * *

মরমীপ্রকাশের ঠোঁটের কোণ থেকে হাসি ঝরে গেছে চিরদিনের মত। যদিও সদা গম্ভীর ও ধ্যানমগ্ন সে, তবুও মীরার প্রতি অনাদর বা অবহেলা প্রকাশ করে নি একটি মুহূর্ত্তেরও জন্য। বরং অন্তরখানা তার—তাকেই খুশী ক'র্‌তে চেয়েছে দিনের পর দিন। কিন্তু আত্মপ্রকৃতস্থা মীরা ধরা দিতে পারে না সহজে। হৃদয়ের সেই অপ্রকাশিত বেদনাকে, লুকিয়ে রাখার চেষ্টায় সে যতই দৃঢ় হ'তে চেয়েছে, ততই নিজেকে

সঙ্কুচিত ক'রে ফেলেছে নিজেরই অজ্ঞাতে। তাই—মুখ সে খুল্‌তে পার্‌লো না কোনদিন। হৃদয়ের ব্যথাও তার র'য়ে গেল তেমনি অপ্রকাশিত।

খোকনের পরেও নবগত দু'জন অতিথি পর পর দ্বারে এসে দিয়েছিল হানা। কিন্তু এ পৃথিবীর আলো-বাতাসের মোহ তাদের ধ'রে রাখ্‌তে পারেনি বেশীদিন। তাই মীরা খোকনকে কেন্দ্র ক'রে, হ'ল আত্মপ্রকৃতস্থ। হৃদয়ের সুখ-দুঃখের সাথী হ'ল সে একাই। তার সঙ্গেই সে কথা কয়, হাসে—আদরে, আবেগে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে চুমো খায় বার বার। বলে, আমার হৃদয়মণি ছাড়া কি কেউ, অন্তরের দুঃখ আমার বুঝ্‌বে সহসা!…

অসিতা পিতৃ-স্নেহে লালিত পালিত। পিতৃ-হৃদয়ের দুঃখ ও বেদনার সঠিক ইতিহাস হয়ত জানে না বা বোঝার বয়সও তার হয়নি—তবুও সে সেই শূন্য হৃদয়টাকে রাঙিয়ে রাখে অবিরত। তারই পূত আকর্ষণে মরমীপ্রকাশের অপ্রকৃতিস্থ ও অপূর্ণ হৃদয়, ফিরে পায় এক নিবিড়তর শান্তির পরশ। একদিন যে প্রদীপ শিখার লোহিত আভায় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ তার হ'য়েছিল দীপ্ত, সে দীপ-শিখা আজ দূরে সরে গেলেও—তার সেই পূত-স্মৃতি ও মমতার এই জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি—তাকে দিয়েছে নিজেকে চিনে নেওয়ার দীর্ঘ অবকাশ। তাই সে ব্যথায় আর তত সহজে মুষ্‌ড়ে পড়ে না মরমীপ্রকাশ। অবশ্য তারও পরিবর্ত্তন একটা সুস্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিয়েছে। নিজেকে একান্তে নিঃস্ব ক'রে বিলিয়ে দিয়েছে সে তার সাধনা-মন্দিরের ওই ক্ষুদ্র পরিসরের মাঝে। এ দৃশ্য দেখে খুশী হয় প্রতিবেশী। খুশী হ'ল আত্মীয়-স্বজন। তাঁরা ভাবেন, শান্তির পীযূষ-ধারা—নিঃশব্দে, নীরবে পান ক'রে চ'লেছে মরমীপ্রকাশ। কিন্তু শিউরে ওঠে মীরা। নির্জ্জনে মোছে সে চোখের জল। একি হ'ল? স্বপ্নেও ত এ বস্তু সে কামনা করেনি কোনদিন!

সে অন্তর দিয়েই ভালবাসে তার স্বামীকে। সে সুখী হোক, সুখে

থাক্—এই ত ছিল তার অন্তরের নিবিড়তম কামনা। কিন্তু এ স্তব্ধতা ত সে চায়নি জীবনে। হাসি-খুশিতে যে ছিল মুখর, কিসের বেদনায় সে এমনি নিথর হ'য়ে উঠ্ছে দিনের পর দিন!

অন্তর তার কাঁদে। ইচ্ছা হয় পদতলে লুটিয়ে মাথা কুটে বার বার জিজ্ঞাসা করে—ওগো—বলো, কিসের বেদনা তোমার? কোন প্রতিবাদ ত করিনি কোনদিন! তবে কেন হ'লে এমন নির্ম্মম পাষাণ? যদি দোষ কিছু ক'রে থাকি কভু—ওগো—শাস্তি দাও, শাস্তি দাও!...মধুর স্বরে একটিবার ডাকো—মীরা...মীরা ব'লে। দুটো কথা কও, একটু হাসো—শোন ওগো, শোন—এর বেশী কোন কামনা নেই আমার অন্তরে!

...কিন্তু ভাষা তার রুদ্ধ। নিরন্তর কাঁদে তার হৃদয়—তবু ত খুল্তে পারে না ঠোঁটের পাতা দুটো। কারণে, অকারণে বার বার ছুটে যায় কাছে। পাশে ব'সে গায়ে-পিঠে হাতও বোলায়—তবুও সে নির্ব্বাক।

চোখ তুলে মরমীপ্রকাশও ফিরে তাকায়। কিন্তু কি যেন সে গভীর ক'রে খুঁজে খুঁজে বেড়ায়! কিছুই বোঝে না মীরা। মাথা নত ক'রে বসে থাকে সে নীরবে।...

* * * * *

বয়সের সঙ্গে মুখর হ'য়েছে অনিতা। কখনও গান গায়, কখনও সেতার বাজায়। মরমীপ্রকাশ বিভোর হ'য়ে শোনে—শুধু শোনে। কখনও বা নিজেও তারের বুকে দেয় সুরের মূর্চ্ছনা। ঘরখানা বেদনার সুরে ভরপুর হ'য়ে ওঠে।

দূরে ব'সে শোনে প্রতিবেশী—শোনে আত্মীয়স্বজন। তারা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। কখনও বা তাদের বুকের সুপ্ত বেদনাটা সে সুরের সংস্পর্শে দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। অজ্ঞাতে চোখের কোল বেয়ে গড়িয়েও পড়ে ফোঁটা ফোঁটা জল। তবু ভাল লাগে তাদের। বার বার বলে—আহা!

মরমীপ্রকাশের সুনাম ও দুর্ণাম ছড়িয়েছে সমানে। কেউ বলে, অহংকারী, কেউ বলে, স্ত্রৈণ্য। অথচ সত্যকার যে সে কি—সে খবর কেউ রাখেনা কোনদিন। তবু ও তারা সমালোচনা করে।

কথাটা মরমীপ্রকাশেরও কাণে ভেসে আসে। হাসে মরমীপ্রকাশ। তবুও ত একটা উপাধি লাভ হ'য়েছে তার জীবনে! হয় সু না হয় কু, এই দুই গণ্ডীকে কেন্দ্র ক'রেই ত মানুষের জীবনের ইতিহাস রচিত হ'য়ে চলেছে যুগের পর যুগ। ওটা হবেই। নইলে মানুষ নামটা যে তার ব্যর্থ হ'য়ে যাবে, তার কল্পনা শক্তির তীক্ষ্ণ শলাকার পরিচয়টা যে রিক্ততায় পর্য্যবসিত হবে।

তবুও হাসে মরমীপ্রকাশ। ভাবে, লোকে ত জানে তারা সুখী। সেইটুকুই ত আজ তার জীবনের শেষের সঞ্চয়!...

* * * * *

কথাটা অনুসূয়াদেবীরও কাণে গিয়ে ওঠে। মনে সন্দেহের দোলা জাগে। সত্যই কি তাই? তবে মরমীপ্রকাশের সেই সৌম্যমূর্ত্তি, সদাহাস্য-মুখর প্রশান্ত সেই মুখ—এত বিমর্ষ ও বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে কেন? —সহসা, এমন অকারণ গাম্ভীর্য্যেই বা ম্রিয়মান হ'য়ে পড়েছে সে কেন দিনের পর দিন?

ঘুরে ফিরে অন্তরে তাঁর জাগে একই সেই প্রশ্ন—কেন...কেন... কেন...

কি জানি...মানুষের মনের কথা ত বলাও যায় না!...তার দু'দিনের আকর্ষণ, দু'দিনের খেলা—ভুলে যেতেই বা লাগে কতটুকু সময়? নইলে কথাটা এত র'ট্‌লোই বা কেন? প্রবাদ একটা আছে, যা রটে, মূলে তার কিছু না কিছু সত্য লুকিয়ে থাকে ত বটেই! মরমীপ্রকাশ হয়ত সত্যই ভালবাসে মীরাকে।

মীরার কোমল মধুর মুখের ছবিখানা ভেসে ওঠে তাঁর চোখের পাতায়। নিজের মনে নিজেই ব'লে ওঠেন—আহা যেন লক্ষ্মী-প্রতিমা! তাই হোক্—তাই হোক্—সুখীই হোক্ সে—

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই চোখে প'ড়ে যায় সদ্য-পাঠানো সেই মীরার এলবামখানা। ভাবেন বসে বসে পাগল মেয়েটার একি সেই মুখশ্রী? একি সেই রং··· সেই মধুর হাসি! না—না—সব ঝরে গেছে! যেন যোগিনী সেজেছে হতভাগিনী,·· জীবনে অল্পবিস্তর সবাই ভালবাসে, কিন্তু স্বেচ্ছায় যোগিনী সেজেছে কে কোন্‌দিন? দু'দিনের চোখের নেশা, দু'দিন পরে আপনিই যায় মুছে—জীবনের অবলম্বন যে বস্তু, সেই শেষে একান্ত আপনার হ'য়ে ওঠে। তাকে ভাল না বেসে কি মানুষ থাকতে পেরেছে কোনকালে!

সহসা অন্তরের অন্ততম প্রদেশ থেকে কে যেন প্রশ্ন ক'রে ওঠে—কিন্তু মন?

বিরক্তিতে সারা দেহ তাঁর রি-রি ক'রে ওঠে। নিজেই নিজেকে তিনি প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন, তার নাগাল মানুষ কি পেয়েছে কোনদিন? সে যে কি চায়—কি পেলে তার তৃপ্তি—সারা জীবনে কি কেউ তার পেয়েছে সন্ধান? তার আজ যা ভাল···কাল তা মন্দ—আজ যা মধু—কাল তা নিমের মত তেতো।···যার স্থিরতা নেই, যে চির চঞ্চল, তার পিছু ধাওয়া করে কারা? যারা অবুঝ—যারা উন্মাদ—যাদের হিতাহিত বোধ নেই এ-জগতে!

···কিন্তু সংসারে বড় কে? দেহ না মন? তৃপ্তি কার? দেহের না মনের?—দেহ যদি তৃপ্তি বোধ না করে—মন কি তার স্বচ্ছন্দতা ফিরে পায় কোনদিন—না তা সম্ভব এ-জগতে?

কিন্তু মনও যদি তৃপ্ত না হয়, দেহের সত্তা কি স্বস্তি-বোধ করে কোনদিন? মনের বোঝাই কি দেহটা ব'য়ে চলে না আজীবন?

উত্তর খুঁজে পান না অনুসূয়াদেবী—কে বড়? দেহ না মন—মন না দেহ?

চোখের দৃষ্টি তাঁর সহসা ঝাপসা হ'য়ে ওঠে। কোনটাকেই অস্বীকার ক'র্‌তে পারেন না তিনি। মন ছাড়াও দেহের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না—আবার দেহ ছাড়াও মনের পৃথক অনুভূতির পরশ অনুভব করা যায় না—সত্য উভয়েই। এক ছাড়া অপরের স্থান নেই—জীবনটা উভয়েরই খেলাঘর।...

নিস্তব্ধতার মধ্যে কেটে যায় কয়েক মিনিট। অনুসূয়াদেবী আন্‌মনে ফটোটা তুলে নেন নিজের কোলে। বার বার নিবিড় ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখেন সেই ফটোখানা। চোখের পাতাগুলো তাঁর ঝাপসা হ'য়ে ওঠে। সত্যই কিযে ছিরি হ'য়েছে মেয়েটার। চোখের কোলটা গেছে বসে,—দৃষ্টিটা যেন হ'য়েছে নিষ্প্রভ। গলার কণ্ঠাটা স্পষ্টতর হ'য়ে উঠেছে।—কই এতদিনের মধ্যে কোন দিন ত তাঁর চোখে পড়েনি এ দৃশ্য! রূপের জৌলসের অভাব হয়ত ছিল, কিন্তু লাবণ্যের অভাব ত ছিল না কোন-দিন! তবে—

সহসা একটা পুরোণো চিঠি দৃষ্টি তাঁর ক'র্‌লো আকর্ষণ। কয়েক সপ্তাহ আগে, ডাকে এসেছিল সেখানা—প'ড়েও দেখেছেন তার প্রতিটি ছত্র। তবুও তুলে নিলেন পুনরায়। প'ড়তে সুরু ক'র্‌লেন নোতুন ক'রে।

লিখ্‌ছেন অদ্বৈতকুমারবাবু,—"তোমার চিঠিখানা পেয়ে সত্যই খুশী হ'য়েছি মনে-প্রাণে। মৃদঙ্গ সচেতন হ'য়ে সংসারের দিকে যে ফিরে তাকাবে আর অর্থোপার্জ্জনের দিকে মন দেবে—এ আশা কোনদিনই আমি অন্তরে পোষণ ক'র্‌তাম না। এমন কি কল্পনায় সে ছবি আঁক্‌তেও সাহস করি নি! তবে একটা ভরসা ছিল—তুমি যখন তার কাছে আছ, তখন যা হোক্ একটা ব্যবস্থা হবেই হবে। সে আশা আমার পূর্ণ হ'য়েছে। অবশ্য এ কথাটুকুও সেই সঙ্গে স্মরণ না ক'রে স্থির থাক্‌তে

পায়ছিনে—তোমার মত স্ত্রী জীবন-সঙ্গিনী রূপে পেয়েছিলাম ব'লেই, আমার মত লোকের পক্ষেও সংসারী সাজা সম্ভবপর হ'য়েছে। নইলে, ভবঘুরের মতই হয়ত জীবন যাপন ক'রে চ'ল্‌তাম আজীবন! একদিন ও জীবনটার প্রতি যে মোহ ছিল না তা নয়—অথচ আজ সে কথাগুলো স্মরণ ক'র্‌লে শরীরটা সভয়ে রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে নিজেরই অজ্ঞাতে। মনে হয় প্রেতপুরীর মতই শ্রীহীন ও ভয়াবহ ওর রূপ! সব থেকেও চির-বঞ্চনার বোঝা ব'য়ে চলে দিনের পর দিন—বছরের পর বছর। তাই ওদের আপন সত্তা-বোধটা পলে পলে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যায়। মায়া-মমতার স্নেহরস সিঞ্চনে পরিপুষ্ট হওয়ার অবকাশ থাকে না ব'লেই, ওই হতভাগোর দল, হয় বেপরোয়া। জীবন নিয়ে খেলে, ছিনিমিনি খেলা। হয়—নির্ম্মম···নিষ্ঠুর···পাষাণ।

সত্যই ও রূপ দেখ্‌লে আজ ভয় পাই। রীতি মত হৃৎকম্পও সুরু হ'য়ে যায়। অথচ সেদিন, ও জীবনের প্রতি কতই না গভীর মমতা লুকিয়ে ছিল হৃদয়-কন্দরে। তা'র ক্ষুদ্র ওই গণ্ডীর বাঁধনটাকে অতিক্রম ক'র্‌তে কত বেদনাই না অনুভব ক'রেছি মনে-প্রাণে।···আর আজ কি দেখ্‌ছি··· জানো? দেখ্‌ছি—ওদের ওই সরস জীবনটা প্রতিটি পলে রিক্ত হ'য়ে পরিণত হ'য়েছে নীরস অঙ্গারে। তাই মৃত্যুই হ'ল ওদের একমাত্র কাম্যবস্তু।···ওরা ম'র্‌তে চায়—নিজেকে শেষ ক'রে শান্তি পেতে চায়— বোধ করি এইটুকুই ওদের জীবনের শেষের পাথেয়।

তাই আঁৎকে উঠি! বার বার দেহ-মন রোমাঞ্চিত হয়! মিলিয়ে দেখি—সংসারী—সরস প্রাণী আমরা! মায়া মমতায় ভরপূর আমাদের হৃদয়। তাই অকালে এমন ক'রে নীরবে, নিঃশেষে জীবনটাকে বিকিয়ে দিতে পারি না সহসা। ভয়ে কাঁপে বুক। কাতর কণ্ঠে মিনতি জানাই, আরও কিছুদিন বেঁচে থাকার অবসর দাও, হে ভগবান! আরও কিছুদিন—এ পৃথিবীর সুখ ও শান্তিকে নিবিড়তর ক'রে উপভোগ

করার দাও অবসর।...এই আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ ক'রে অধীর ও চঞ্চল হৃদয়ে ওৎ পেতে ব'সে থাকি আমরা দিনের পর দিন—যুগের পর যুগ। তাই মরতে ভয় পাই। ও কথাটা চিন্তা ক'রতেও বেদনা অনুভব করি।

...কিন্তু কি লিখতে কি আবোল-তাবোল লিখে চ'লেছি যেন! কতকটা ধান ভানতে ব'সে শিবের গীত গাওয়ার মত!...হ্যাঁ—আমার অবস্থাটাও দাঁড়িয়েছে ঠিক সেইরূপ। একপাশে আমার সারা জীবনের সাধনা, নিজের হাতে পরম যত্নে গ'ড়ে তোলা এই সংসার—আর একদিকে আমারই সৃষ্ট মানস-প্রতিমা মনীষা। হ্যাঁ—আমারই সুপ্ত মনের প্রতিচ্ছবি বটে! ও আমাকেও চিনেছে তেমনি নিবিড়তর ক'রে।

কবে কোন শিশুকালে মাকে হারিয়েছিলাম, সে কথাটা জীবনে প্রায় বিস্মৃত হ'তে ব'সেছিলাম। তাই সেই স্মৃতিটাকে জাগিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে—মা, মা—ব'লে সম্বোধন ক'রতাম—যখন ও ছিল শিশু। কিন্তু আজ আমি আমার সত্যকার মাকেই যেন ফিরে পেয়েছি এ জীবনে। সত্যই মা ছাড়া, হৃদয়ের বেদনা এমন গভীর ক'রে বুঝেছে কি কেউ কোনকালে? কখন কোন্ বস্তুটির প্রয়োজন, কোন্‌টি না হ'লে চলে না—সে-কথা হৃদয় দিয়ে অনুভব একমাত্র মা ছাড়া আর কেউ কি করে এ-জগতে?

দেখ্‌ছি, সেই মাতৃত্ব-বোধটা মনীষার সজাগ হ'য়ে উঠেছে প্রকটতর রূপে। সে নিজের কথা বিস্মৃত হ'য়েছে—নিজেকে প্রায় ভুলতে বসেছে একেবারে। কেবল আমি আর আমি—আমার সুখ ও শান্তি—এর বেশী কোন কথাই যেন সে ভাব্‌তে পারে না কোনমতে। কিসে আমি তৃপ্তি পাই, কি পেলে দেহ-মনে আমি আনন্দ লাভ করি—সেই প্রয়োজনের তাগিদাতেই সে মুখর হ'য়ে থাকে সকল সময়। অফুরন্ত তৃপ্তির আমেজে নিজেকে হারিয়ে ফেলি নিজেরই অজ্ঞাতে। বসে বসে

ভাবি—সত্যই সে আমার মা! আমি তার শিশু ছেলে। প্রাণটা আমার অধীর আনন্দে উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে। ভুলে যাই আমি আমার জীবনের এই প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য্যকে।

সেদিন খেয়াল হ'ল—মা'র আমার একখানা ছবি তুলে রাখি। সেও রাজি হ'ল। ফটোগ্রাফারকে ডেকে ফটোও তোলালাম একটা। কিন্তু সে ছবিখানা যে-মুহূর্ত্তে আমার হাতে এসে পৌছ্‌লো সেই মুহূর্ত্তেই শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌লাম—মা'র আমার একি সেই সজীব, সবল মূর্ত্তি, না—বিসর্জ্জন যাওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত! চোখের কোণে কালি, ঠোঁটের পাতা দুটো শুক্‌নো, তবুও মা আমার হাস্‌ছে। যেন শেষ অভয়বাণী শোনাচ্ছে—ভয় কি? আবার আমি আস্‌বো ফিরে!

মনটা দুলে উঠ্‌লো। চোখের পাতাগুলোও ঝাপ্‌সা হ'য়ে এলো। নিজেকে গোপন ক'র্‌তে চাইলাম—কিন্তু মা'র কাছে ধরা আমায় প'ড়্‌তেই হ'ল। হাতে তার দুধের বাটি। মুখের সামনে তুলে ধরে সবিস্ময়ে প্রশ্ন ক'র্‌লো, তোমার চোখে জল কেন, বাবা!

উত্তরের ভাষা খুঁজে পেলাম না। তবুও ব'ল্‌লাম, তোমার একি ছিরি হ'য়েছে মা!

মনীষা মৃদু হাস্‌লো। সে হাসির রূপ, নিজের চোখে না দেখ্‌লে—কিছুতেই অনুমান ক'র্‌তে পার্‌বে না—কত বিরাট শূন্যতার সঙ্গে লড়াই সে ক'রে চ'লেছে প্রতিটি মুহূর্ত্তে!…অথচ পর মুহূর্ত্তেই সে নিজেকে সংযমের কঠোর নাগপাশে অবরুদ্ধ ক'রে, শান্ত ও নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল—কেন বাবা? যেমন পূর্ব্বে ছিলাম—ঠিক সেই রকমটি কি আজও আমি নেই! একটু জোরে হেসে উঠে ব'ল্‌লো, তোমরা অত্যন্ত বেশী ভালোবাসো কিনা—তাই একটুতেই ভয় পেয়ে যাও।—ও কিছু না!

একটা কাজকে উপলক্ষ্য ক'রে পরক্ষণেই সে চলে গেল অন্য ঘরে। কিন্তু একা বসে বসে ভাবি—সত্যই কি এটা আমার দৃষ্টিভ্রম না

অন্য কিছু ? যা মুহূর্ত্তপূর্ব্বে সহসা ধরা দিয়ে, আত্মগোপন ক'রে ব'স্‌লো —তা কি ঝড় ওঠার পূর্ব্ব লক্ষণ, না স্নেহশীল পিতৃ-হৃদয়ের সহজাত একটা দুর্ব্বলতার কাল্পনিক ক্ষতচিহ্ন মাত্র !

গতকাল অনিতাদি'র চিঠি পেয়েছি। মাত্র আট ন' বছরের মেয়ে কিন্তু এরই মধ্যে সে মনের কথাগুলো গুছিয়ে লিখ্‌তে শিখেছে বেশ। মনীষা মুখর হ'য়ে ওঠে, যখনই সে পায় তার হাতে লেখা ওই কয়েক ছত্র চিঠি। খুশী আমিও কম হই নে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে মনে পড়ে যায় মরমীপ্রকাশের কথা। দীর্ঘ এই চার বছরের মধ্যে একখানা চিঠি দিয়েও সে খোঁজ নেয় নি কোনদিন। বিস্ময় বোধ করি, আর ভাবি— তবে কি সব কিছুই আমাদের কল্পনা, না এ-জগতে মানুষের হৃদয় ব'লে কোন বস্তু নেই !

যাক্, বেশী কথা লিখে অযথা তোমাদের আর দুঃখ দিতে চাই না। তোমরা সুখে থাকো—ঈশ্বরের কাছে আমার একমাত্র কামনা। আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ ক'রো। ইতি—

অদ্বৈতকুমার

একবার নয়, বার বার তিনবার তিনি প'ড়্‌লেন চিঠিখানা। শেষে আঁচলের খুঁটে ঝাপ্‌সা চোখের পাতাগুলো মুছে নিয়ে ভাব্‌লেন—যে লোক একদিন না এলে স্থির থাক্‌তে পার্‌তো না, সে ত প্রায় আর এখানে আসে না ব'ল্‌লেই চলে ! লোকে যা' বলে সত্যও ত হ'তে পারে ! হয়ত সত্যই সে ভুলে গেছে মনীষাকে ! আর বোকা মেয়েটা দিনের পর দিন নীরবে চ'লেছে ক্ষয়ের পথে এগিয়ে !

নিজেরই অজ্ঞাতে বুকের মধ্যে জমে ওঠা ক্ষোভটা সহসা আত্মপ্রকাশ ক'রে ব'স্‌লো—একেই বলে দুর্জ্ঞেয় মানব-চরিত্র ! হয়ত জীবনে তার সাময়িক উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কোন সম্বল নেই এ দুনিয়ায় ?

পরমুহূর্ত্তে সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লেন অনুসূয়াদেবী। নিজের মনে নিজেই ভাব্‌লেন—না—না, কিছুতেই দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'র্‌তে পারেন না তিনি! তিনিও ত সন্তানের জননী! সেও ত তাঁর একান্ত প্রিয় ও পুত্র স্থানীয়। একদিন যে মা ব'লে সম্বোধন ক'রেছে, সে যত বড় অপরাধই করুক না কেন—তবুও সে সন্তান! সে সুখে থাক্। সত্যকার মানুষ হোক্। এর বেশী কোন কামনাই আজ তিনি পোষন করেন না অন্তরে। আবেগ-মিশ্রিত কণ্ঠে নিজেই মনে মনে ব'লে উঠ্‌লেন—আহা···তাই হোক—তাই হোক্! তিনটে জীবন এরূপ ভাবে বিনষ্ট না হ'য়ে, একটা জীবনই ব্যর্থ হোক্—হে ভগবান, সেইটুকুই যেন হয় সত্য!···

*   *   *   *   *

অনুসূয়াদেবী সান্ধ্য-প্রদীপ জ্বেলে নিবিষ্ট চিত্তে বসে বসে কি যেন ভাব্‌ছেন আন্‌মনা হ'য়ে। সহসা 'দাদি'—পিছন থেকে মধুর কোমল স্বর ভেসে এলো তাঁর কাণে।

সচকিত হ'য়ে তিনি পিছন ফিরে তাকালেন।

কণ্ঠস্বরটা আরও স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্‌লো—'দাদি'!

বুঝ্‌লেন—অনিতা এসেছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে তাঁকে। সাড়া দিলেন —এই যে এ ঘরে দিদি!

কোথায়?

তোমার মাসীমার ঘরে!

পরমুহূর্ত্তে হাঁপাতে হাঁপাতে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো অনিতা। উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে ব'ল্‌লো—তুমি একা বসে কি ক'র্‌ছো, দাদি? আমি সারা বাড়ীটা যে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে বেড়াচ্ছি!

আদর ক'রে পাশে টেনে বসালেন অনুসূয়াদেবী। ব'ল্‌লেন—তা হাঁপাচ্ছো কেন দিদি?

ভয় পেয়েছিলাম !

কেন ?

ভাব্লাম, তুমিও বুঝি নেই !

নেই ! তাই ভয় ? মৃদু হাস্লেন অনুসূয়াদেবী। ব'ল্লেন, এমন অসময়ে এলে যে দিদি !

কি করি বলো ! বাবা—যেন কি রকমের হ'য়ে গেছে। কেবল বলে, শোনাও ত মা তোমার মাসীমার গাওয়া সেই গানখানা ! বুঝ্লে দাদি, একই গান বার বার গেয়ে শোনাই, তবুও বাবার খেয়ালই থাকে না। যখন আরম্ভ করি, তখন বেশ সজাগ থাকে—তারপর যেন পড়ে ঘুমিয়ে—

একটু থাম্লো। ব'ল্লো—রোজ বলি, চলনা বাবা—দাদির কাছ থেকে ঘুরে আসি একবার ! বাবা বলে—হ্যাঁ, সত্যই অনেকদিন যাওয়া হয়নি বটে ! একবার ঘুরে আসাও উচিত। নইলে তোমার দাদি হয়ত রাগ ক'র্বেন মনে মনে !

জামা-কাপড় প'রে যখন বলি—তা হ'লে আজই চলো !

বাবা কি রকম যেন অন্যমনা হ'য়ে পড়ে। বলে, একটু বসো—একটা সুর মনে আস্ছে, তোমায় শুনিয়ে দিই—ভারী চমৎকার সে সুর ! সেই যে সেতার নিয়ে ব'স্লো—তারপর তাকে তোলে কার সাধ্য ! আজ ব'ল্লাম—না গেলে কিছুতেই তোমায় ছাড়্ছিনে ! ব'ল্লো, বেশ তো চলো—অম্নি বেরিয়ে প'ড়েছি দু'জনে !

মরমীপ্রকাশ এসেছে ? ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্লেন অনুসূয়াদেবী। জিজ্ঞাস ক'র্লেন, কোথায় দিদি, সে ?

বসে আছে সেই বাইরের ঘরটায়।

উঠে দাঁড়ালেন অনুসূয়াদেবী। ব'ল্লেন, ঠাণ্ডা পড়েছে ভাই, গায়ে একটা কিছু ত দিয়ে আস্তে হয় ! আমার ঘরে ষ্টোভ্টা আছে—জ্বেলে

দিচ্ছি—একটু চা তৈরী করো ত ভাই। মরমীপ্রকাশ আমার বড় চা খেতে ভালবাসে। তোমার মাসীমা থাক্‌লে এখুনি তৈরী ক'র্‌তে ছুট্‌তো। তারপর, তোমার মা'র শরীর ভাল ত' ?

অনিতা বলে, মা ভালই আছে। অসিতের শরীরটা একটু খারাপ হ'য়েছিল—সেও এখন ভাল আছে। বাবার কথা ছেড়ে দিন। সকল সময়ে নির্ব্বিকার···কেমন যেন একটা—

কথা তার শেষ হ'ল না। অনুসূয়াদেবী ব'লে উঠ্‌লেন, তা'হলে তুমি চা তৈরী করো দিদি—আমি যাই। বাছা একা বসে আছে সে ঘরে! মৃদঙ্গ বউ-মাকে নিয়ে কোথায় যেন একটু বেড়াতে গেল।—পার্‌বে ত দিদি ?

এক গাল হেসে উঠ্‌লো অনিতা। ব'ল্‌লো, কি যে বলো দাদি! বাবাকে আমিই ত চা তৈরী ক'রে দিই।

অকারণ, তবুও বুকটা খচ্‌ ক'রে উঠ্‌লো। মনে পড়ে গেল মনীষার কথা। এ কাজটা ছিল তারই। আজ সে নেই,—অনিতা ছাড়া সে কাজের ভারই বা নেবে কে! নিজেকে অতি কষ্টে সংবত ক'রে নিয়ে বেরিয়ে প'ড়্‌লেন অনুসূয়াদেবী। ব'ল্‌লেন—এখুনি ফিরে আস্‌ছি দিদি, ততক্ষণ জলটা তুমি চাপাও—

মরমীপ্রকাশ বসে আছে তার প্রিয় সেই চেয়ারটায়। দৃষ্টি তার মনীষার ফটোখানার প্রতি নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে তার পিছনে এসে দাঁড়ালেন অনুসূয়াদেবী। দেখ্‌লেন, মরমীপ্রকাশের কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই—যেন নিবিড় ধ্যান-মগ্ন সে।

মৃদুকণ্ঠে ডাক্‌লেন, মরমীপ্রকাশ।

কোন উত্তর এলো না। এগিয়ে গেলেন তার পাশে। দেখ্‌লেন—মরমীপ্রকাশের চোখের কোণে জল।

প্রস্তরমূর্ত্তির মত তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মিনিট। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন বারান্দায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর একটু উচ্চ কণ্ঠে পুনরায় ডাক্‌লেন—মরমীপ্রকাশ—

সচকিত হ'য়ে উঠ্‌লো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লো, কে ? মাসীমা !

হ্যাঁ—ভেতরে চলো।

মরমীপ্রকাশ এগিয়ে এলো। তিনি চেয়ে দেখ্‌লেন, আত্মবিভোর মরমীপ্রকাশের চোখের কোলে তখনও জলের ছাপ্‌টা স্পষ্টতর হ'য়ে ফুটে র'য়েছে।

অনুসূয়াদেবী গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌লেন সেই মুহূর্ত্তে। সঙ্গে র'য়েছে অনিতা। বয়স তার কচি হ'লেও—দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা শোভন হবে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব'ল্‌লেন, চোখের কোলটা—মুছে নাও বাবা।

সম্বিৎ ফিরে পেল মরমীপ্রকাশ—কিন্তু লজ্জায় ম্লান হ'য়ে প'ড়্‌লো পর মুহূর্ত্তে।

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা ক'র্‌লেন অনুসূয়াদেবী। ব'ল্‌লেন— তোমার মা-বাবার শরীর ভাল ত সব ?

সংক্ষেপে উত্তর দিল মরমীপ্রকাশ—হ্যাঁ ভালই আছেন তাঁরা।

বাইরের আলোতে মরমীপ্রকাশের মুখের চেহারাটা ভাল করে লক্ষ্য ক'রে শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌লেন অনুসূয়াদেবী। ব'ল্‌লেন—তোমার শরীরটার একি 'হাল' হ'চ্ছে দিনের পর দিন! যত্ন নাও—নইলে জীবনের সমস্ত সাধনাই যে তোমার ব্যর্থ হ'য়ে যাবে !

মরমীপ্রকাশ প্রতিবাদ জানালো, কেন, বেশ ত আছি মাসীমা ! পরমুহূর্ত্তে একটু ম্লান হেসে ব'ল্‌লো—লোকে ত বলে, দিনের পর দিন নাকি বেশ মোটা হ'য়ে উঠ্‌ছি !

কয়েক সেকেণ্ড নীরব থেকে অনুসূয়াদেবী ব'ল্‌লেন—লোকে দেখে তোমার বাইরের রূপ, কিন্তু মার দৃষ্টি যে অন্তরের দিকে তাকিয়ে থাকে

মরমীপ্রকাশ! তাই সকলকে ফাঁকি দিলেও মার চোখ দুটোকে ফাঁকি দেওয়া চলে না।...একটু থেমে ব'ল্লেন—শরীরের প্রতি যত্ন নাও! নিজের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু ছেলে-মেয়েটার কথাও ত ভেবে দেখা উচিত একটিবার—

মরমীপ্রকাশ উত্তরের ভাষা খুঁজে পায় না। আর দেবেই বা কি? কথাটা ত মিথ্যা বলেন নি তিনি। তাই নীরবে তাঁকে অনুসরণ ক'রে চ'ল্লো সে এগিয়ে।

* * * *

মৃদঙ্গকুমার সাংসারিক জীবনে রীতিমত জড়িয়ে প'ড়্লেও, তার পূর্ব্ব অভ্যাস ত্যাগ ক'র্তে পারেন নি এখনও। মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেল্লেও পুনরায় তা' দীপ্ত হ'য়ে ওঠে দ্বিগুণ উৎসাহে।

পাড়ার ছেলেরা একদিন ধ'রে ব'স্লো—একটা গানের জল্সা ক'র্লে মন্দ হয় না মৃদঙ্গদা!

মৃদঙ্গকুমারও হৈ চৈ নইলে স্থির থাক্তে পারে না। মনে মনে সে সেই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এতদিন। সঙ্গে সঙ্গে মুখর হ'য়ে উঠ্লো—কে, কে আস্বে?

সে ব্যবস্থা ত তোমার 'পরেই নির্ভর ক'র্ছে!

কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেল মৃদঙ্গকুমার! নামের তালিকা শেষ হ'লে, ছেলের দল প্রশ্ন তুল্লো—মরমীপ্রকাশবাবু কি আসবেন?

আলবাৎ আসবেন! আমি নিয়ে আস্বো! একটু জোর কণ্ঠে উত্তর দিল মৃদঙ্গকুমার।

আমরা কিন্তু শুনেছি, আজকাল তিনি বড় একটা জল্সায় যোগ দেন না। তাছাড়া লোকটিকে গম্ভীর ও দাম্ভিক ব'লেই মনে হয় আমাদের! ছেলের দল মৃদু অনুযোগ করে।

তাহ'লে তোমরা বাইরে থেকেই তাঁর রূপ দেখেছো, মিশে দেখনি কোনদিন। অমন অমায়িক লোক বড় একটা চোখে পড়ে না! একটু উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর দিল মৃদঙ্গকুমার। ব'ল্‌লো—তোমাদের চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই, সে ভার আমার।

ছেলেরা চলে গেল। মৃদঙ্গকুমার হাসি মুখে মরমীপ্রকাশের বাড়ীর দিকে হ'ল রওনা। পথে অনাথবাবুর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। তিনি ব'ল্‌লেন—আজকাল যে এ বাড়ী বড় একটা আর আসো না মৃদঙ্গকুমার!

একটু ম্লান হেসে মৃদঙ্গকুমার ব'ল্‌লো—জানেন ত সব। বাবা এখানে নেই। চাকরীও ছেড়ে দিয়েছেন। এখন সংসারের সম্পূর্ণ ভারটা আমার কাঁধেই চেপেছে। সময়ও আর পাই না। তাই ইচ্ছা থাক্‌লেও এপাশে আসা বড় একটা আর হ'য়ে ওঠে না। মরমীপ্রকাশদা' বাড়ীতে আছেন ত?

হ্যাঁ। সে ত বড় একটা কোথাও বেরোয় না! ভেতরে গেলেই দেখা পাবে। তারপর তোমার বাবার কি হ'য়েছিল যে, স্বেচ্ছায় তিনি চাকরীটা ছেড়ে দিলেন?

আর কেন বলেন? একটু টেনে হাস্‌লো মৃদঙ্গকুমার। ব'ল্‌লো—আমার বোন মনীষাকে ত দেখেছেন? তারই অসুখ—মানে বিশেষ কিছুই না—তবুও তাকে নিয়ে সেই যে বাইরে বেরোলেন, আর এমুখো হওয়ার নামই করেন না। একটু ইয়ে—মানে তিনি মেয়ে-অন্ত প্রাণ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—শুনেছিলুম বটে তোমার মাসীমার কাছে, মনীষার অসুখ। তা' এখন আছে কেমন?

ভালই! সে দিন বাবা একখানা ওর ছবি পাঠিয়েছেন। দেখে ত স্বাস্থ্য আরও ভাল হ'য়েছে ব'লেই মনে হ'ল। তবুও বাবার নাকি সন্দেহ ঘোচে না। কি আর বলি বলুন!

উত্তর দিলেন না অনাথবন্ধু। ব'ল্‌লেন—এখানে দাঁড়িয়ে রইলে যে! ভেতরে যাও। বাড়ীর ছেলে, লজ্জার কি আছে? যাও, যাও সোজা ভেতরে চলে যাও।

অনিতা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো—কাকাবাবু আস্‌ছে, কাকাবাবু আস্‌ছে!

মীরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। হাসি মুখে ব'ল্‌লো—আচ্ছা পাগল মেয়ে যা হোক তুই অনিতা! মনীষাদি হ'ল মাসীমা, আর ঠাকুরপো হ'ল কাকা। তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন, সোজা ওপরে চলে এসো ঠাকুরপো, ডান পাশের সিঁড়ি বেয়ে—

মৃদঙ্গকুমার হাসি মুখে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। মীরা ব'ল্‌লো—তারপর—পথ ভুলে বুঝি? বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, একেবারে লম্বা ডুব! ব্যাপার কি? ঘোর সংসারী হ'য়ে প'ড়েছো যে দেখ্‌ছি!

তা' যা ব'লেছেন! হেসে উঠ্‌লো মৃদঙ্গকুমার। ব'ল্‌লো, প্রকাশদা' আছেন ত!

মাথাটা মৃদু হেলিয়ে উত্তর দিল মীরা—আছেন! ওঘরে আছেন। তবে এখন তিনি রেওয়াজ ক'র্‌ছেন। তারপর সব খবর ভাল ত? চলো, চলো—ব'সবে চলো! এতদিন পরে যদিও পথ ভুলে এলে, একটু বস্‌বে না? চলো—একটু থেমে পুনরায় মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো মীরা—মাসীমা কেমন আছেন? মেশোম'শায়ের শরীর ভাল ত? মনীষাদির খবর কি? কবে ফির্‌ছেন সব?

তাঁরাই জানেন! একটু অবজ্ঞার সুরে উত্তর দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে চেয়ারটায় ব'সলো মৃদঙ্গকুমার।

অনিতা চা ও খাবার নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো।

মৃদঙ্গকুমার একটু বিস্ময় বোধ ক'র্‌লো। ব'লে উঠ্‌লো—তুমি নিজে নিয়ে এলে যে মা!

বারে! নিজের হাতেই ত মানুষকে খাওয়াতে হয়। মৃদু হাস্‌লো অনিতা। ব'ল্‌লো—বাবা কি বলে জানেন কাকাবাবু? মানুষকে খাওয়াবে নিজের হাতে, ছাড়া কাপড় কাচ্‌বে নিজের হাতে। আর চল্‌বে প্রতিটি মানুষকে যথারীতি সম্মান দিয়ে—

মাঝপথে ঝাঁপিয়ে প'ড়্‌লো মৃদঙ্গকুমার—আরে, এ যে সেই খাঁটী হিঁদুয়ানি ব্যবস্থা। না, সত্যই দেখ্‌ছি প্রকাশদার মাথাটা খারাপ হ'য়ে গেছে। একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে উঠ্‌লো মৃদঙ্গকুমার। ব'ল্‌লো—তাহ'লে এ সময়ে ওঁর দেখা পাওয়া দেখ্‌ছি রীতিমত একটা সাধ্য সাধনার ব্যাপার!

উত্তরে একটু ম্লান হাস্‌লো মীরা। ব'ল্‌লো—তা' একটু ব'স্‌তে হবে ভাই ঠাকুরপো!

হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে মৃদঙ্গকুমার ব'লে উঠ্‌লো—সময়ও হাতে নেই বেশী! যেতে হবে আরও দু' তিন জায়গায়। তা' অনিতা-মা তুমি বাবাকে ব'ল্‌বে—আমি এসেছিলাম। বৈকালে যেতে হবে একটা জল্‌সায়। তুমিও কিন্তু সঙ্গে যাবে মা—

বাবা আজকাল ত কোথাও বড় একটা যায় না কাকাবাবু!

আরে, যাবে—যাবে—নিশ্চয় যাবে। বিশেষ ক'রে ব'ল্‌বে, আমি কথা দিয়েছি—যেতে তাঁকে হবেই। বৈকালে বরং গাড়ীটা পাঠিয়ে দেবো—এই ধরে নাও—একটু টেনে ব'ললো—সন্ধ্যে আন্দাজ ছ'টায়। তারপর বৌদি, তোমাদের খবর সব ভাল ত?

কোন রকমে কেটে চ'লেছে ভাই! সংক্ষেপে মৃদু হেসে উত্তর দিল মীরা। ব'ল্‌লো—কই, ওগুলো ত মুখে দিলে না ঠাকুরপো?

দেবো বইকি! নিশ্চয় দেবো। একটু সপ্রতিভ হ'য়ে উত্তর দিল মৃদঙ্গকুমার। আমার মা'র দেওয়া খাবার—কখনও কি অবজ্ঞা করা চলে? সহাস্যে অনিতার চিবুকে মৃদু দোলা দিয়ে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে মুখে

ফেলে দিল দুটো সন্দেশ। সেগুলো শেষ ক'রে ব'ল্‌লো—আজকাল তুমিও ত বড় একটা আমাদের বাড়ীতে যাও না! রাগ ক'রেছো বুঝি? তোমার দাদি ত উঠ্‌তে ব'স্‌তে তোমাকেই স্মরণ করে সকল সময়!

অনিতা একটু সলজ্জ হাসি হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—বারে! সেদিন ত বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম।

শুধু সেদিন কেন? রোজ যাবে—সহাস্যে চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মৃদঙ্গকুমার। ব'ল্‌লো—বেশ চমৎকার চা' ত! কে ক'রেছে? আমার অনিতা-মা নাকি?

মীরা উত্তরে ব'ল্‌লো—হ্যাঁ, আজকাল ওই সকলকে চা তৈরী ক'রে খাওয়ায়।

প্রকাশদাকেও—

হাসলো মীরা। ব'ল্‌লো, আর বলো না ঠাকুরপো! যত দিন যাচ্ছে, ততই বাপ আর মেয়ে একেবারে ছেলে মানুষ হ'য়ে প'ড়্‌ছে। মেয়েরও বাপ ছাড়া এক মুহূর্ত্ত চলে না। উঠ্‌তে বস্‌তে সকল সময়েই—বাবা আর বাবা। তোমার দাদার অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। সকল সময়ে অনিতা-মা আর অনিতা-মা। বয়স বাড়্‌ছে! দু' বছর পরে, পরের ঘর ক'র্‌তে যেতে হবে! তাই মিছে বাধা আর দিইনে! শিখ্‌তে চায় শিখুক্। এছাড়াও কারণে, অকারণে গালি খেতে হবে আমাদেরই!

তা যা ব'লেছো বৌদি! উঠ্‌তে বস্‌তে মেয়েদের শুধু বাপের বাড়ীর খোঁটা সহ্য ক'র্‌তে হয় বারো মাস—নিজের চোখেই ত দেখ্‌তে পাচ্ছি! তা মা, তুমি এরই মধ্যে ফ্রক ছেড়ে শাড়ী প'র্‌লে কেন? —না—না বৌদি ওটা মাপ্ ক'র্‌তে হ'বে তোমাকে। ছেলে মানুষ—ছেলে মানুষের মতই থাকুক। স্বচ্ছন্দে একটু ঘুরে ফিরে বেড়াক্—বাকী জীবনটা তো ওই শাড়ীর গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাক্‌বে! নেই বা ও বোঝাটা চাপালে এ বয়স থেকে!

মীরা সহাস্যে ব'ল্‌লো—কেন ঠাকুরপো ? শাড়ী ত শুনেছি, জগতের সেরা পরিচ্ছদ। তার প্রতি সহসা এত বিরূপ হ'লে কেন বলতো ?

কারণ ? হাস্‌লো মৃদঙ্গকুমার। ব'ল্‌লো—ওর বৈশিষ্ট্যকে সত্যই উপেক্ষা করার সাধ্য এ-জগতে কারও নেই, বৌদি ! কিন্তু ও বস্তুটা ছোটদের বয়স একটু তাড়াতাড়ি দেয় বাড়িয়ে।—তাই মাঝে মাঝে আঁৎকে উঠ্‌তে হয়—এ ভদ্র-মহিলাটি আবার কে ? একটু ভাল ক'রে তাকালে তবেই ভুলটা ধরা পড়ে—ওঃ আমার অনিতা-মা ! যাকে দু'দিন আগে কোলে পিঠে ক'রে ঘুরে বেড়িয়েছি ! তাই ত বলি—আরও একটু বয়স বাড়ুক। তার পূর্ব্বে ও বোঝা বইয়ে লাভ কি ?

উত্তর খুঁজে পায় না মীরা। নীরবে হাসে একটু।

মৃদঙ্গকুমার বলে—আর না—এবার তা'হলে উঠি বৌদি ! তুমি কিন্তু বাবাকে ব'লে তৈরী থেকো মা !—

আবার আস্‌বে—সাদর সম্ভাষণ জানালো মীরা।

নিশ্চয় ! পিছন ফিরে সহাস্যে একটু থম্‌কে দাঁড়ালো মৃদঙ্গকুমার। ব'ল্‌লো জানোত বৌদি, চিরদিনের পেটুক আমি। এমন থালা ভর্ত্তি খাবার পেলে রোজ আস্‌বো ! সেদিন কিন্তু বিরক্ত বোধ ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না ! হাসি মুখে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল মৃদঙ্গকুমার !

* * * *

মরমীপ্রকাশ নিজেকে বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিজের মনে নিজেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসবাস ক'র্‌তে চায়। একদিন হৈ-চৈ এর মধ্যে নিজেও প্রচুর আনন্দ লাভ ক'রেছে, তার স্পন্দন-ধারাকে সজীবতার লক্ষণ ভেবে যথেষ্ট সম্মানও দিয়েছে বারে বার—কিন্তু আজ সেই দৃষ্টি-ভঙ্গি তার রূপ পরিবর্ত্তন ক'রেছে বয়স ও চিন্তার সুরে সুর মিলিয়ে। তাই ও বস্তুটা জীবনের দ্বারে খোলসের মর্য্যাদাই লাভ ক'রেছে—তার বেশী মূল্য দিতে সে আজ আর প্রস্তুত নয়।

অনিতার মুখে জল্‌সার কথাটা শুনে প্রথমে সে বিরক্তি বোধ ক'রেছিল—অথচ শিশু-মনে অযথা আঘাত হান্‌তে সাহসী হ'ল না। শুধু ব'ল্‌লো—কথা যখন দিয়েছেন যেতেই হবে—কিন্তু তার পূর্ব্বে আমাকেও ত একটিবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল মা!

অনিতা মাথা নত ক'রে বলে—তুমি যে তখন রেওয়াজ্ ক'র্‌ছিলে!

হাস্‌লো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লো—মার কাছে আবার সময় অসময় কি মা! তাছাড়া এসেছিল ত তোমার কাকা—একটু থেমে বল্‌লো, তোমায় বলি, তার কারণ তুমি এখনও শিখ্‌ছো, আর আমি যেটুকু করি সেটা যে আমার সাধনা। তফাৎ শুধু এখানেই—তার বেশী কিছু নয়। চলো! কথা যখন দিয়েছো—মূল্য তার রাখ্‌তেই হবে।…

একটু দেরী ক'রেই পৌঁছালো মরমীপ্রকাশ—সঙ্গে অনিতা। আসর তখন জমে উঠেছে। বহু বিখ্যাত শিল্পী এসেছেন সে সম্মিলনীতে। মৃদঙ্গকুমার এগিয়ে এলো হন্ত-দন্ত হ'য়ে। আসনে বসিয়ে ব'ল্‌লো—তোমাকে কিন্তু আরও একটু আগে আশা ক'রেছিলাম প্রকাশদা! দেরী দেখে ভেবেছিলাম—আমাদের হয়ত নিরাশ ক'র্‌লে অবশেষে! তবে ভরসা যে ছিল না তা নয়—অনিতার চিবুকে মৃদু দোলা দিয়ে সহাস্যে ব'লে উঠ্‌লো, আমার মা যখন র'য়েছে, তখন ভয়টা অমূলক নিঃসন্দেহ!

একটু থেমে ব'ল্‌লো—কিন্তু শরীরের একি ছিরি হ'য়েছে প্রকাশদা? সহসা যে চেনাই আর যায় না। গায়ের রংটা যেন তামাটে হ'য়ে গেছে, চোখের কোলে কালির ছাপ প'ড়েছে, গাল্‌টা বসে গেছে রীতিমত! সত্যি ব'ল্‌ছি প্রকাশদা—তুমি বেশ একটু বুড়িয়ে গেছ এরই মধ্যে।

উত্তরে হাস্‌লো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লো—শরীরের আর অপরাধ কি বল? বয়স ত বাড়্‌ছে। তার ছাপ ত একটা প'ড়বেই। তারপর

তোমাদের খবর কি বলো? মাসীমা কেমন আছেন—মেসোম'শায়ের সংবাদ পেয়েছো?

একটু উৎসাহ ভরেই মৃদঙ্গকুমার উত্তর দিল—সবই ভাল খবর দাদা—কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়েছে মনীষাটাকে নিয়ে! কি যে তার রোগ—তা কোন ডাক্তারই ধ'র্‌তে পা'র্‌লো না আজ পর্য্যন্ত! অথচ তার বাইরের চেহারা দেখে সহসা মনেই হয় না—সত্যই কোন অসুখ শরীরে তার লুকিয়ে র'য়েছে। বাবার কাল একখানা চিঠি পেয়েছি। এই দেখনা লিখেছেন তিনি—চিঠিখানা পড়্‌তে শুরু ক'র্‌লো…

"মনে হয় দিনের পর দিন মেয়েটা ক্ষয়ের পথে চ'লেছে এগিয়ে। এ থেকে মুক্তি তার নেই—সাধ্যও আমার নেই। তবুও যদি তাকে এতটুকু শান্তি দিতে পারি, তাই দেশ বিদেশে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াই। তোমাদের সুখ-দুঃখের কথাটা নিত্যই স্মরণে জাগে। চোখের সামনে সে দৃশ্যাবলি স্পষ্টতরও হ'য়ে ওঠে। কিন্তু নিজেকে এমন শিকলের বেড়াজালে জড়িয়ে ফেলেছি যে, সে পথ থেকে সহসা নিজেকে মুক্ত ক'র্‌তে পা'র্‌বো ব'লে আশা আর করিনে। তুমি ছেলে মানুষ হ'লেও জাতে পুরুষ, পথ ক'রে নেবেই নেবে। এইটুকুই আমার শেষ আশীর্ব্বাদ!"

একটু থেমে চিঠিখানা ভাঁজ ক'রে পকেটে রেখে মৃদঙ্গকুমার ব'ল্‌লো—জানোত প্রকাশদা' জীবনের সমস্ত অংশটাই প্রায় আনন্দ ও হৈ-চৈ এর উচ্ছ্বাস ও হুল্লোড়ে কাটিয়ে এসেছি—ওগুলোকে ঠিক এখনও মানিয়ে নিতে পারিনি। তাই সব বুঝেও মাঝে মাঝে অবুঝ হ'য়ে পড়ি। অভিমানও জাগে—কিন্তু তুমিও ত আর এখানে আসো না!·· এলে তবুও ত একটু সান্ত্বনা পাই, মনে বল আসে!

মরমীপ্রকাশ ম্লান একটু হাস্‌লো। ব'ল্‌লো—ইচ্ছা থাক্‌লেও সময় পাইনে ভাই! আস্‌বো, নিশ্চয় মাঝে মাঝে আসবো। কিন্তু শরীরটা

তেমন ভাল নেই—মেয়েটাকে একটু বসিয়ে দাও—আমায় আবার এখুনি ফিরে যেতে হ'বে।

না বাজিয়ে ত তুমি ফিরে যেতে পা'র্‌বে না প্রকাশদা'! কেউ আশা করেনি তুমি আস্‌বে। যখন এলে, তখন ওদের একটু আনন্দ দান না ক'র্‌লে, ওরা যে ব্যথা পা'বে মনে-প্রাণে! তার চেয়ে বরং এঁদের প্রোগ্রামটা পিছিয়ে দিয়ে তোমার বসার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি এখুনি!

মরমীপ্রকাশ উত্তর দিল না। অযথা ব্যথা সে কারও মনে দিতে চায় না, কারণ তার স্বরূপ সে প্রতিটি পলে, প্রতিটি মুহূর্ত্তে নিবিড়ভাবে অনুভব ক'রে চলেছে যে জীবনে!

মৃদঙ্গকুমার চলে যায়। মরমীপ্রকাশের হৃদয়খানা মনীষার রিক্ত বেদনার চিন্তাধারায় ভরপুর হ'য়ে ওঠে! মনে মনে ভাবে—অকারণে একটা ফুটন্ত জীবনকে এমনি নির্ম্মম ভাবে সে-ই ঠেলে দিয়েছে ক্ষয়ের পথে। অথচ প্রায়শ্চিত্তের পথও তার খোলা নেই এই বাস্তব ছুনিয়ায়! —হায়রে নির্ম্মম সমাজ!

...ফিরে এলো মৃদঙ্গকুমার। ব'ল্‌লো—চলো প্রকাশদা'।

মরমীপ্রকাশ তখনও চিন্তায় বিভোর। যন্ত্র চালিতের মত মৃদঙ্গকুমারের পিছু পিছু আসরে গিয়ে ব'স্‌লো।

মৃদঙ্গকুমার ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে ব'ল্‌লো—অনিতা-মা আগে একটা গান গেয়ে নিক্‌—তারপর তুমি বাজাবে, কি বলো?

মরমীপ্রকাশ উত্তরে মাথা দোলালো।

অনিতা তানপুরা তুলে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাক্‌লো—বাবা—

নিজেকে সাম্‌লে নিল মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লো—তুমি গাও, আমি বাজাচ্ছি।

গান সুরু হ'ল। আসর স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়্‌লো। তবলার স্পষ্টতর

বোল, আর তার সঙ্গে তাল রেখে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট সুর ও ছন্দ নেচে চ'ল্লো ধীরে অতি ধীরে।

মোহিত হ'ল শ্রোতা। গান শেষ হ'লে করতালিতে মুখরিত হ'ল আসর। বার বার অনুরোধ ভেসে আস্‌তে লাগ্‌লো—আরও একটা, আরও একটা···

মৃদঙ্গকুমার আসন ত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালো মাইকের সাম্‌নে। ঘোষণা ক'র্‌লো—মরমীপ্রকাশবাবুর শরীর বিশেষ সুস্থ নয়, তাই আমাদের একটু তাড়াতাড়ি তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে। আর যিনি এতক্ষণ আপনাদের গান শোনালেন, তিনি মরমীপ্রকাশবাবুর কন্যা—কুমারী অনিতাদেবী। এবার আপনাদের মরমীপ্রকাশবাবু বেহালা বাজিয়ে শোনাচ্ছেন।

সভা পুনরায় স্তব্ধ হ'য়ে প'ড়্‌লো। বেহালার সুর ধীরে ধীরে আপন ছন্দে নেচে নেচে বেড়াতে লাগ্‌লো। তার তালে তালে নাচ্‌তে লাগ্‌লো শ্রোতার অন্তর। যেন তাদেরই অন্তরের একান্ত নিভৃত কোণের পুঞ্জীভূত সমস্ত ব্যথা ও বেদনাগুলো, নিবিড় ক'রে নিঙ্‌ড়ে নিয়ে চলেছে একের পর এক।

বহুক্ষণ বেজে চ'ল্‌লো সে সুর। ধ্যান-মগ্ন মরমীপ্রকাশ—বিমুগ্ধ শ্রোতার দল। তাদের অন্তরাত্মা যেন বলে—বাজুক্, এমনি সুরে—গভীর ক'রে বাজুক বারে বার।

রাত্রি গভীর হ'য়ে এলো। অন্য শিল্পীবৃন্দ চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মৃদঙ্গকুমার মৃদু কণ্ঠে ডাক দিল, প্রকাশদা—

মরমীপ্রকাশের সাড়াও নেই, শব্দও নেই। যেন সেই যন্ত্রের সঙ্গে শিল্পীও পরিণত হ'য়েছে যন্ত্রে। পুনরায় ডাকদিল মৃদঙ্গকুমার—প্রকাশদা' ও প্রকাশদা' শুন্‌ছো—

ধ্যান ভঙ্গ হ'ল মরমীপ্রকাশের। কিন্তু মুখখানা তার বিরক্তিতে

ভরপুর হ'য়ে উঠ্‌লো। বেহালাটা নামিয়ে ধীর কণ্ঠে ব'ল্‌লো—এবার তাহ'লে উঠ্‌ছি কুমারসাহেব! অনিতা-মা চলো, এবার ওঠা যাক্!

* * * *

অনিতার হাত ধ'রে নীরবে বেরিয়ে এলো মরমীপ্রকাশ। তখনও তার চেতনা বোধটা সম্পূর্ণ সজাগ হ'য়ে ওঠে নি। সুরের রাজত্বে বিচরণ ক'র্‌ছে সে। অস্ফুটকণ্ঠে ব'ল্‌লো—আমাদের আরও কত দূর যেতে হবে মা?

বালিকা অনিতা বোঝে না সে কথার মর্ম্ম। উত্তর দেয় না—নীরবে তার হাতখানা দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ ক'রে থম্‌কে দাঁড়ালো গাড়ীটার সাম্‌নে।

ফিস্ ফিস্ ক'রে পুনরায় মরমীপ্রকাশ ব'ল্‌লো—অনেক দূর—না মা?

বোঝে না অনিতা, তবুও অন্তরখানা তার শিউরে ওঠে ভয়ে। বলে, এবার যে আমরা বাড়ী ফিরে যাবো বাবা!

বাড়ী? মৃদু হাসে মরমীপ্রকাশ।

হ্যাঁ, বাড়ী। চলো গাড়ীতে আমরা উঠি!

বাধা দিল না মরমীপ্রকাশ। গাড়ীতে উঠে বসার পর মুহূর্ত্তেই অনিতার কচি হাতখানা আপনমনে তুলে নিয়ে ব'ল্‌লো—অনেক রাত হ'য়ে গেছে নয়!

ভয়ে আড়ষ্ট অনিতা। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হ'য়ে প্রশ্ন তুলে—তোমার শরীরটা বুঝি খুব খারাপ লাগ্‌ছে, বাবা?

সস্নেহে বুকের ওপর তার মাথাখানা টেনে নিল মরমীপ্রকাশ। ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ব'ল্‌লো—না মা! কিছুই হয়নি ত আমার।

তবুও বিশ্বাস হয় না অনিতার। পুনরায় প্রশ্ন তুলে—সত্যি? সত্যি ব'লছো বাবা?

বোকা মেয়ে! আদরে চিবুকখানা তুলে নিজেই মুছে দিল তার

সজল চোখের পাতাগুলো। ব'ল্‌লো—সত্যিই আমার কিছু হয় নি মা! অনিতাকে ভোলায় মরমীপ্রকাশ। সেও বিশ্বাস ক'র্‌লো তাই। কিন্তু নিজেকে প্রতারিত ক'র্‌তে পার্‌লো না সহজে। মনীষার ব্যথা, অপর কেউ না বুঝুক, নিজে ত বোঝে তার গভীরতা কত সুদূর প্রসারী! সেই আকর্ষণী শক্তি মানুষকে কেমন ক'রে ক্ষয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে চলে দিনের পর দিন! যে স্মৃতির সুখ-পরশে নিজেকে সে রেখেছিল ভুলিয়ে, যে পূত প্রদীপ-শিখার উজ্জ্বল আভায় হৃদয়ের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার মলিনতা প'ড়ে ছিল ঢাকা—যে বেদনার অমৃত-রস পানে অধীর হৃদয়াবেগ সাধনার পীঠ-ভূমিতে নিজেকে ক'রেছিল প্রতিষ্ঠিত—তার আসন সহসা বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌লো নোতুন কলেবরে। অনুশোচনায় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বার বার পীড়া দিতে লাগ্‌লো—একটা জীবনকে অহেতুক পীড়া দিল সে নিজ স্বার্থ ও সুখ লাভের অতৃপ্ত বাসনার মোহে। নিজের মনে নিজেই ভাবে মরমীপ্রকাশ,...হ্যাঁ.. একটা জীবন—আশায় ভরপুর ফুটন্ত একটা গোলাপ! তাকে—হ্যাঁ—তাকেই সে সৌরভহীন ক'রে তুলেছে প্রতিটি পলে—প্রতিটি মুহূর্ত্তের ব্যবধানে। তার জন্য দায়ী আজ সে নিজেই—দায়ী তার এই কপট আচরণ। সে ভীরু, সে কাপুরুষ। সত্যকে স্বীকার করার ক্ষমতা তার নেই।...না—না—কথাটা মিথ্যা নয়,—সত্যই সে দুর্ব্বল—

ফিরে এলো মরমীপ্রকাশ। কোন কিছুই তার আর ভাল লাগ্‌ছে না! নিল সে শয্যার আশ্রয়। কিন্তু কোমল শয্যাটাও যেন তার কাছে কণ্টকাকীর্ণ ব'লে মনে হ'ল। স্থির হ'য়ে বেশীক্ষণ শুয়ে থাক্‌তে পার্‌লো না সে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো, বারান্দায়। আপন মনে পদচারণা ক'র্‌লো সুরু।

শ্রান্ত মীরা, ঘুমে অচেতন। সহসা তার সেই সুখ-নিদ্রা গেল টুটে।

বেডস্বইচ্‌টা টিপে জ্বাল্‌লো আলো। দেখলো—শূন্য শয্যা। মরমী-প্রকাশ নেই। পড়ে আছে শুধু তার গায়ের আলোয়ানখানা। সবিস্ময়ে সে এগিয়ে এলো উন্মুক্ত দরজার সাম্‌নে। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও চিন্‌তে পা'র্‌লো চিন্তাবিভোর স্বামী তার নিঃশব্দে পদচারণা ক'রে চ'লেছে একমনে।

শীতটা ক'দিন একটু জাঁকিয়ে প'ড়েছিল। কন্‌ কনে হাওয়ায় শরীরে তার কম্পন সুরু হ'ল অথচ মরমীপ্রকাশ নিশ্চিন্ত—নির্ব্বিকার।

মীরা শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে কাঁপে। অকারণে তার হাতের চুড়িগুলো বার বার রিনি টিন্‌ রিনি টিন্‌ শব্দে কেঁপে কেঁপে জমাট সেই স্তব্ধতার বক্ষ বিদীর্ণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। তবুও অচঞ্চল মরমীপ্রকাশ। অস্ফুট কণ্ঠে ডাক্‌লো একবার, শুন্‌ছো—ঠাণ্ডা লাগ্‌বে যে! ভেতরে এসো না—

মীরার ভয় হয় যদি এর বেশী একটু উচ্চ কণ্ঠে ডাক দেয় সে, হয়ত জেগে উঠ্‌বে প্রতিবেশী, জাগ্‌বে আত্মীয়-স্বজন—জাগ্‌বে দাস-দাসী। না—না—সেই অশোভন দৃশ্যের অবতারণা সে ক'র্‌তে চায় না—পা'র্‌বেও না জীবনে। ফিরে এলো সে অনিতার শয্যার পাশে। মৃদুকণ্ঠে ডাক্‌লো—অনিতা—

কি মা? সভয়ে জেগে ওঠে অনিতা।

ওকে, ঘরে ডেকে নিয়ে আয় ত মা! মীরার কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল মিনতি ভরা কাতর একটা সুর।

বিস্ময় মিশ্রিত সুরে প্রশ্ন তোলে অনিতা—কাকে? বাবাকে? এখনও ঘুমোয় নি?

নিজেকে সংযত ক'রে নেয় মীরা। শান্ত ও ধীর কণ্ঠে উত্তর দেয়—না।

তা'হলে—

অনিতার কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই মীরা হাতখানা বাড়িয়ে দিল বাইরে। ব'ল্‌লো—বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে—।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল অনিতা। মরমীপ্রকাশের হাত দু'খানা চেপে ধরে ডেকে উঠ্‌লো—বাবা!

থমকে দাঁড়ালো মরমীপ্রকাশ। আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল সেই মুহূর্তে। শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল—কি মা?

আল্‌গা গায়ে তুমি এখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে র'য়েছো বাবা? বিস্ময় মিশ্রিত কণ্ঠে প্রশ্ন তোলে অনিতা।

এই ত এলাম মা! ম্লান একটু হাসি হাস্‌লো মরমীপ্রকাশ।

ঠাণ্ডা লাগ্‌বে যে! ভেতরে চলো। হাত দুটো ধরে টান দেয় অনিতা।

ভেতরে যে বড় গরম বোধ হ'চ্ছে মা!

এত শীতেও গরম? যাও, মিছে কথা! কণ্ঠে তার অবিশ্বাসের সুর। বলে, ভেতরে চলো—

একরকম জোর ক'রেই ভেতরে টেনে নিয়ে এলো অনিতা। শয্যায় শুইয়ে দিয়ে ব'ল্‌লো—কি তোমার কষ্ট হ'চ্ছে, বাবা? মাথাটা টিপে দেবো?

দেবে? বেশ দাও। শান্ত অথচ নির্লিপ্ত সুরে উত্তর দিল মরমীপ্রকাশ।

নীরবে কেটে গেল কয়েক মিনিট। মৌনতা ভেঙে ব'ল্‌লো মরমীপ্রকাশ—কিন্তু রাত জাগ্‌লে তোমার যে আবার শরীর খারাপ হবে, মা?

না কিছু হবে না! শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল অনিতা।

ম্লান হাস্‌লো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লো, তা হয় না মা! তুমি শোওগে!

পাশেই দাঁড়িয়েছিল মীরা। ব'স্‌লো পালঙ্কের ওপর। ব'ল্‌লো—আমি বরং মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি! তুই যা অনিতা!

কিন্তু—কি যেন ব'ল্‌তে চায় মরমীপ্রকাশ।

তোমার কিসের এত সঙ্কোচ বলো ত? একটু দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দি'ল মীরা।

ঠিক সঙ্কোচ নয়—ম্লান একটু হাস্‌লো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লো—তোমার শরীরটাও ত ভাল নেই! তাই ব'ল্‌ছিলাম, যাতনা যার, সে-ই ব্যথা তার ভোগ করুক না একটু!

কেন অকারণ বাধা দাও বলো ত? অভিমানভরা কণ্ঠে উত্তর দিল মীরা।

বাধা! না, বাধা ঠিক আমি দিতে চাই নি! টেনে পুনরায় ম্লান একটু হাসলো মরমীপ্রকাশ। কিন্তু পরক্ষণেই বুক ভেদ ক'রে নেমে এলো একটা গভীর নিঃশ্বাস। নিজেকে সংযত করার উদ্দেশ্যেই তার হাতখানা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মৃদু স্বরে ব'ল্‌লো—ব্যথা পেলে মীরা! কিন্তু স্বেচ্ছায় আমি দিইনি, আমায় বিশ্বাস করো তুমি! দৃষ্টি তুলে তাকালো তার মুখের দিকে। হাতখানা দৃঢ়ভাবে বুকের ওপর চেপে মুখর হ'য়ে উঠ্‌লো—চুপ্‌ ক'রে ব'সে রইলে কেন, দাও! এখানটায় হাত বুলিয়ে দাও—বড় ব্যথা মীরা, বড় ব্যথা।

মীরা নিজেকে আর ধ'রে রাখ্‌তে পারে না। বেড স্যুইচটা অফ্‌ ক'রে মরমীপ্রকাশের বুকের ওপর মাথাটা রেখে প্রাণ খুলে কাঁদ্‌লো বহুক্ষণ। বার বার অস্ফুট কণ্ঠে ব'ল্‌লো, আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ক'রে—তোমার পাশে আমায় তুলে নাও,—তুলে নাও—

উত্তরের ভাষা খুঁজে পেল না মরমীপ্রকাশ! সে নিজেও ভাসে চোখের জলে। সময় তার শেষ হ'য়ে এসেছে, তাই অভিযোগ, অনুযোগ সবই আজ বৃথা···

* * * *

পরদিন কম্প দিয়ে জ্বর এলো মরমীপ্রকাশের। ডাক্তার এলেন। পরীক্ষার পর ব'লে গেলেন, জ্বরের জন্য তেমন কিছু

ভয় নেই—কিন্তু হার্টটা বড় উইক্, একটু সাবধানে থাকতে হবে।

জ্বরের প্রকোপ তখনও কমে নি। সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে মরমীপ্রকাশের। কথাটা নিজেও শুন্‌লো নিজের কানে কিন্তু ভয় পেল না এতটুকু। বরং ম্লান একটু হেসে পাশ ফিরে শুলো সে নীরবে।

মীরা পাশে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের সব কথাই শুন্‌লো মনোযোগ দিয়ে। গভীর একটা শঙ্কায় হৃদয়টা তার দুলে ওঠে বার বার। নিজের মনে নিজেই ভাবে—একি হ'ল? না—না, স্বামী তার সুখী হোক্—শান্তি পাক্—এইটুকুই কামনা ক'রেছে সে দিনের পর দিন। মৌনী পূজারীর মত, তারই ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে, কাটিয়ে দেবে জীবনের বাকী ক'টা দিন। কিন্তু একি আজ শুন্‌লো সে নিজের কানে? অন্তরাত্মা তার কাৎরে উঠ্‌লো। অন্তর-দেবতার কাছে মিনতি জানালো, ঠাকুর—একটু দয়া করো। স্বামীকে আমার রোগ মুক্ত ক'রে দাও। তাকে সবল ও সুস্থ ক'রে তোলো।

ডাক্তার চলে গেলে পর মীরা পাশে এসে ব'স্‌লো। বুকে পিঠে তার হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ব'ল্‌লো, ব্যথা ব'ল্‌ছিলে, না? কোথায়? কোনখানে? বলো—

উত্তর দেয় না মরমীপ্রকাশ। যে ব্যথা পুঞ্জীভূত হ'য়ে জীবনটাকে পিষ্ঠ ক'রে এলো দিনের পর দিন, সেই ব্যথা ও বেদনা হয়ত সে নিজেই সহজে মুক্ত ক'রে দিতে পা'র্‌তো, কিন্তু তার এই অহেতুক নীরবতাই তাকে গড়ে তুলেছিল বর্হিমুখী। সেখানে সে অনুভব ক'রেছিল প্রাণের সজীব স্পন্দন—পেয়েছিল, হৃদয়টাকে ভরিয়ে নেওয়ার অফুরন্ত অবকাশ। সে আশ্রয়টুকুও চিরদিনের মত গেছে তার ভেঙে—একান্ত আচম্বিতে। তার বেদনার হাহাকারেই ছিন্ন-বিছিন্ন হ'ল হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী; অথচ সে ব্যথা প্রকাশ করা গেল না অন্য কারও

কাছে। সে সাধ্যও তার নেই! শুধু জেগে আছে অন্তরভেদী জ্বালাময়ী দীর্ঘশ্বাস।…সেই বস্তুটাই আজ তার জীবনের শেষ অবলম্বন!…

* * * *

প্রথম কয়েকটা মাস নিজেকে খাড়া ক'রে তুল্‌তে যথেষ্ট বেগ পেয়েছিল মনীষা। নিজেকে ভুলে থাকার জন্য চেয়েছিল একটা অবলম্বন। সেই অবলম্বনের কেন্দ্র বস্তুতে রূপায়িত হ'লেন অদ্বৈতকুমারবাবু। তাঁরই সেবা ও যত্নে মনীষা ডুবে গেল একেবারে। ভাব্‌লো—এই অবলম্বনই তাকে ভুলিয়ে দেবে তার জীবনের চাওয়া পাওয়ার অতীত ইতিহাস। কিন্তু অবুঝ হৃদয় বোঝেনা কোনমতেই। অবসর পেলেই সে তলিয়ে যায় তার সেই অতীতের আবর্ত্তে। তার সুখ-স্মৃতির পরশ পেয়ে অতৃপ্ত হৃদয়খানা ভরে উঠে নিজেরই অজ্ঞাতে।

মনীষা ভেবেছিল—একটা জীবন বইত নয়! কতটুকু তার মেয়াদ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে সে ফুরিয়ে। কিন্তু ভেবে দেখেনি, সেই স্বল্প মেয়াদটুকুর ব্যবধান নেহাৎ তুচ্ছ বস্তু নয় এ দুনিয়ায়। তার বোঝা বইবার শক্তি থাকা চাই, নইলে—বোঝার ভারে আপনিই সে নত হ'য়ে আসে ধীরে ধীরে।

হ'লও ঠিক তাই। হাস্যে ও লাস্যে সকলকে সে ভোলালো, কিন্তু রুদ্ধ বেদনার হাহাকারে হৃদয়টা তার ঝাঁঝ্‌রা হ'য়ে গেল প্রতিটি মুহূর্ত্তের ব্যবধানে। দ্রুত ক্ষয় হ'তে লাগ্‌লো তার জীবনের মেয়াদ।…

নারীর চির-জাগ্রত মাতৃত্বের সহজাত স্বচ্ছ-ধারায়, ধীরে ধীরে যখন নিজেকে ক'র্‌লো সে প্রতিষ্ঠিত, পিতাকে পুত্রের স্থানে বসিয়ে যখন সে তাঁরই সেবা-যত্নে হ'ল মগ্ন, ঠিক সেই সময়েই অদ্বৈতকুমারবাবু স্নেহান্ধ পিতৃ-হৃদয়ের সহজাত দুর্ব্বলতায়, নিজের অজ্ঞাতে তার হৃদয়ে হান্‌লেন নোতুন একটা আঘাত। উত্থাপন ক'র্‌লেন তার বিয়ের প্রস্তাব। মনীষা সমস্ত

কথা শুনলো নীরবে। জবাব দিল স্বল্প কয়েকটি কথায়। কিন্তু পরিবর্ত্তন দেখা দিল তার আচার ও ব্যবহারে।

একদিন যে বেদনার আঘাতে জীবনে তার এসেছিল বৈরাগ্যের নেশা, যে অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার আকর্ষণে সে ধীরে ধীরে হ'য়ে উঠেছিল প্রকৃতস্থ প্রকৃতির একনিষ্ঠ পূজারী—সেই নেশাই আজ নোতুন ক'রে পেয়ে বস্‌লো তাকে। পুনরায় সে কোলে তুলে নিল তার চির-প্রিয় সেই পুরানো সেতারখানা। নিভৃতে আপন মনে সেই যন্ত্রটাকে বুকে চেপে ফেলে দীর্ঘশ্বাস, মোছে সিক্ত চোখের পাতাগুলো। হ'তে পারে সে একটা প্রাণহীন যন্ত্র, কিন্তু সেই ত তার অতীত জীবনের একমাত্র সাথী, একান্ত প্রিয়তর বস্তু!

এপাশে অদ্বৈতকুমারবাবুর সেবা ও যত্নে, তার নেই এতটুকু অবহেলা—বরং আন্তরিকতাটা যেন দিনের পর দিন প্রকটতর হ'য়ে ওঠে। অবকাশ যখন সে পায়, তারই ফাঁকে গাঁথে ফুলের মালা—জ্বালে ধূপ ও ধূণা। সৌরভমণ্ডিত ঘরে, একাকী নিভৃতে মনের মত ক'রে সাজায় সেতারখানা।··· এরই সঙ্গে গভীর ক'রে মিশে আছে স্মৃতির স্নিগ্ধ-পরশমালা। তাই বারে বারে সেটা সাজায়। তাকে পরশ ক'রে নিবিড়তর ভাবে, ফিরে পায় সেই হারাণো আমেজটুকু। এক অতৃপ্ত অনুভূতির সুতীব্র আবেগে, শিহরিত হয় তার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ। ভুলে যায় নিজেকে। মুছে যায় সেই দূরত্বের ব্যবধান।

* * * *

অদ্বৈতকুমারবাবু নিঃশব্দে চেয়ে চেয়ে দেখেন আর অনুশোচনায় দগ্ধ হন, কাজটা তাঁর শোভন হয় নি। বেশ ত ছিল সে নিশ্চিন্ত নীরব! অকারণে তিনিই ত পুনরায় হৃদয়ে তার জাগিয়ে দিয়েছেন সেই পুরানো দিনের অতীত স্মৃতিগুলো!

এতে যদি সে এতটুকু শান্তি পায়, পাক্ না! বাধা—না—না, কোন বিঘ্নের সৃষ্টি আর তিনি ক'র্বেন না এ জীবনে। সে সুখী হোক্, শান্তি পাক্—এর বেশী কোন কামনাই আজ তিনি পোষণ করেন না অন্তরে।

ক'দিন থেকে যেন সে একটু বেশী আন্মনা হ'য়ে প'ড়েছে। সকল কাজই প্রায় করে নিজের হাতে। দাসদাসী থেকে আরম্ভ ক'রে বাসার প্রতিটি প্রাণীকে সে যেন গভীর স্নেহ-যত্ন ও মমতার বাঁধনে বাঁধ্তে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে।

অদ্বৈতকুমারবাবু বিস্ময় বোধ করেন। মনে মনে শঙ্কা বোধও করেন একটু। ভাবেন, হঠাৎ একি পরিবর্ত্তন! তবে কি কোন নোতুন কিছুর সম্ভাবনা এলো তার জীবনে! উত্তর খুঁজে পান্ না তিনি। কিন্তু লক্ষ্য করেন, নিজেকে প্রকৃতস্থ করার উদ্দেশ্যেই যেন সে অধীর ও চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে দিনের পর দিন।

কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—তোমার মুখটা এমন শুক্নো শুক্নো দেখাচ্ছে কেন, মা?

মাথা নত ক'রে কয়েক সেকেণ্ড নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো মনীষা। তারপর ধীর কণ্ঠে ব'ল্লো—কিছুই বুঝ্তে পারি নে বাবা!—কিসের অভাবে অন্তরটা যে আকুলি বিকুলি ক'রে ওঠে, কে জানে! কারণ অবশ্য খুঁজি কিন্তু সঠিক জবাব খুঁজে পাই নি আজও আমি! অথচ ঘন ঘন নামে দীর্ঘশ্বাস।—মাঝপথে একটু থেমে ব'ল্লো—মার কোন চিঠি পেয়েছ কি? অনিতা-মাও চিঠি দেয়নি বহুদিন। কেমন আছে সব কে জানে! রোজ মনে হয়, জিজ্ঞাসা ক'র্বো, কিন্তু তোমার কাছে এসে দাঁড়ালে সব কথাই যাই ভুলে। টেনে একটু হাস্লো মনীষা।

অদ্বৈতকুমারবাবু আশ্বাস দেন—চিন্তার কোন কারণ নেই মা; গতকাল তোমার মার চিঠি পেয়েছি। তাঁরা সকলেই ভাল আছেন।

শুধু তাই নয়, একটা শুভ খবরও দিয়েছেন—দাদা তোমার সকল কিছুর মধ্যে নিজেকে মানিয়ে চ'ল্‌তে শিখেছে। এখন সে সংসারের কথা গভীর ক'রে চিন্তা করে। অবশ্য অতীতের আনন্দ-মুখর জীবনটাকেও সে ভুল্‌তে পারে নি একেবারে। কয়েকদিন আগে একটা গানের জল্‌সা বসিয়েছিল। সেখানে অনিতা দিদি নাকি খুব সুন্দর গান্ গেয়েছে। মরমীপ্রকাশও সে আসরে যোগ দিয়েছিল।

মাঝপথে থেমে প'ড়্‌লেন অদ্বৈতকুমারবাবু।

থাম্‌লে কেন বাবা? তবে কি প্রকাশদার শরীর খুব খারাপ? বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌লো মনীষা।

না—না, খারাপ ঠিক নয়—তবে কি জানো মা—

আলোচনার মোড় ফেরাবার চেষ্টা করেন অদ্বৈতকুমারবাবু।

তোমার কোন আশঙ্কা নেই বাবা, তুমি বলো। সংক্ষেপে উত্তর দিল মনীষা। কিন্তু মনে মনে ভাব্‌লো—আমি যে নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ছি নে। অন্তরটার সঙ্গে বোঝাপড়ায় হার মেনে গেছি বার বার। অকারণ একটা শঙ্কায় জর্জ্জরিত হ'চ্ছি যে প্রতিটি মুহূর্ত্তে।

অদ্বৈতকুমারবাবু ব'ল্‌লেন—মরমীপ্রকাশের শরীরটা ভেঙেছে বটে, তবে সংসারে তার মন নেই! সে ত তুমি নিজেও জানো মা—চিরদিনের বৈরাগী সে!

অমন বৌ···এমন ছেলে-মেয়ে, এত যশ ও ঐশ্বর্য্য···কোন কিছুই কি তাঁকে আপন ক'রে বাঁধ্‌তে পারে নি! কোন কিছুর মধ্যেই কি সে শান্তির সন্ধান পাবে না এ জীবনে? অস্ফুট কণ্ঠে মনীষা নিজের মনে নিজেই ব'লে উঠ্‌লো।

অস্পষ্ট হ'লেও সব কথাই শুন্‌তে পেলেন অদ্বৈতকুমারবাবু কিন্তু উত্তর দিলেন না সহসা। আজ এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন কেমন ক'রে—তাই নিরুত্তরে আকাশের দিকে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইলেন শুধু···

মনীষা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন তুল্‌লো না। সে সামর্থও তার ছিল না। ফিরে গেল নিজের কাজে। কিন্তু ঘুরে ফিরে একটা কথা বার বার তার মনে জাগ্‌লো—সব কিছু পেয়েও সে বৈরাগী! তাহ'লে আজও সে ভুল্‌তে পারে নি তাকে! চোখের পাতাগুলো তার সজল হ'য়ে উঠ্‌লো নিজেরই অজ্ঞাতে। ভুলে গেল সে নিজেকে। তন্ময় মনটা তার এক অপরূপ আনন্দের হিল্লোলে দোলা খেল বার বার। ভাবে—না, তার প্রেম, তার ভালবাসা—মিথ্যায় পর্য্যবসিত হয় নি, বরং নিজস্ব মর্য্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত সে হ'য়েছে পরিচয়ের প্রথম দিনটি থেকে। এর পরেও দুঃখ···এর পরেও বেদনা?···না না, এটা তার মিথ্যা অভিমান। চকিতে মুছে যায় তার জীবনের যত অভিযোগ। ভুলে যায় সে অতীতের বেদনাময় সেই দুঃসহ পুরানো ইতিহাসের ধারা।

প্রকৃতিস্থ হ'ল অন্তর। বাহ্যিক চপলতার অকারণ উচ্ছ্বাসে ঝরে গেল বাসি ফুলের পাপ্‌ড়ির মত। মুখর হ'য়েছে হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী। মর্ম্ম দিয়ে অনুভব করে তার আস-পাশের প্রতিটি প্রাণীর রুদ্ধ অন্তরবেদনা—তাদের রূঢ় বাস্তব জীবনের দৈনন্দিন ব্যর্থতা।

মনীষা একান্তে বিলিয়ে দিতে চাইলো নিজেকে। কিন্তু প্রতিটি পদে তার বাধা। অন্তরায় তার আজন্মের সংস্কার।

থম্‌কে দাঁড়ালো মনীষা।···কেন?···নিজেকে সত্যই কি বিলিয়ে দেওয়া যায় না।

অন্তরের গহণ কোন থেকে কে যেন ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো—রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ সত্যই নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারে না, তার জন্য প্রয়োজন সাধনার!

সাধনা?

হ্যাঁ, সাধনা। চাই সেই একনিষ্ঠ শক্তির সাধনা! উত্তর দিল অন্তর।

তবে কি সে শক্তিটুকুও তার নেই? নির্জ্জনে বসে মনে মনে ভাবে মনীষা।

....না—হ্যাঁ...না, না—সত্যই সে শক্তি তার নেই। উঠে দাঁড়ালো মনীষা। তাই তার জীবনে আজ প্রয়োজন হ'ল আবরণের—দূরত্বের ও ব্যবধানের। কিন্তু...প্রকাশদা? চোখের পাতায় ভেসে উঠ্‌লো মরমী-প্রকাশের মলিন মুখের শীর্ণ ছায়াখানা। বিদায়ের ক্ষণে এমনি ব্যথা ও বেদনায় ক্লিষ্ট ও পিষ্ট হ'য়ে উঠেছিল বটে সে! পরক্ষণেই তার হাস্য-মুখর মুখের ছায়াখানা স্পষ্টতর হ'য়ে উঠ্‌লো—নির্ব্বিকার উদাসী!...তৃপ্তি-ভরা সে মুখ...যদিও এটা তার কল্পনা—তবুও মনে-প্রাণে সে বিশ্বাস করে: এটা নিছক কল্পনা বিলাসী মনের প্রতিচ্ছবি নয়, এর পিছনে লুকিয়ে র'য়েছে তার অন্তরের একনিষ্ঠ কামনা। তাই যখনই প্রাণটা হ'য়েছে ব্যাকুল তখনই পেয়েছে সে দেখা। দেখেছে তার হাসিভরা মুখ, লক্ষ্য ক'রেছে সেই বৈরাগী মনের তৃপ্তির বিশালতা। তার কাছে সে সত্যই ক্ষুদ্র—নিতান্তই দুর্ব্বল ও অক্ষম...

ধীরে ধীরে বুক ভেদ ক'রে তার নেমে এলো একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস। নিজের মনে নিজেই ব'লে উঠ্‌লো—হয়ত এটাই নারী ও পুরুষ জীবনের বৈশিষ্ট্য। পুরুষ যখন নিজেকে দেয় বিলিয়ে, সেদিন সে এম্‌নি রিক্ত ক'রেই সব কিছু দেয় বিলিয়ে—আর নারী? সব কিছুর শক্তিধর হ'য়েও প্রতিটি পলে নিজের সঙ্গে নিজেই করে বঞ্চনা। একপাশে তার আজন্মের সংস্কার, অন্যপাশে বাস্তব জীবনের অনন্ত তৃষা। মাঝখানে দীর্ণ ও জীর্ণ হয় তার মন। তাই—পরাজয় তার পদে পদে।

* * * *

গম্ভীর হ'য়েছে মনীষা। কিন্তু মনের দুয়ার তার গেছে খুলে। সে আদর-যত্নে প্রতিটি মানুষকে তুষ্ট ক'রতে ব্যস্ত।

বিস্মিত হ'লেন অদ্বৈতকুমারবাবু। বিস্মিত হ'ল, বাড়ীর প্রতিটি প্রাণী। শুধু বিস্মিত হ'ল না মনীষা নিজে। আজ তার চোখে সবাই সমান—কেউ ছোট—কেউ বড় নয়!

সারাদিনের পরিশ্রমে, গভীর অবসাদে এলিয়ে প'ড়লো মনীষার দেহ। একটু তাড়াতাড়ি শয্যায় আশ্রয় নিল বটে কিন্তু চোখের পাতাগুলো হ'ল না রুদ্ধ। নির্জ্জন রাত্রির স্তব্ধতার মাঝে মরমীপ্রকাশের স্মৃতি অন্তরে উদিত হ'য়ে তন্দ্রার আমেজটাকে বার বার ক'রে দিল ছিন্ন।

তারই ফাঁকে, মনীষা হারিয়ে ফেল্‌লো—জাগ্রতের চেতনা। দেখ্‌লো স্বপ্ন। জীর্ণ ও শীর্ণ মরমীপ্রকাশের মুখখানা যেন মৃদু কণ্ঠে ডেকে উঠ্‌লো—মনীষা!

মনীষার অন্তরখানা আনন্দে ভরপুর হ'য়ে উঠ্‌লো। আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে ব'ল্‌লো, বহুদিন পরে এলে—একটু বসো!

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'র্‌লো মরমীপ্রকাশ। ব'ল্‌লো—ডাক্ এসেছে মনীষা, তাই চ'লে যাওয়ার আগে তোমাকে একটিবার দেখে যেতে এলাম—

মরমীপ্রকাশের চোখের পাতাগুলো সিক্ত। দাঁড়ালো না একটিও মুহূর্ত্ত। যেরূপ এসেছিল তেমনি নীরবে পিছন্ ফিরে চ'ল্‌লো সে এগিয়ে।

ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো মনীষা—যেয়ো না—আমায় ছেড়ে তুমি যেয়ো না প্রকাশদা'!···তুমি ছাড়া আমি যে একটি মুহূর্ত্তও স্থির থাক্‌তে পারি না। বিশ্বাস করো—জীবনে তুমি ছাড়া আমার আপন জন আর কেউ নেই—কারও কথা চিন্তা ক'র্‌তে পারিনি যে কোনক্ষণে—

তবুও দাঁড়ালো না মরমীপ্রকাশ। নির্ম্মম পাষাণের মত এগিয়ে চ'ল্‌লো সে ধীরে অতি ধীরে।

মনীষা ছুটলো তার পিছু পিছু। চীৎকার ক'রে বার বার ডাক্‌লো, প্রকাশদা, একটু দয়া করো, পিছন ফিরে তাকাও,—হাত ধ'রে আমায় তুমি তোমার পাশে টেনে নাও—

সহসা থম্‌কে দাঁড়ালো মরমীপ্রকাশ। বাড়িয়ে দিল তার হাতখানা। মনীষাও বাড়ালো, কিন্তু নাগাল পেলে না। হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেল ধুলোর ওপর। কণ্ঠে তার ভেসে উঠ্‌লো অস্পষ্ট মিনতিভরা কাতর একটা স্বর—প্রকাশদা'—

পাশের ঘরে শুয়েছিলেন অদ্বৈতকুমারবাবু। একটা ভারী কিছু প'ড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে শয্যা থেকে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। জ্বাল্‌লেন আলো। দেখ্‌লেন, মনীষার অচৈতন্য দেহখানা লুটিয়ে প'ড়ে আছে মেঝের ওপর।

সভয়ে ছুটে এলেন অদ্বৈতকুমারবাবু। আবেগ মিশ্রিত কণ্ঠে ডাক্‌লেন, মনীষা—মনীষা—

কোন সাড়া নেই। জ্ঞানহীন দেহখানা তার পরিণত হ'য়েছে নিথর পাষাণে।

*　　　*　　　*　　　*

জাগ্‌লো দাস-দাসী, এলো ডাক্তার—কিন্তু জ্ঞান ফির্‌লো না মনীষার।

ইন্‌জেক্‌শন্ দেওয়া হ'ল। পাল্‌স্ পরীক্ষার পর ডাক্তার রায় ব'ল্‌লেন, বিপদটা এড়িয়ে যাওয়া গেছে বটে, কিন্তু বিশেষ সাবধানে রাখ্‌তে হ'বে রোগীকে—হার্টটা অত্যন্ত উইক্!

সভয়ে অদ্বৈতকুমারবাবু জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—তা হ'লে বাড়ীতে খবর একটা পাঠাবো কি?

ম্লান হাস্‌লেন ডাক্তার রায়। ব'ল্‌লেন, খবর পাঠানো উচিত মনে করি। কারণ রোগীর যা অবস্থা—তাতে সম্পূর্ণ জ্ঞান না ফিরে আসা পর্য্যন্ত ঠিক নিশ্চিন্ত বোধ করা চলে না!

অদ্বৈতকুমারবাবু ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। এ অবস্থায় ওর মায়ের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়। সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম ক'রে

দিলেন—'মনীষা ভীষণ অসুস্থ। সংবাদ পাওয়া মাত্র চ'লে এসো। যদি সম্ভব হয়, মরমীপ্রকাশকেও সঙ্গে নেবে। বোধ হয়—এ যাত্রা ওকে আর বাঁচানো সম্ভব হবে না।'

বেয়ারা বাইরের ঘরে জেগে ব'সেছিল—সে ছুটলো নির্দ্দেশমত। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এলেন অদ্বৈতকুমারবাবু। তাঁর মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার রায় আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা ক'রলেন, নার্ভাস হবেন না অদ্বৈতবাবু!

ফিকে একটু হাসলেন, অদ্বৈতকুমারবাবু। ব'ললেন, আমার মন কিন্তু ব'লছে—ওকে আর ফেরাতে পারবো না—

এত উতলা হ'লে কি চলে! শরীরটা দুর্ব্বল, মানসিক উত্তেজনায় সাময়িক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে মাত্র! তবে—হার্টটা একটু উইক্, তা' ছাড়া অন্য সব লক্ষণ ত ভালই!

কোন কিছুই ভাল লাগে না অদ্বৈতকুমারবাবুর। নিজেকে সংযত করার উদ্দেশ্যে বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন। পরক্ষণেই ফিরে এলেন ভেতরে, ব'ললেন, সবই ঠিক ডাক্তার রায়, কিন্তু মন ব'লেও একটা বস্তু আছে। তাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না—

মৃদু হেসে উত্তর দিলেন ডাক্তার রায়, অহেতুক্ শঙ্কাকে ত প্রাধান্য দেওয়া চলে না!

একটু জোরে মাথা দুলিয়ে উত্তর দিলেন অদ্বৈতকুমারবাবু, আশঙ্কাটা হয়ত অমূলক! কিন্তু মনটাকে উপেক্ষা করে, মিথ্যা আশার প্রলোভনে বিমুগ্ধ আমরা যে হই—এ কথাটা ত সহজে উড়িয়ে দিতে পারেন না। একটু থেমে পুনরায় ব'ললেন, তার স্বরূপ চিনেও আমরা চিনতে পারিনে। তাই ভুল করি, অথচ অনুশোচনার শেষও থাকে না জীবনে—

সহাস্যে ডাক্তার রায় ব'ললেন, ও বস্তুটা যে কতটুকু সত্য আর কতটুকু মিথ্যা, তার স্বরূপ হয়ত নির্ণয় করা আজ যাবে না, তবে বাস্তববাদী

মনের পরিচয় যে ওটা নয়—সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে; বিশেষ ক'রে এই 'সায়েন্সের' যুগে—যেখানে প্রতিটি বস্তুর মান নিরূপিত হ'চ্ছে কষে, মেজে—সেখানে অবাস্তব কল্পনার ঠাঁই না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

তর্ক নিষ্প্রয়োজন ডাক্তার রায়! একটু বিরক্তি ভরেই উত্তর দিলেন অদ্বৈতকুমারবাবু। ব'ল্লেন, আপনার বিশ্বাস নিয়ে আপনি থাকুন—আমার বিশ্বাস নিয়ে আমিও পথ চলি; তাহ'লে সহজেই সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে। কারণ রোগীর রোগমুক্তির কামনা করি আমরা উভয়েই।

একটু থেমে পুনরায় বলে উঠ্‌লেন অদ্বৈতকুমারবাবু—আমি বাপ, আপনি চিকিৎসক, উভয়ের মনের অবস্থা ঠিক এক হওয়া সম্ভবপর নয়। তবে এ যাত্রায় যদি মা আমার সুস্থ হ'য়ে ওঠে, সে দিন আপনার বাস্তববাদী মনের সঙ্গে আমার কল্পনা-বিলাসী মনের পার্থক্যটা কোথায়—বুঝিয়ে দেবো—আজ সে অবসরও নেই, মনটাও প্রকৃতিস্থ নেই। আপনি বরং একবার পাল্‌স্‌টা পরীক্ষা ক'রে দেখুন, বিটটা নর্‌ম্যাল্‌ হ'লো কিনা? সঙ্গে সঙ্গে মনীষার হাত ও পায়ের তালু পরীক্ষা ক'রে ব'ল্লেন, আমার মনে হ'চ্ছে—হাত পাগুলো যেন ক্রমশঃই ঠাণ্ডা হ'য়ে আস্‌ছে,—

ডাক্তার রায় মৃদু হাস্‌লেন। ব'ল্লেন, অধৈর্য্য হবেন না অদ্বৈতবাবু। ওষুধ দিয়েছি, য়্যাক্‌শন্‌ তার হ'বেই। তবে সময়েরও ত একটু প্রয়োজন!

তা বটে! মনীষার শয্যার পাশে ব'সে প'ড়্‌লেন অদ্বৈতকুমারবাবু। ব'ল্লেন, কি জানেন ডাঃ রায়, চিকিৎসকদের বিশ্বাস না ক'রেও উপায় নেই, আবার ভরসাও ঠিক পাওয়া যায় না। তাঁদের কোনটা সত্য আর কোন্‌টা যে স্তোকবাক্য, বোঝা সত্যই দুঃসাধ্য আমাদের।...

*   *   *   *

মরমীপ্রকাশের জ্বর একটু কমেছে কিন্তু অকারণ চঞ্চলতা তার বেড়ে চ'লেছে সমানে। সে যে কি চায়—কাকে খোঁজে—তার কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারে না, মীরা। বলে—অনিতাকে ডাক্‌বো ? একটু স্থির হ'য়ে শুয়ে থাকো না !

মরমীপ্রকাশ উত্তর দেয় না। নিঃশব্দে মীরার মুখের দিকে থাকে তাকিয়ে।

পুনরায় মীরা জিজ্ঞাসা ক'রে, ডাক্‌বো অনিতাকে ?

মৃদু মাথা দোলায় মরমীপ্রকাশ। ভাষা তার শেষ হ'য়ে এসেছে ; তাই প্রকাশের শক্তিও আজ তার ম্রীয়মাণ। তবুও বার বার অর্থহীন দৃষ্টিতে আস্‌পাশের চেনা-অচেনা মুখের দিকে তাকায়—অথচ যাকে সে খোঁজে মনে-প্রাণে, সন্ধান তার পায় না।

অনিতা পাশে এসে বসে। মাথায় বাতাস করে, গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। জিজ্ঞাসা করে, তোমার কি কষ্ট হ'চ্ছে, বাবা ?

কষ্ট ! মনে মনে ভাবে মরমীপ্রকাশ। ইচ্ছা হয় ব'লে, বুকটা জ্বলে যাচ্ছে ! কিন্তু, না—না—বৃথা কাঁদিয়ে আর লাভ নেই ; ওদের চোখের জল ত নয়—তারই বুকের নিঙ্‌ড়ে নেওয়া রক্ত ! না—না—ওরা সুখী হোক, তৃপ্তি পাক্‌…নীরবে টেনে নিল তার হাতখানা। বুকের উপর রেখে ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে বলে, একটু বুলিয়ে দাও ত, মা !

অনিতার চোখে জল। মনটা তারও চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। তবে কি বাবা তার কোনদিন আর সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বে না ? সুরের ঝঙ্কারে পুনরায় আকাশ-বাতাস মথিত ক'রে তুল্‌বে না !

নিজেকে সংযত ক'রে নেওয়ার চেষ্টা করে অনিতা। তবুও পারে না। বাঁধনহীন অশ্রুর কয়েকটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে মরমীপ্রকাশের বুকের ওপরে। সচকিত হ'য়ে মরমীপ্রকাশ তাকায় তার মুখের দিকে। ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে ব'লে, ছিঃ কাঁদ্‌তে নেই মা !

আদরে তার হাত দুটো টেনে নিয়ে দুর্বল হাতখানা বোলায় আপন মনে। মাঝে মাঝে ফিস্‌-ফিস ক'রে কি যেন ব'ল্‌তে চেষ্টা করে। কিন্তু এতই অস্পষ্ট যে, বোঝা যায় না কোনমতে।

অনিতা নীরবে বসে বসে আঁচলে মোছে তার চোখের পাতাগুলো। সে ত চায় না—বাবা তার কষ্ট পাক, দুঃখ পাক ; কিন্তু অবুঝ মনটা যে বোঝেনা কিছুতেই। একটা অজানা ব্যথায় বার বার গুমরে ওঠে। বলে—গান শুন্‌বে, বাবা ? শোনাবো ? তোমার সেই প্রিয় গানটা—মাসীমা যা শিখিয়েছিলেন আমাকে ?

রক্তহীন মুখখানা আরক্ত হ'য়ে ওঠে মরমীপ্রকাশের। ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে বলে—শোনাবে মা ? শোনাও না ! একটুখানি শুনি—

পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মৃণালিনীদেবী। বাধা দিয়ে উঠ্‌লেন, না—না, ডাক্তারবাবু বারন ক'রে গেছেন। দু'দিন পরেই না হয় শুন্‌বে ! শরীরটা তোমার খারাপ,—খুবই খারাপ—একটু উত্তেজিত হ'লেই কখন কি বিপদ ঘট্‌বে, কে জানে ? বৌমা আবার গেল কোথায় ? সে কি সময় ক'রে একটু পাশে এসে ব'স্‌তে পারে না ? সংসার ত র'য়েইছে ! বাড়ীর ঝি-চাকর-বামুনগুলো কি শুধুই ব'সে ব'সে মাইনে নেবে ? অনিতা, দেখ্‌তো দিদি একটিবার—

অনিতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। মরমীপ্রকাশ ছাড়ে না তার হাতখানা। অনিতা ফিরে চায় মরমীপ্রকাশের মিনতি-ভরা সেই দৃষ্টির পানে। বলে—একটু শোনাই না দিদি ! বাবা যে শুন্‌তে চায়—

বিরক্তি বোধ করেন মৃণালিনীদেবী। বলেন, যা ভাল বোঝ করো ! দেখি একবার—বৌমা কোথায় গেল ? দু' পা এগিয়েই থম্‌কে দাঁড়ালেন। ব'ল্‌লেন, আস্তে—খুব আস্তে। দেখো, যেন বাবা তোমার আবার উত্তেজিত হ'য়ে না ওঠে !

পাশে ব'সে গাইবো দিদি ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ব'ল্‌লেন, আমি ডাক্তারবাবুকে একটা খবর পাঠাই। এখন কেমন আছে—একটিবার পরীক্ষা ক'রে বরং দেখে যান তিনি। হ্যাঁ—আর দেখ দিদি,—অবশ্য বৌমাকেও ব'লে যাচ্ছি, দুধ্‌টা গরম ক'রে নিয়ে এলে একটু একটু ক'রে তুমি খাইয়ে দেবে—বুঝ্‌লে !

অনিতা মাথা দোলালো। ব'ল্‌লো, কিন্তু বাবা যে খেতে চায় না—

চায় না ব'ল্‌লে ত চ'ল্‌বে না দিদি ! মা হ'য়েছো, অবোধ ছেলেকে যেমন ক'রে হোক খাওয়াতেই হবে ! তা হ'লে এখন আমি যাচ্ছি—ফিরে যেন দেখি ছেলেকে তুমি ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছো ! মৃদু হেসে ব'ল্‌লেন, পার্‌বে ত দিদি ?

অনিতা সহাস্যে মুখ তুলে তাকায়। মরমীপ্রকাশও ফিরে একটু হাসার চেষ্টা ক'রে।

মৃণালিনীদেবী চ'লে যান। অনিতা একটু দূরে বসে তুলে নেয় সেতারখানা। প্রথমে বাজালো মরমীপ্রকাশের প্রিয় একখানা সুর, তারপর হার্‌মোনিয়াম্‌টা টেনে নিয়ে সুরু ক'র্‌লো গান।

•

মীরার মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। কিসের যে তার অভাব, কিসের জন্য যে তার এত্‌ ব্যাকুলতা, কারণ খুঁজে পায় না সে। তাড়াতাড়ি ফিরে আস্‌তে চায় পীড়িত স্বামীর পাশে, কিন্তু প্রতিটিপদে পায় বাধা। বিরক্তিতে ফেটে পড়ে তার অন্তর, অথচ কোন কাজই সুস্থিরভাবে শেষ হয় না।

দুধটা গরম ক'র্‌তে তার প্রায় মিনিট-দশ অতিবাহিত হ'য়ে গেল। স্পিরিট্‌ল্যাম্পে স্পিরিট্‌ নেই। উঠে গেল সে স্পিরিটের বোতলটা আন্‌তে। দেশলাইটা নিজেই হাতে ক'রে নিয়ে এলো, কিন্তু কাজের সময় খুঁজে পেল না কিছুতেই। যদিও একটার পেল সন্ধান, তাতে আবার

নেই একটিও কাঠি। পুনরায় ছুটে গেল সে রান্না ঘরে। ফিরে এসে দেখ্‌লো, তার পায়ের কাছে প'ড়ে র'য়েছে সেই ভর্ত্তি দেশলাইটা। প্যান্‌টায় দুধ ঢাল্‌লো তাড়াতাড়ি—কিন্তু কালো কি যেন একটা ভেসে উঠ্‌লো পরমুহূর্ত্তে। নোতুন ক'রে ছেঁকে, যখন সে আগুনে প্যান্‌টা বসাতে গেল, দেখ্‌লো আগুনটা জ্বল্‌ছে মিট্‌ মিট ক'রে। নিভিয়ে বাতিটা বাড়িয়ে ল্যাম্পটা জাল্‌লো আরেকবার।

এক মিনিট···দু' মিনিট··তিন মিনিট—তবুও দুধ গরম হয়না, উৎলেও ওঠেনা। সেও যেন জমে হিম হ'য়ে গেছে। এক একটা মিনিট যেন যুগ-যুগান্তর ব'লে মনে হয় তার। এ ব্যবধানটা প্রায় অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ছে—তবুও তাকে অপেক্ষা ক'র্‌তে হয় নীরবে। বিরক্তিতে মনটা তার বিরাক্ত হ'য়ে ওঠে। ভাবে, যখন প্রয়োজন আসে—তখন অপ্রয়োজনীয় বস্তুর তালিকাটা অকারণে এমনিই স্তূপীকৃত হ'য়ে ওঠে!···

* * * *

প্রায় এক ঘণ্টা অতীত হ'য়ে গেল। তবুও মণীষার জ্ঞান ফিরলো না। দেহের শীতল অংশগুলোর মধ্যে সহজাত উষ্ণতা ফিরে এসেছে ইতি-মধ্যে। অদ্বৈতকুমারবাবুর মনটা আনন্দে ভরপুর হ'য়ে উঠ্‌লো। না তাঁর মনের আশঙ্কাটা নিতান্তই অমূলক—একটা আতঙ্কের ছায়া মাত্র! তার বেশী কিছু নয়।

কিন্তু কয়েক মিনিটের ব্যবধানে বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌লেন অদ্বৈতকুমার-বাবু। উন্মত্তের মত বিকট চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন, ডাঃ রায়—

পাশের ঘরে আরাম-কেদারাটার উপর দেহটা এলিয়ে ডাক্তার রায় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়েছিলেন। অকস্মাৎ চীৎকারে সচকিত হ'য়ে ফিরে এলেন রোগীর ঘরে। জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন, আপনার আবার কি হ'ল অদ্বৈতবাবু!

দেখুন তো—মার আমার নাড়ীটা একবার পরীক্ষা ক'রে। আমার যেন মনে হ'চ্ছে,—পুনরায় সব ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো। বার বার মনীষার হাত ও পায়ের পাতাগুলো পরীক্ষা ক'রতে ক'রতে উদ্‌ভ্রান্তের মত উত্তর দিলেন অদ্বৈতকুমারবাবু—হয়ত এটা আমার মতিভ্রম, তবুও একটু ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখুন তো!

ডাক্তার রায় বুঝ্‌লেন, স্নেহ-কাতর পিতৃ হৃদয় অকারণ আশঙ্কায় অপ্রকৃতস্থ হ'য়ে উঠেছে। তাই ঠোঁটের পাতা দু'টোতে একটু হাসির ঝিলিক্ দিয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু মনীষার হাতটা তুলে নিয়েই চম্‌কে উঠ্‌লেন তিনি। তাঁর মত বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসককে সত্যই ফাঁকি দিতে চ'লেছে এই মেয়েটা!

চকিতে ভেঙ্গে গেল তাঁর দৃঢ়তা—মুছে গেল দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। বিফল হ'ল তাঁর এই দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। অথচ কয়েক মিনিট পূর্ব্বেও পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, ওষুধটার য়্যাক্‌শন্ দেখা দিয়েছে। তাই স্নেহান্ধ পিতার অস্থির-চিত্ততার পরিচয়ে মনে মনে একটু বিরক্তিবোধই ক'রেছিলেন এতক্ষণ, কিন্তু এখন উপায়! নিজের অজ্ঞাতসারেই অস্ফুট কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লেন, 'কোরামাইন্'···অদ্বৈতবাবু ব্যাগটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিন—

অদ্বৈতকুমারবাবু চোখের পলকে এগিয়ে দিলেন ব্যাগটা কিন্তু ব্যাগ খোলার অবসর পেলেন না ডাঃ রায়। সব শেষ। সারা শরীরটা মনীষার শীতল হ'য়ে গেছে। কিন্তু মুখে তার ফুটে উঠেছে এক অনাবিল তৃপ্তির ছায়া। দূর থেকে মনে হয় যেন অপূর্ব্ব শান্তির ছায়ায় গভীর নিদ্রামগ্ন সে—আর ঠোঁটের পাতায় ভেসে আছে উজ্জ্বল হাসির অস্পষ্ট একটা রেখা।

ডাঃ রায় উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু অদ্বৈতকুমারবাবু তেমনি নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখে তাঁর একটি ফোঁটাও জল নেই,—এতটুকু বিচলিতও হ'লেন না তিনি। বুকের গুমরে ওঠা বেদনাটা

বার বার আত্মপ্রকাশ ক'র্‌তে চাইলো—কিন্তু নিজেকে দৃঢ় ও সংযত করে নিয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে ব'লে উঠ্‌লেন, একটু দাঁড়ান ডাক্তার রায়!

গম্ভীর মুখে ফিরে দাঁড়ালেন—ডাঃ রায়।

মানি-ব্যাগ থেকে এক গোছা কম্ করে নোট বার ক'রে অদ্বৈতকুমারবাবু ব'ল্‌লেন, আপনার ফি'টা নিয়ে যান!

হাতটা যন্ত্রচালিতের মত বাড়িয়ে দিলেন ডাঃ রায়। কিন্তু কেঁপে উঠ্‌লো অকারণে। হাতের মুঠো থেকে কয়েকটা নোট মেঝের ওপর গেল পড়ে। সেদিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তিনি আজ বিস্ময় বিমুগ্ধ। মানুষ কি সত্যই এমন নির্ব্বিকার হ'তে পারে!

অদ্বৈতকুমারবাবু কিন্তু সহজ কণ্ঠে ব'লে চ'ল্‌লেন—সঙ্কোচবোধ ক'র্‌বেন না ডাক্তার রায়। অপরাধ আপনার নয়—আমার বরাতের। তার ঋণ ত শোধ আমায় ক'র্‌তেই হবে! এই কে আছিস্, একটা টেলিগ্রামের ফর্ম্ নিয়ে আয়তো! পরক্ষণেই অধৈর্য্য হ'য়ে উঠ্‌লেন অদ্বৈতকুমারবাবু। চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, সব ঘুমুচ্ছে আরামে। পরমুহূর্ত্তেই নিজের ভুলটা সংশোধন ক'রে নিলেন। আপন মনে ব'লে উঠ্‌লেন, 'ওদেরই বা অপরাধ কি? সারাদিন খাটে অমানুষের মত—বিশ্রাম একটু ত চাই!

নিজেই পাশের ঘর থেকে টেলিগ্রামের ফর্ম্ একটা নিয়ে লিখে চ'ল্‌লেন—

'অনুসূয়া,—বহুদিন পরে আবার তোমায় পুরো নাম ধ'রে ডাক্‌ছি! সুখে নয়, বড় দুঃখে। কারণ পাশে আজ আমার আর কেউ নেই। ছিল মনীষা, সেও চলে গেল চিরতরে। তোমরা পরের ট্রেনেই চ'লে এসো। মরমীপ্রকাশকে সঙ্গে নিতে ভুলো না। শশ্মান-ঘাটে তার উপস্থিতির একান্ত প্রয়োজন। নইলে মার আমার আত্মা শান্তি পাবে না!'—অদ্বৈতকুমার।

বেয়ারা তৈরী হ'য়ে আদেশের অপেক্ষায় ব'সেছিল। তার হাতে ফর্ম্মখানা দিয়ে ব'ল্‌লেন, এক্‌স্‌প্রেস টেলিগ্রাম ক'রে দিয়ে জল্‌দি ফিরে আস্‌বে—বুঝ্‌লে!

মাথা ঢুলিয়ে বেরিয়ে গেল বেয়ারা।

ডাঃ রায় তখনও দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি নীরবে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যাকে অপ্রকৃতিস্থ ব'লে মনে হ'য়েছিল, পরক্ষণে তাকেই দেখ্‌লেন তিনি সাধারণ মানুষের ঢের ওপরে। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে আর একবার ভাল ক'রে তাঁকে নিরীক্ষণ ক'রে, ভাব্‌লেন, হ্যাঁ, ঠিক তেমনই নির্ব্বিকার। এরাই বিচারক বটে।...কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'র্‌তে সাহসী হ'লেন না। ভয় হ'ল, ভাব্‌তেও ত পারেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপহাস ক'র্‌ছি তাঁর এই দুঃসহ বেদনাকে! চকিত-গতিতে তিনি এগিয়ে চ'ল্‌লেন। শিথিল হ'য়ে এলো তাঁর বদ্ধ মুষ্টি। তার ফাঁকে ছড়িয়ে পড়ে গেল বাকী কয়টা নোট। তার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে চ'লে গেলেন তিনি। কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ তাঁর নেই, মনটা কেমন যেন উদাস হ'য়ে উঠেছে নিদারুণ এই দুঃখের পরশ পেয়ে। তাঁর আজীবনের সাধনা যে অর্থ, সেই অর্থ আজ তাঁর কাছে কেমন যেন একটা অর্থহীন ব'লে মনে হ'ল। জীবনে প্রথম চিন্তার উন্মেষ হ'ল—কে বড়? টাকা...না মানুষ? মানুষ... না টাকা,—স্নেহ...না তার ঋণ?...

* * *

সারা রাতটা অস্থিরতা প্রকাশ ক'র্‌লেও ভোরের দিকে বেশ একটু সুস্থ ব'লে মনে হ'ল মরমীপ্রকাশকে। এক ঘণ্টা ঘুমিয়েও ছিল। কিন্তু সূর্য্য ওঠার পর থেকে পুনরায় তার চঞ্চলতা গেল বেড়ে। অনাথবন্ধু ডাক্তারকে খবর দিতে ছুট্‌লেন। মীরা দুধ গরম ক'র্‌তে গেছে। অনিতা পাশে ব'সেছিল। ব'ল্‌লো—একটা গান শোনাবো বাবা?

মরমীপ্রকাশ খুশী হ'য়ে উঠ্‌লো। মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালো। একটু দূরে বসে মৃদু কণ্ঠে প্রাণ ঢেলে গাইতে সুরু ক'র্‌লো অনিতা—

(আজি) মুক্ত করি হৃদয় দুয়ার
কইবো আমি কথা—
আস্‌ছে ওগো, মিলন লগন
আস্‌ছে জীবন সখা !
দীর্ঘ দিনের মান অভিমান
ভাঙ্‌লো এবার—পুলক পরাণ,
লাগ্‌লো বুকে দোলা !
প্রদীপ আমার সফল জ্বালা
শিখার 'পরে শিখা—
রাঙ্‌লো হৃদয় লোহিত রঙে
মুছ্‌লো হৃদয়-ব্যথা !

সেই সুরের মূর্চ্ছনায় মরমীপ্রকাশের মন-প্রাণ উদ্বেলিত হ'য়ে উঠলো শুয়ে শুয়ে সে নিজের মনেই নিজে ভাবে, আহা—সেই শুভলগ্ন সত্যই কি তার আস্‌বে এ জীবনে! আস্‌বে কি কোনদিন? না—না, সে এমনি শুকিয়ে নিঃশেষ হ'য়ে যাবে! হায়—মনীষা, তোমার জীবনটা এমনি ক'রেই ব্যর্থ ক'রে দিলাম!

সঙ্গে সঙ্গে চোখে তার ভেসে উঠ্‌লো—মনীষার সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখের ছায়াখানা। চকিতে শিরা-উপশিরাগুলো পুলকে আপ্লুত হ'য়ে গেল। কে যেন ধীর-কণ্ঠে ব'লে উঠ্‌লো, হবে—হবে! ভয় কি মরমীপ্রকাশ—সে দিন যে তোমার আগত ওই!

আগত! আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো তার হৃদয়। তবে কি সত্যই সার্থক হ'বে তার সাধনা! মনীষাকে সুখী ক'র্‌তে পার্‌বে সে এ জীবনে? হায়! কোথায় সে ভরসা?···আশা—শুধুই তুমি আশা!

তাই তোমার পথ 'চেয়ে শুধুই ব'সে থাকা!...সফল হয় না—শুধু স্বপ্ন দেখাই সার হয় জীবনে! দীর্ঘশ্বাস নেমে এলো মরমীপ্রকাশের বুক ভেদ ক'রে। হায়! তবু তৃষা মেটে না জীবনে...

হ্যাঁ—সত্যই মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাস্তো সে মনীষাকে! সে সুখী হোক্, সুখে থাক্ এর বেশী কোন কামনাই আজ আর তার নেই, ক'রেওনা এ জীবনে! সে আশাটুকুও তার সফল হ'ল না, হায়—মনীষা—

অনিতা তখনও গাইছে 'দীর্ঘদিনের মান অভিমান, ভাঙলো এবার—পুলক পরাণ, লাগলো বুকে দোলা'—

হ্যাঁ দোলাই বটে!...হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনীষা সত্যই তুমি সুখী—চিন্তাসূত্র তার সহসা মাঝপথে ছিন্ন হ'য়ে গেল। বুকে একটা ব্যথা খচ্ ক'রে উঠ্‌লো। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের যন্ত্রণা। তারপর সব শেষ। চোখে মুখে তখনও ভেসে আছে সেই কল্পনার মধুর আবেশ!

দুধের বাটি নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো, মীরা। মৃদু কণ্ঠে ডাকলো, শুন্‌ছো—দুধ্‌টুকু খেয়ে নাও!

অনিতা গাইছে, 'প্রদীপ আমার সফল জ্বালা, শিখার 'পরে শিখা—রাঙ্‌লো হৃদয় লোহিত রঙে—মুছ্‌লো হৃদয়-ব্যথা! আস্‌ছে জীবন সখা—

বাটীটা মেঝের উপর রেখে কাছে এসে ডাকে মীরা, ওগো—শোন—শুন্‌ছো—শোন—শোন!—

কোন সাড়া নেই। তবে!—ভাব্‌তে পারে না মীরা। সারা অঙ্গ তার কাঁপে। বার বার পরীক্ষা ক'রে দেখে তার দেহ। স্বামী তার আর এ জগতে নেই—এ কথাটা অন্তর তার বিশ্বাস ক'র্‌তে চায় না—তবুও বুকে তার আছ্‌ড়ে প'ড়ে কান্নায় সে ফেটে পড়ে—ওগো, কথা কও—কথা কও—

চীৎকার শুনে ছুটে আসে অনিতা। সেও কাতর কণ্ঠে তার মার সঙ্গে বারবার ডাকে, বাবা—বাবা—ও বাবা!—ছুটে আসে আত্মীয়-স্বজন। সারা বাড়ীটা ক্রন্দনরোলে আলোড়িত হ'য়ে ওঠে।

ঠিক সেই সময়েই শোকাতুর মৃদঙ্গকুমার ধীর পদক্ষেপে সাম্‌নে এসে দাঁড়ালো। হাতে তার টেলিগ্রাম। কিন্তু সে আত্মপ্রকাশ ক'র্‌তে সাহসী হ'ল না। কিছু পূর্ব্বে একটা আঘাত সে পেয়েছে—সে ভারের বোঝাই তার জীবনে অসহনীয় ব'লে প্রতীয়মান হ'য়েছে—তার উপর আবার নোতুন আঘাত!—একটি মুহূর্ত্তও সে অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লো না। নিঃশব্দে নেমে এসে দাঁড়ালো ফুটপাতের ওপর। রাজপথে তীর বেগে একের পর এক ছুটে চলেছে গাড়ীগুলো। তারা মিলিয়ে যাচ্ছে চকিতে কিন্তু জমা হ'য়ে উঠ্‌ছে পীচের কালো ধূলির আবর্ত্ত। রুমালে চোখের পাতাগুলো মুছে চেয়ে চেয়ে দেখে সেই দৃশ্য আর ভাবে, জীবনের বোধ হয় এইটুকুই শেষ পরিচয়—তার বেশী কোন সত্যই মানুষ খুঁজে পাবে না এ জগতে·!

সমাপ্ত

লেখকের অন্যান্য বই

অভিজান

(১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের চিত্র)

মূল্য—৩৲

অন্তরালে

(সন্তান-লাভে নারী বঞ্চিত হ'ল কেন ? তার জন্য কি
একা নারীই দায়ী না পুরুষও সম-
অপরাধে অপরাধী ?) মূল্য—২৲

শরৎচন্দ্র

(অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
পরিপূর্ণ জীবনী সংগ্রহ) মূল্য—৩।০

খোলা চিঠি

(কাশ্মীর রণাঙ্গণে বীর বাঙালী সৈনিকের
আত্মত্যাগের করুণ কাহিনী) মূল্য—১।।০

পুরাণো দশ বছরের ডায়েরী

(জগতে অপরাধী কে ? এ তর্কের শেষ হবে না কোনদিন !
তবুও তর্ক আমরা করি, মনকেও প্রবোধ দিই,
কিন্তু সত্যই অপরাধী সে কে, সে
প্রশ্নের উত্তর দেবে ডায়েরী) মূল্য—১।।০